সূচীপত্র

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
নারী ও পুরুষের
একান্ত
গোপনীয় কথা
বা
পুশিদাহ রাজ
মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহী

একান্ত
গোপনীয় কথা
বা
পুশিদাহ রাজ

সূচীপত্র

একান্ত গোপনীয় কথা

বা

পুশিদাহ্ রাজ

মূলঃ মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহবী
অনুবাদ ও সংযোজনায় ঃ মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক

প্রকাশনায় ঃ রংধনু পাবলিকেশন্স

একান্ত গোপনীয় কথা
বা পুশিদাহ্ রাজ

মূল
মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহী

অনুবাদ ও সংযোজনায়
মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৩

দশম মুদ্রণ
অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশক
রংধনু পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ
মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

পরিবেশক
রংধনু পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৯৭৭-৩০২২৩৩

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত টাকা মাত্র)

PUSHIDAH RAJ or EKANTO GOPONIYO KOTHA
by Mufti Ashraf Amrohi, Translcted by Mawlana Abubakar Siddiqwe.
Published & Marketed by : Rangdhonu Pablication. Price. Tk. 200.00, US $ 15.00 only.

ISBN 978-984-33-3772-6

এ বই পড়ার আগে

পুরুষ ঃ কথায় প্রবল কাজে দুর্বল

মহিলা ঃ বুক ফাটে মুখ ফাটে না

এ বই পড়ার পরে

পুরুষ ঃ কথায় যেমন কাজেও তেমন

মহিলা ঃ মুখ ফাটে বুক আর ফাটে না

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী। সেই সাথে অগণিত ও বেহিসাব দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবীব খাতামুন্নাবিইয়ীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারকের উপর এবং এ ধারা চিরকাল প্রবাহমান থাকুক।

হামদ ও ছালাতের পর আমি নাকার মোহাম্মাদ আশরাফ আমরহবীর কিছু কথা হল, বক্ষমান কিতাবটির আলোচ্য বিষয় আমার কল্পনা-জল্পনায় উপস্থিত ছিল। তবে জনসাধারণের মাঝে তা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। কিন্তু জনসাধারণকে এ বিষয়গুলো জানানো খুবই প্রয়োজন অনুভব করি। কেননা, জনসাধারণের জন্য এ বিষয়গুলো জানা অতিব জরুরি। এই কিতাবখানা পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে, এ কিতাবখানার প্রয়োজন কতটুকু। শেষ পর্যন্ত লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলাম। সে হিসেবেই এ বইটি রচনার প্রয়াস।

আজ মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, আমার জন্য খুবই খুশির সংবাদ হা, ইতিপূর্বে আমার লেখা **তানহায়ী কি সবক** নামক কিতাবটি তিনি কবুল করেছেন। আমি আশাবাদী যে আমার **"পুশীদাহ রায"** কিতাবটিও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

আসলে এই কিতাবের আলোচ্য বিষয় এমন গোপনীয় যে, পিতা তার ছেলে-মেয়েদের শিখাতে বা বলতে পারেন না, স্বামী তার স্ত্রীকে জানাতে পারে, এমনকি স্ত্রীও আপন চাহিদা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করতে পারে না। এসবের একমাত্র কারণ লজ্জা। লজ্জার কারণে কেউ কারো সাথে এ বিষয়গুলো বলতে পারে না। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেকেই জানতে ইচ্ছুক, কিন্তু কার কাছে জানবে, কে তাকে জানাবে! এমন লোক খুজে পাওয়া দুস্কর। অবশেষে তারা ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি তাদের মধ্যে কারো সামান্যতম উপকারে আসে, তাহলে নিজের কষ্টকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ তাআলা আমার এ খেদমতকে কবুল করুন। পাঠকদের প্রতি আমার আরয যদি আপনারা এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হোন, তাহলে আল্লাহ্র দরবারে আমার গোনাহ মাফির জন্য দোয়া করবেন। আমীন।

পেশ লফয

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। একমাত্র তিনিই সকল সৌন্দর্য ও প্রশংসার অধিকারী। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সর্বক্ষণ অগনিত দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রুহ মুবারকের উপর। শান্তি বর্ষিত হোক সকল নবী, রাসূল, সকল সাহাবী ও বুযুর্গানে দ্বীনের উপর।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন- 'মানুষ কি শুধুমাত্র মাটির একটি টুকরা ছিলো না? যা বৃষ্টির পানির ন্যায় ঝড়ে পড়ত।' অতঃপর তিনি তাকে জমাট রক্তে পরিণত করেছেন। সবশেষে মানুষের আকৃতি দান করে প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গকে যথাস্থানে স্থাপন করেছেন। এবং তাকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক. নর। দুই. নারী।

আল্লাহ্ তাআলা কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? হে মানুষেরা! মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে চিন্তা করে দেখ (তোমরা ইতিপূর্বে কি ছিলে?) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর বীর্যে রূপান্তর করেছি। সে বীর্যকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি। এবং তা গোশতে পরিণত করেছি। এই প্রণালী পরিপূর্ণও করেছি আবার অপূর্ণাঙ্গও রেখেছি। আমি এসব শিল্পকার্য এজন্য করেছি, যেন তোমরা সত্যকে বুঝতে পার। তোমাদের সম্মুখে বাস্তবতা প্রকাশ পায়।

আমি যে নুতফাকে ইচ্ছা করি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের জরায়ুতে রাখি। এরপর তোমাদেরকে ছোট বাচ্চার আকৃতিতে বের করি। অতঃপর তোমাদের দেখাশুনা ও লালন-পালন করি, যেন তোমরা যৌবনে পদার্পন করতে পার। তোমাদের মধ্য হতে কাউকে সময়ের পূর্বেই (অধিক বয়স হওয়ার পূর্বেই) চলে আসতে হয়, আবার কাউকে ষাট বছর অতিক্রমের পর চলে আসতে হয়। যাতে সবকিছু জানার পর অনুধাবন করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় মানুষকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- পুরুষ ও মহিলা। তারা পরস্পরে একে অপরের সাথে এতো ঘনিষ্ট যে, প্রত্যেকেই একে

অপরের দিকে মুখাপেক্ষী। পুরুষরা যেমন স্বীয় যৌনচাহিদা পুরণের জন্য নারীর প্রতি মুখাপেক্ষী, তদ্রুপভাবে নারীরাও তাদের যৌনচাহিদা পুরণের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাদের এ যৌনচাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে হালাল পথ গ্রহণ করলে, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে নিকাহ বা বিবাহ বলে। হাদীসে এটাকে সুন্নাত বলা হয়েছে। আবার অবস্থাভেদে বিবাহকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

১) নিকাহে ফরয। ২) নিকাহে সুন্নাত। ৩) নিকাহে মাকরূহ। ৪) নিকাহে হারাম। নিম্নে এগুলোর সংজ্ঞা দেয়া হলো।

নিকাহে ফরয ঃ যখন কোনো পুরুষের মরদামী শক্তি এ পরিমান প্রকট হয় যে, যে কোনো মুহূর্তে যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। মরদামী শক্তির সাথে সাথে আর্থিক স্বচ্ছলতাও থাকে। এরূপ হালতে তার জন্য বিবাহ করা ফরয।

নিকাহে সুন্নাত ঃ যে পুরুষের মরদামী শক্তি অধিক প্রকটও নয় আবার একেবারে নমনীয়ও নয় বরং মধ্যাবস্থায় রয়েছে। আবার সেই সাথে স্ত্রীর যৌনচাহিদা ও আর্থিক চাহিদাও পুরণে স্বামর্থবান হয়। তাহলে এরূপ মুহূর্তে তার জন্য বিবাহ করা সুন্নাত।

নিকাহে মাকরুহ ঃ যখন কোনো পুরুষের মরদামী শক্তির ব্যাপারে এ ধারণা হবে যে, আমি যদি বিবাহ করি, তাহলে স্ত্রীর যৌনচাহিদা পূরণ করতে পারব না। এরূপ হালতে তার জন্য বিবাহ করা মাকরুহ।

নিকাহে হারাম ঃ যদি কোনো পুরুষের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, সে বিবাহ করলে তার স্ত্রীর যৌনচাহিদা একেবারেই পূর্ণ করতে পারবে না। ভবিষ্যতেও তার হক আদায় করার সম্ভবনা নেই। বিবাহ করার দ্বারা স্ত্রীর উপর জুলুম বৈ কিছুই হবে না। এরূপ হালতে তার জন্য বিবাহ করা হারাম।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল– যৈবিক চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ পথ অবলম্বন না করলে তার তিন অবস্থা এবং তিনটিই হারাম। যথা–

(১) যিনা ব্যভিচার (২) জলক্ব তথা হস্তমৈথুন (৩) সমকামিতা। এসবগুলো বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে। ইনশাআল্লাহ্...

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মহিলাদের গর্ভ

সূচীপত্র

প্রসব বিষয়ক আলোচনা

আপনার কাঙ্খিত সন্তান

সূচীপত্র

স্বপ্নদোষ বিষয়ক আলোচনা

সূচীপত্র

কয়েকটি মেয়েলী রোগের ঔষধ

গর্ভ পরীক্ষা

টোটকা চিকিৎসা

হস্তমৈথুন ও সমকামিতা

সূচীপত্র

মানুষের মূল উপাদানের পরিচিতি

প্রদীপের জন্য তেল যেমন মূল উপাদান, মানুষের জন্য বীর্যও তদ্রুপ মূল উপাদান। প্রদীপের মধ্যে যতক্ষণ তেল বা জ্বালানি থাকে, ততক্ষণ সে তার আলো দান করে থাকে। জ্বালানি বা তেল শেষ হয়ে গেলে যেমন প্রদীপের আলোও নিঃশেষ হয়ে যায়। বীর্যও মানুষের জন্য যৌনতন্ত্রের চাবিকাঠি। বীর্য যতক্ষণ শরীরে থাকবে, যৌবনের উত্তেজনাও ততক্ষণ বিরাজ করবে। বীর্য যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার যৌবনের উত্তেজনাও তখন বিলীন হয়ে যাবে।

বীর্য সম্পর্কিত আলোচনা

বীর্যের পরিচয়

১. মানুষের শরীরের গাঢ় ও ঘনযুক্ত পানি বিশেষ। ২. সাদাবর্ণ। ৩. উত্তেজনার সাথে তীব্রবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে বের হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন- মানুষ যা খায়, প্রথমে তা দ্বারা রস তৈরী হয়। তারপর সে রস থেকে রক্ত তৈরী হয়। রক্ত থেকে গোশত, গোশত থেকে চর্বি। অতঃপর সে চর্বি থেকে হাড্ডি, হাড্ডি থেকে মগজ। সবশেষে ছাব্বিশ দিন পর মহা মূল্যবান এ বীর্য তৈরী হয়। যেন সাতটি মেশিন অতিক্রম করে এ বীর্যের উৎপাদন। বুঝার বিষয়, এ বীর্য কত মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, কতিপয় নির্বোধ লোকেরা এ মূল্যবান সম্পদের ইজ্জত করতে জানে না। এর কদর বুঝে না। ফলে ভুল পদ্ধতিতে হারাম স্থানে তা বিনষ্ট করে দেয়। অবশেষে তার অবস্থা এমন হয় যে, শত আফসোস করেও তার সে মূল্যবান সম্পদটি ফিরিয়ে আনতে পারে না। ফলে সে জীবনভর আফসোস করতে থাকে।

বীর্যের পরিমাণ

ইতিপূর্বে এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে যে, বীর্য নামক উপাদান, যার রঙ সাদা ও গাঢ়, দেখতে মূলপদার্থের মতো। এ বীর্য যখন বের হয়, তখন তীব্রবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে বের হয়। যা মহিলাদের ডিম্বাণুতে পৌঁছে গর্ভধারণের উপকরণে রূপান্তরিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, মানুষ জন্মের

মূল উপাদান হলো বীর্য। আর এ বীর্য যখন কোনো যুবকের লিঙ্গ থেকে বের হয় তখন তা পরিমাণে তিন থেকে ছয় মাশা (এক মাশা = আট রতি) পর্যন্ত হয়ে থাকে। বীর্যের আসল উপাদান হলো কীট বা বীর্যের পোকা। যা দ্বারা ভ্রূণ হয়। বীর্যের মাঝে এ ধরণের কীট না থাকলে এর মাধ্যমে সন্তান জন্ম হবে না। এই কীট বা পোকা বীর্যের মধ্যে বেহিসাব থাকে। যদিও ভ্রূণ তৈরীর জন্য একটি কীটই যথেষ্ট। কীটগুলোর মাথা কিছুটা গোলাকার ও চেপটা হয়ে থাকে। এগুলো আকারে এতো ছোট যে, দুরবীন বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা অসম্ভব। বীর্য মানুষের শরীরের রক্ত থেকে তৈরী হয়ে থাকে। সুতরাং যার শরীরের রক্ত যত বেশী বৃদ্ধি পাবে, তার শরীরে বীর্যও তত বেশি বাড়তে থাকবে। যৌবনকালে বীর্য অধিক থাকার কারণ হলো, যৌবনকালে শরীরের রক্ত থাকে তুলনামূলক বেশি।

মানুষের শরীরে বীর্য তৈরীর কয়েকটি অঙ্গ রয়েছে। যথা– কলিজা, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক ইত্যাদি। বীর্য বৃদ্ধি করতে হলে এসব অঙ্গ সুস্থ থাকতে হবে। কারণ মানুষ যে খাবারই গ্রহণ করে, তা দ্বারা পরিস্কার রক্ত তৈরী হয়।

আত্মতৃপ্তিদায়ক বস্তু হলো যৌনসম্ভোগ

মানুষের যতগুলো আত্মতৃপ্তিদায়ক বস্তু রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যৌনসম্ভোগ। আবার তা মাত্রাতিরিক্ত হলে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তাআলা এ যৌনসম্ভোগের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন মানুষের আত্মতৃপ্তি। যার প্রতি মানুষ এমনকি সমস্ত প্রাণীই একে অপরের সাথে সহবাস বা মিলনের জন্য আগ্রহী হয়ে থাকে। খাবার দাবারে যেমন সব কিছুরই ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, তদ্রুপভাবে যৌনসম্ভোগের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এমনকি খাবার দাবারের চেয়েও অধিক চাহিদা পাওয়া যায় যৌনসম্ভোগের মধ্যে।

বলা হয়ে থাকে যে, জান্নাতের উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে যৌনসম্ভোগ একমাত্র উপভোগ্য বিষয়, যা আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতে দান করেছেন। যৌনমিলনই কেবল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য বস্তু। এটা দুনিয়ার অদ্বিতীয় বস্তু। এ অদ্বিতীয় স্বাদের জন্যই মানুষ স্বীয় মান-ইজ্জত, সম্মান এমনকি অপরের ইজ্জত সম্মানেরও পরোয়া করে না। ধ্বংস করে দেয় নিজেকে যিনা-ব্যভিচার, হস্তমৈথুন ও সমকামিতা নামক অপকর্মে। এ সব

অপকর্ম করার সময় এ কথাটিও মনে থাকে না যে, প্রথমে মজা সবশেষে সাজা। নিজের মূল্যবান সম্পদ বীর্য যা সাতটি মেশিনের সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়েছে, তা শেষ করে দিচ্ছে। অথচ এ অমূল্য সম্পদের মাধ্যমেই পার্থক্য করা হয়ে থাকে পুরুষত্ব ও অক্ষমতার মাঝে। আর যৌনসম্ভোগ আল্লাহ্ তাআলার এমন একটি নেয়ামত যা সৃষ্টির সেরা মানব জাতি থেকে শুরু করে সকল জীব-জন্তুও সমানভাবে অংশগ্রহণকারী কামনার্থী।

পুরুষাঙ্গের পরিচয়

যে অঙ্গের মাধ্যমে যৌনসম্ভোগের কাজটি সম্পাদন করা হয়, তাকে পুরুষাঙ্গ বা প্রজনন যন্ত্র বলা হয়। এ অঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো, এর দ্বারা যৌনসম্ভোগের কাজ সমাধা করা যায়। অর্থাৎ বীর্যভাণ্ডারের স্থান পরিবর্তনের কাজটি স্বাদ ও প্রফুল্লতার সাথে সম্পাদন হয়ে থাকে। জ্ঞাতব্য বিষয় হলো যে, পুরুষাঙ্গের প্রসারতার শক্তি অন্তর থেকে হয়ে থাকে। আর তার উপলব্ধি হয় ধমনির দ্বারা। তার খাবার যোগায় কলিজা থেকে। কলিজা ও মস্তিষ্ক থেকে পরস্পর মিলনের ইচ্ছা শক্তি জাগে।

যৌনাঙ্গে উপলব্ধি অনেক ভাবেই হতে পারে। পুরুষাঙ্গের লাল বর্ণের শিরা, কালো বর্ণের শিরাগুলো উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। পুরুষাঙ্গের প্রসারতা, শক্তি ও অনুভূতি শিরা ও ধমনী বেশি হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। পুরুষাঙ্গের প্রথম অংশ তথা মাথা দেখতে খোসাবিহীন সুপারির মতো গোলাকার। সেজন্য তাকে সুপারীও বলা হয়ে থাকে। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে পেশাবের জন্য ছিদ্র রয়েছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা **তানহায়ী কি সবক** নামক কিতাবে করা হয়েছে।

পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্যতা

বেশিরভাগ সময় পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্যতা পাশাপাশি ছয়টি আঙ্গুল মিলালে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য হয়, সে পরিমান লম্বা বা দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে। মহিলাদের গুপ্তাঙ্গের দৈর্ঘ্যতাও ঐ পরিমানই হয়ে থাকে। যদি কারো পুরুষাঙ্গ লম্বায় ঐ পরিমান না হয়, যার কারণে সহবাসের সময় তার লিঙ্গ বাচ্চাদানি পর্যন্ত পৌছে না এবং সহবাসে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তিও পায় না, তাহলে তাকে সহবাসের সময় ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আর সেটি হলো, তাকে তার যৌনাঙ্গ বৃদ্ধির ঔষধ

ব্যবহার করতে হবে, নতুবা সহবাসের সময় স্ত্রীর নিতম্বের নিচে বালিশ বা বালিশের মতো উঁচু জিনিস রেখে সহবাস করতে হবে। এতে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করতে পারবে। এর দ্বারা কারো মনে কোনো প্রকার কষ্ট থাকবে না।

মানুষের জন্য খতনা করা জরুরী ও উপকারী

সুপারীর উপরে টুপির মতো চামড়া কর্তন করাকে মুসলমানী বা খতনা বলে। এ খতনা করা সব ধর্মের মানুষের জন্য খুবই উপকারী ও প্রয়োজনীয়। এ খতনার কারণে অনেক রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায়। যৌনাঙ্গ সংক্রান্ত কঠিন রোগ ইহুদী-খ্রিস্টানদের তুলানায় মুসলমানদের মাঝে কম পাওয়ার এটিও একটি কারণ। এজন্য বর্তমানে তারাও খতনা করাকে আবশ্যক মনে করে। খতনা করার দ্বারা যতগুলো উপকারিতা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো, দুর্গন্ধযুক্ত আর্দ্রতা যা চামড়ার নিচে জমা হতো, সেটি আর জমা না হওয়াতে দুর্গন্ধ ও ক্ষত সৃষ্টির সম্ভবনা থাকে না। আর পুরুষাঙ্গ খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা ও ধমনি দিয়ে আবৃত, যার দ্বারা যৌনাঙ্গে অনুভূতি শক্তি অনেক প্রখর হয়ে থাকে।

অণ্ডকোষ পরিচিতি

অন্ডকোষের অবস্থান পুরুষাঙ্গের নিচে। যা দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চি, প্রস্থে সোয়া ইঞ্চি, ওজনে আধা ছটাক ডিম্বাকৃতির দু'টি কোষ। যার মধ্যে বীর্য প্রস্তুত হয়। এ অণ্ডকোষটি একেবারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বা ধমনি দ্বারা আবৃত। যা কোষাকৃতি নল বিশিষ্ট। দৈর্ঘ্যে শরীরের ভিতর দিকে তিন বিঘত। এ রগগুলোকে যদি পৃথক পৃথকভাবে পরস্পর গিঁট দেয়া হয়, তাহলে তার দৈর্ঘ্য দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ বীর্য প্রস্তুত করে, তা হতে বীর্য তৈরী হয়ে ঐ শিরাগুলি দ্বারা অণ্ডকোষে এসে জমা হয়।

গোপন রহস্য

গর্ভ ধারণের জন্য নারী-পুরুষের সহবাস যেমন আবশ্যক, তেমনিভাবে সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গ শক্তভাবে প্রসারিত হওয়াও আবশ্যক। মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের মাথা, হতে, পা পর্যন্ত শিরা-উপশিরা, ধমনির জাল দিয়ে বিছিয়ে দিয়েছেন। আর এসব শিরা-উপশিরার সংযোগ স্থল পুরুষাঙ্গের সাথে

সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

এজন্যই গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, যৌনতা সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলা হলে, স্পর্শ হলে বা এ জাতীয় কিছু দেখলে এমনকি চিন্তা করলেও মস্তিষ্কে তার প্রভাব বিস্তার করে। আর সাথে সাথে স্বীয় পুরুষাঙ্গ শক্ত ও প্রসারিত হয়ে যায়। যদি সুস্থ সবল ব্যক্তি হয়, তাহলে তার বীর্যপাত হওয়া বা চিন্তাটা মাথা থেকে সম্পূর্ণ বের হওয়ার আগ পর্যন্ত তার পুরুষাঙ্গ কাজ করতেই থাকে। আর যখন বীর্যপাত হয়ে যায়, তখন শরীর দুর্বল ও অলস হয়ে যায়। এর কারণ হলো, সহবাসের দ্বারা শিরা, ধমনি আপন কাজ বন্ধ করে দেয় এবং উত্তেজনা ঠান্ডা হয়ে পুরুষাঙ্গের প্রখরতা নিস্তেজ হয়ে যায়। অবশেষে দুর্বলতা ও ঘুম শরীরকে আচ্ছাদিত করে। এজন্য মুরব্বীরা বলে থাকেন যে, বীর্যপাত ঘুমকে আচ্ছাদান করে।

পুরুষাঙ্গে যেসব ঔষধ ব্যবহার করতে হয়

পুরুষাঙ্গের দুর্বলতা দুর করার জন্য যেমন ঔষধ খেতে হয়, তদ্রুপভাবে পুরুষাঙ্গের শিরা, উপশিরা, ধমনি সবল ও শক্তিশালী বানাতে মালিশকৃত ঔষধের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। এরূপ একটি শাহি মালিশ তেলের বিবরণ নিচে দেওয়া হল—

উপাদান	পরিমাণ
হলুদ রঙের বেগুন	১টি
লবঙ্গ	৬০টি
তিলের তেল	আধা কিলো
শুকনা জোঁক	৬ তোলা
ছিলানো গমের আটা	৫ তোলা

যেভাবে বানাতে হবে ঃ বড় একটি বেগুন যা গাছে থাকতে থাকতে পেকে হলুদ রঙের হয়ে গেছে। এরকম একটি বেগুন ভেঙ্গে তার চারদিকে ৬০টি লবঙ্গ গেঁথে দিবে। এরপর এ বেগুনকে রোদ্রে না শুকিয়ে বরং ছায়ায় শুকাবে। শুকিয়ে গেলে ছোট একটি কড়াইয়ে আধা কিলো তিলের তেল ঢেলে নিমের লাকড়ি দিয়ে আগুনে হালকা গরম করবে। অতঃপর সে বেগুনটিকে কড়াইয়ে দিয়ে হালকাভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে ফেলবে। যখন বেগুনটি তেলের

সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে যাবে, তখন তাতে ছয় তোলা পরিমাণ শুকনো জোঁক ছেড়ে দিয়ে মিশিয়ে ফেলবে। অতঃপর তাতে ছিলানো গমের ৫ তোলা আটা ঢেলে দিবে। সবকিছু ঠিকঠাক মিলানোর পর কড়াইটি চুলা থেকে নিচে নামিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করবে। যেন সবগুলো উপাদান একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করে। সবশেষে এ ঔষধ শিশিতে সযত্নে রেখে দিবে। প্রয়োজনের সময় দুই মাশা পরিমাণ বা এক আঙ্গুল পরিমাণ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে এমনভাবে মালিশ করবে যেন পুরুষাঙ্গের শিরাগুলো সে তেলকে চুষে নেয়। তারপর রেড়ের পাতা দিয়ে বেঁধে দিবে। বার দিন এরূপ করতে পারলে অবশ্যই সে পূর্ণাঙ্গভাবে সুস্থ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্...

বি. দ্র. এ তৈল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিজ্ঞ হাকীমের স্মরণাপন্ন হবে।

যেভাবে যৌনাঙ্গ দীর্ঘায়িত করতে হয়

উপাদান	পরিমাণ
গন্ধক ফল	পরিমাণ মত
পিপুঁলদার	সমপরিমাণ
খাঁটি মধু	সমপরিমাণ

প্রথম দু'টি উপাদান একত্রে পিষে খাঁটি মধুর সাথে মিশিয়ে পুরুষাঙ্গে মালিশ করবে। অতঃপর একঘন্টা পর গরম পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। যাদের পুরুষাঙ্গ ছোট তাদের জন্য এটি খুব উপকারী।

পুরুষাঙ্গ মোটা ও দীর্ঘ করার ঔষধ

উপাদান	পরিমাণ
কার্পাসের বীচি	পরিমাণ মত
কাঁচা দুধ	সমপরিমাণ

যেভাবে বানাতে হবে ঃ কার্পাসের বীচির অস্থিকে পিষিয়ে একেবারে ফাকি করে টাটকা কাঁচা দুধের সাথে মিশিয়ে সহবাসের কিছুক্ষণ আগে পুরুষাঙ্গে মালিশ করবে। অভিজ্ঞরা বলেন, এভাবে ব্যবহার করলে যৌনস্পৃহাও বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষাঙ্গ মোটা ও দীর্ঘ হয়। এটা একশভাগ উপকারী ঔষধ।

বীর্যের কীট

অনেক পুরুষ এমন রয়েছে, যাদেরকে দেখতে সুঠাম ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্বেও তাদের কোনো সন্তান হয় না। এর মূল কারণ হলো, তাদের বীর্যে সন্তান জন্মের কীট নেই। তারা সন্তান জন্ম দিতে অপারগ। এবং পিতা হওয়াতে মাহরুম। তাদের বীর্যকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে বীর্যে কীটের অনুপস্থিতির ব্যাপার পরিস্কারভাবে জানা যায়। তাদের অণ্ডকোষের বীচি পূর্বে থেকেই থাকে না। অথবা থাকলেও তা আকারে একেবারে ছোট ছোট। অথবা তার প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারো কারো এ রোগ জন্মগতভাবে হয়ে থাকে। আর এজন্যই বীর্যে কীট থাকে না। জন্ম থেকে বা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এ রোগ দেখা দিলে তার চিকিৎসা অসম্ভব। পক্ষান্তরে অন্য কোনো কারণে এ রোগ হলে, তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমে বীর্য উৎপাদনকারী তথা-অন্তর, কলিজা, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির দুর্বলতা দূর করতে হবে। অতঃপর বীর্যে কীট উৎপাদনকারী ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

বীর্যে কীট উৎপাদনকারী ঔষধ

বীর্যে কীট উৎপাদনকারী অনেক ঔষধই রয়েছে, যে চিকিৎসাই গ্রহণ করা হবে, সে ব্যাপারে হাকীমদের স্মরণাপন্ন হতে হবে। নিম্নে দু'টি ঔষধের ফর্মূলা উল্লেখ করা হলো–

এক

উপাদান	পরিমাণ
দেশীয় ডিম	২০টি
মিছরী	৪ তোলা
কস্তুরী	পরিমাণ মত
জয়ফল	৪ মাশা
জয়ত্রী	৪ মাশা
জাফরান	১ মাশা

২০টি দেশীয় ডিমের হলুদ অংশ, চার তোলা মিছরী, কস্তুরি পরিমাণমত, জায়ফল ও জয়ত্রী চার মাশা, এক মাশা জাফরান। সবগুলো একসাথ করে মিশ্রণ করবে। এরপর দৈনিক সকাল বিকাল দু'বেলা দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করবে।

দুই

উপাদান	পরিমাণ
ভুনা করা গমের আটার ভূষি	পরিমাণ মত
গাওয়া ঘি	২০০ গ্রাম
কেওড়া গাছের রস	পরিমাণমত
কস্তুরী	পরিমাণমত
মিছরী	পরিমাণমত
ছা'রাব মিছরী	৭ তোলা
চিনি	১ তোলা
মৃগনাভী	১ মাশা
গাজরের রস	২ তোলা

প্রথমে গমের আটার সাথে গাওয়া ঘি ভূনা করবে। তার পর কেওড়া গাছের রস, কস্তুরীর মধ্যে মিছরীসহ মিশাবে। অতঃপর ছা'রাব মিছরী, মৃগনাভী এগুলো গমের আটার সাথে মিশিয়ে হালুয়া বানাবে। সবশেষে এগুলো গাজরের রসের সাথে মিশিয়ে সেবন করবে।

বীর্য ঘন করার ঔষধ

উপাদান	পরিমাণ
এলাচী	৩ তোলা
সাদা মসলা	৩ তোলা
পদ্মফুলের বীজ	৩ তোলা
সমন্দরে সুক (গাছ বিশেষ)	৩ তোলা
বকুল গাছের ছাল	৩ তোলা
সাম্ভাল গাছের আঠা	৩ তোলা
আঠঙ্গন গাছের বীজ	৩ তোলা
মটরশুটি	৩ তোলা
দারুচিনি	৩ তোলা
ময়দা লাকড়ি (গাছের শিকড় বিশেষ)	৩ তোলা
শিমুল গাছের আঠা	৩ তোলা
বাবলা গাছের পাতা	৩ তোলা
চিনি	পরিমাণমত

যাদের ধাতু তরল ও পাতলা, তারা স্ত্রী সহবাসেও দুর্বল, সহবাসের সময় খুব দ্রুত ধাতু বের হয়ে যায়। এ রোগ অধিকাংশ লোকেরই। এ রোগের পঞ্চাশটি ঔষধের ব্যবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ব্যবস্থাপত্র নিয়ে আলোচনা করা হলো। উপরোক্ত উপাদানসমূহ তিন তোলা করে বাবলা গাছের রসের সাথে মিশাবে। অতঃপর পরিমাণমত চিনি দিয়ে খামিরা বানাবে। দৈনিক এক তোলা পরিমাণ দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করবে।

গুরুত্বপূর্ণ কথা

এ ধরণের রোগীদের টক জাতীয় খাবার সব সময় ক্ষতি করে থাকে। যেমন- আমলকি, লেবু, সিরকা, আচার, টক আম, কাঁচা টমেটো, সব ধরনের টক জাতীয় ফল-ফলাদী। এমনকি টক জাতীয় ফুল গাছের নিচেও দাঁড়ানো তার জন্য ক্ষতিকারক।

কেমন নারীকে বিবাহ করা উচিত

বিবাহের ক্ষেত্রে এমন নারী নির্বাচন করবে, যার মধ্যে ধার্মিকতা ও আমল আখলাকের ক্ষেত্রে স্বামীর চেয়ে উত্তম। এতে সে নারী অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে স্বামী সমতুল্য না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। নারীর চেহারা গোলাকার হলে সবচেয়ে ভালো। গোলাকার ও লম্বাকৃতির চেহারা সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি। তবে গোলাকার চেহারার অধীকারী নারীর কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট থাকে। যা সাংসারিক জীবনে সুখের সৃষ্টি করে। তদ্রুপভাবে স্ত্রী দূরের বংশের হওয়াটা বেশি উপকারী। কারণ নিকটাত্মীয় অর্থাৎ চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো বোন ইত্যাদি আপন আত্মীয়ের মধ্যে দূরের তুলনায় ভালোবাসা মহব্বত কম হয়ে থাকে। এদের থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সাধারণত তারা মেধা শক্তি ও জ্ঞান গরিমায় দুর্বল হয়ে থাকে। কখনও কখনও বিকলাঙ্গ বা বিভিন্ন জটিল রোগের শিকার হয়ে থাকে। এজন্য যথাসম্ভব দুরের কোনো নারীকেই বিবাহ করবে। কেননা, দুরের আত্মীয়দের সাথে মহব্বত-ভালোবাসা বেশি হয়ে থাকে। আর সন্তানাদিও জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। সাথে সাথে নতুন করে একটি বংশের সাথে সম্পর্ক করার দ্বারা বংশধারাও বৃদ্ধি পায়। দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় শিক্ষায় শিক্ষিতা পাত্রীকেই বিবাহ করা চাই। একেবারে মূর্খ জাহেল অশিক্ষিতা নারী বিবাহ না করাই উত্তম। নারী

মোটা হওয়া বা চিকন হওয়া এটা ছেলের পছন্দের উপর নির্ভর করবে। কারো পছন্দ মোটা মেয়ে আবার কারো পছন্দ চিকন ও হালকা পাতলা মেয়ে। তবে অধিকাংশ লোকজন হালকা পাতলা নারীকেই বেশি পছন্দ করে থাকে। পক্ষান্তরে আরবের লোকেরা মোটা পাত্রীকে বেশি পছন্দ করে।

এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এমন মহিলাকে বিবাহ কর, যার থেকে বেশি বেশি সন্তান জন্ম নেয়। প্রশ্ন হতে পারে যে, বিবাহের আগেই অধিক সন্তান হওয়ার নিদর্শন কি? এ বিষয়টি বুঝতে হলে, উক্ত মেয়ের সহোদরা অর্থাৎ বোনো সন্তানাদি কতগুলি অথবা উক্ত মহিলার সহোদর বোন কতজন। কিংবা তার ভাইয়ের সন্তানাদি কতজন। তাদের সন্তানাদি বেশি হলে, আশা করা যায় যে, এ মহিলার থেকেও অধিক সন্তানাদি হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে নির্বাচিতা নারী যেন বাঁজা না হয়। বাঁজা বলা হয় ঐ নারীকে, সন্তান জন্ম দেয়ার যোগ্যতা যে নারীর মধ্যে নেই।

বিবাহের পূর্বে কিছু কথা

সন্তানাদি যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌছে, তখন পিতা-মাতার উচিত বিবাহের পূর্বে তাদের থেকে তাদের মতামত জেনে নেওয়া। যাতে বুঝা যায় যে, এতে সে সম্মত কি না? বিবাহের পূর্বে এ বিষয়টিও খেয়াল করতে হবে যে, যাকে বিবাহ করা হচ্ছে, সে নারী বাড়ি-ঘরের কাজ, রান্নাবান্নার কাজ, সেলাই কাজ ও ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কতটুকু শিয়ানা। কেননা বিবাহের পর ঘরের যাবতীয় কাজের দায়-দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।

প্রত্যেক মহিলার জন্য শারীরিক ব্যায়াম জরুরী

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে ব্যায়ামের বিকল্প কিছু নেই। শারীরিক ব্যায়াম করলে রোগ ব্যাধি সহজে শরীরে আক্রমণ করতে পারে না। অনেক সময় শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের দ্বারা অনেক রোগ ব্যাধি চলে যায়। শারীরিক ব্যায়ামকারী পুরুষ বা মহিলার উপমা হলো সেসব লোকের ন্যায়, যারা দুশমনের আস্তানায় বাস করেও হেফাজতে থাকে। উপমহাদেশে যেহেতু মহিলাদের জন্য শারীরিক ব্যায়ামকে দৃষ্টিকটু ও অপরাধের কাজ বলে মনে করা হয়, সেহেতু তাদের উচিত ঘরের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সমাধা করার মাধ্যমে শারীরিক ব্যায়াম করা।

প্রত্যেক মহিলাকে যে ব্যায়ামটুকু করতেই হবে

স্ত্রীর কমপক্ষে এতটুকু ব্যায়ামতো অবশ্যই করা উচিৎ যে, তার নিজের কাপড় পরিস্কার করার সাথে সাথে স্বীয় স্বামী ও অপারগ হলে তার শশুর শাশুড়ীর কাপড় চোপড় পরিস্কার করবে। এতে তার সাথে সকলের আন্তরিক মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এতে তার শারীরিক ব্যায়ামও হয়ে যাবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করা হয়ে যাবে।

মহিলাদের ভেবে দেখার বিষয়

উদাহণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের ঘরের কাপড় চোপড় ধুপা দ্বারা পরিস্কার করা হয়ে থাকে। সবমিলে সপ্তাহে ১০টির মত কাপড় জমে। এ কাপড় ধুপা দিয়ে ধুতে আনুমানিক ১০০ টাকা লাগে। স্ত্রী যদি এ কাজটি ধুপার দ্বারা না করে নিজে করে স্বামী থেকে ঐ পরিমান টাকা নিয়ে নেয়, তাহলে আর্থিকভাবে তারা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে স্বামীকে সাহায্য করতে পারবে। অথবা ঐ টাকা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে। কাপড় চোপড় পরিস্কার করার ন্যায় শিল-পাটা দ্বারা মসলা জাতীয় বস্তুও পিষানো এক প্রকার শারীরিক ব্যায়াম। এভাবে ঘরে সব কাজ নিজ হাতে সমাধা করলে ঘরের কাজ হওয়ার সাথে সাথে নিজের শারীরিক ব্যায়ামও হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেক ধার্মীক বোনদের উচিৎ, ঘরের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করা। এতে সকলের মহব্বত ভালোবাসা ও দুআ পাওয়ার সাথে সাথে নিজের শারীরিক সুস্থতাও বজায় থাকবে।

উপকারী ঘটনা

হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন আমার বিবাহ হলো, তখন আমি একেবারে চিকন ও হালকা পাতলা ছিলাম। আমার মা উম্মে রুম্মান আমাকে মোটা বানাতে সবধরনের চেষ্টা তদবীর করলেন। বিভিন্ন ধরণের ঔষধও সেবন করালেন। কিন্তু এতে কোনো লাভ হলো না। আমি পূর্বের ন্যায় চিকন ও হালকা পাতলাই রয়ে গেলাম। যেহেতু আরবের লোকদের মোটা মেয়ে অধিক পছন্দ, সেহেতু আমার মা আমাকে খেজুর ও খিরা একত্রে খাওয়াতে লাগলেন। অবশেষে আমি পূর্বের তুলনায় বেশ মোটা হয়ে গেলাম। শরীরের রঙও পূর্বের চেয়ে সুন্দর হয়ে গেল।

প্রত্যেক নারীর জন্য বিশেষ নির্দেশ

সকল নারীকেই এ বিষয়টির প্রতি যত্নবান হতে হবে। বিশেষ করে যারা বিবাহিতা নারী, তারা সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, নিজের সৌন্দর্য সব সময় ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কখনো যেন শরীরে ঘাম বা অন্য কোনো কিছুর দুর্গন্ধ হতে না পারে। চুলের যত্ন নিবে, প্রয়োজনে দৈনিক তেল ব্যবহার করে সৌন্দর্য বজায় রাখবে। চুল যেন পড়ে না যায় এবং দীর্ঘকায় থাকে, সেজন্য সবধরণের উপায় উপকরণ গ্রহণ করবে। কেননা, মেয়েদের চুল সুন্দর থাকা এবং দীর্ঘ হওয়া উভয়টি মেয়েদের সৌন্দর্যের অন্যতম একটি। তাদের এ সৌন্দর্য আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের নিকটও প্রশংসাযোগ্য। ফেরেশতাদের এক দল আল্লাহ্ তাআলার নিকট মেয়েদের চুলের প্রশংসা করে থাকে। নিজেদের তাসবীহ পাঠের মাঝে পুরুষদের দাড়িরও প্রশংসা করে থাকে। যা হোক মহিলাদের এসব সাজসজ্জা কেবল ঘরে থাকা অবস্থায়। ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য নয়। স্বামী ব্যতিত পরপুরুষকে দেখানোর জন্য নয়। কেবল স্বীয় স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট রাখতেই এসব সাজসজ্জা গ্রহণ করতে হবে। যেন তার স্বামী অন্য কোনো সুন্দরী সাজসজ্জাগ্রহণকারী নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে যায়। যখন পুরুষের নজর অন্য নারীর দিকে চলে যায় এবং তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, তখন সুখের সংসারে আগুন লেগে যায়, সংসারে আর সুখ বলতে কিছুই থাকে না। সব সময় অশান্তি বিরাজ করতে থাকে।

যে কথাটি মহিলাদের ভালোভাবে বুঝা উচিত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন রাস্তা বা বাজারের কোনো নারীর প্রতি তোমাদের দৃষ্টি পড়ে যাবে এবং সে নারীকে সুন্দরী মনে হবে, তখন দৃষ্টি নিম্নগামী করে বাড়িতে এসে নিজের স্ত্রীর সাথে তোমার চাহিদা পুরণ করবে। কেননা, সে মহিলার মধ্যে ঐ বস্তুই রয়েছে যা তোমার স্ত্রীর মধ্যেও রয়েছে।

পথে ঘাটে ও রাস্তার মহিলাদের রূপ, সাজসজ্জা বেশি হয়ে থাকে। অতঃপর পুরুষরা যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী আপন দৃষ্টি নিম্নগামী করে বাড়িতে এসে স্বীয় স্ত্রীকে অপরিচ্ছন্ন ময়লাযুক্ত অবস্থায় দেখে, তখন পুরুষদের অন্তরে পথে ঘাটে, রাস্তায় দেখা

মেয়েদেরকে সুন্দরী মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর যদি স্বামী সেসব রাস্তা ঘাটের মেয়েদের দ্বারা স্বীয় চাহিদা পূর্ণ করে, তাহলে এক্ষেত্রে গুনাহের মূল নায়ক কে হবে? স্বামীর এ পাপের মূল কারণ হবে স্বীয় স্ত্রী। সেজন্য স্বামীর পাপের সাথে সাথে স্ত্রীও পাপের ভাগী হবে।

মহিলাদের জন্য হেদায়াত

এজন্য আমি (মূল লেখক) আমার ধার্মীয় সকল বোনদেরকে বলব, তোমরা তোমাদের স্বামীর ইজ্জত আব্রু হেফাজতকারিনী হয়ে যাও। অপর মহিলাদের কাছে গিয়ে নিজের স্বামীর অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচানোর সব ধরণের চেষ্টা তদবীর গ্রহণ করো। অন্যথায় স্বামী গোনাহ্‌গার হওয়ার সাথে সাথে তোমরা পাপের ভাগী হয়ে যাবে। যদি একবার তোমার স্বামী অপর নারীর প্রেমে আসক্ত হয়ে যায়, তখন কিন্তু এর জন্য সারা জীবন তোমাকে কষ্টভোগ করতে হবে। কেননা, তোমাকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, হারাম কাজে মজা ও স্বাদ বেশি হয়ে থাকে। আর হালাল কাজের মধ্যে তুলনামুলক মজা ও স্বাদ কম হয়ে থাকে। এর বাস্তব অধিক মজা ও স্বাদ পরকালে পাওয়া যাবে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ গোপন ভেদ

তোমরা একথাটি চির সত্য বলে জানবে যে, হারাম নারী যত অসুন্দর ও কালো হোক না কেন, স্বীয় স্ত্রী এর বিপরীতে যত অসুন্দরীই হোক, সেসব হারাম নারী কিছু কিছু পুরুষদের চোখে বিশ্বসুন্দরী। তবে হ্যাঁ ধার্মীক নারী যতই কালো, কুশ্রী অসুন্দর হোক না কেন। সে যদি নামাযী, খোদাভীরু, পরহেযগার, পর্দানশীন, লজ্জাশীল হয়। তার চোহারায় নামাযের সৌন্দর্য ভাসতে থাকবে। তার প্রতি স্বামীর মহব্বত ভালোবাসা অস্বাভাবিক পরিমাণ জন্ম নিবে। বর্তমান সমাজে এর উপমা অনেক রয়েছে। সকলের মনের মালিক কেবল আল্লাহ্ তাআলা। আল্লাহ্ তাআলা যে কোনো লোকের মন যে কোনো নারীর দিকেই ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যদি কোনো নারী ঠিক মত আল্লাহ্ তাআলার হুকুম আহকাম পালন করে, তাহলে সে অবশ্যই তার প্রিয় বান্দী হয়ে যাবে। আর এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তার প্রিয় বান্দীর জন্য অবশ্যই তার স্বামীর মনকে তিনি তার দিকেই ঝুকিয়ে দিবেন।

গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সে মহিলার উপর রহমত বর্ষণ করে, যে মহিলা তার স্বামীকে দেখে মিষ্টি হাসী উপহার দেয়। তদ্রুপভাবে আল্লাহ্ তাআলা সেসব পুরুষদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, যারা স্বীয় স্ত্রীকে দেখে মিষ্টি হাসি উপহার দেয়। স্ত্রীকে হাসি দেওয়া এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বিশেষ। এসবই কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ভালোবাসা বৃদ্ধির উপায় উপকরণ। সে সাথে যিনা ব্যভিচার থেকে বাঁচারও অন্যতম হাতিয়ার।

মোটকথা, বর্তমানে স্বীয় স্ত্রী সুন্দরী ও রূপবর্তী হওয়া এবং স্বামীর সমসাময়িক বয়সের হওয়া উচিত। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর বয়স বেশি না হওয়াই সর্বোত্তম। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মেয়ে ফাতেমা রা.কে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. এর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসার পরও সম্মানিত দুই সাহাবির মধ্যে কারো সাথে বিবাহ দেন নি এজন্য যে, মেয়ের তুলনায় তাদের বয়স অনেক বেশি হয়ে যায়। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মেয়ে হযরত ফাতেমা রা.কে বিবাহের বয়স হওয়ার সাথে সাথে হযরত আলী রা. এর সাথে বিবাহে আবদ্ধ করেন।

কেমন নারীকে বিবাহ্ না করা উচিত

জ্ঞানীরা বলেন, নিম্নোক্ত মেয়েদেরকে বিবাহ্ না করা উত্তম।

এক. যে সকল মহিলা সব সময় বিরক্ত হয়ে থাকে এবং সবক্ষেত্রেই যে সব মহিলা হা-হুতাশ করে। কিংবা সবসময় যে মহিলা অসুস্থ থাকে। এসব মেয়েদেরকে বিবাহ করলে সাংসারিক জীবনে কোনো কাজেই বরকত পাওয়া যায় না।

দুই. উপকার করে খোঁটাদানকারী মহিলা।

তিন. প্রথম স্বামীর প্রতি আসক্ত মহিলাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে।

চার. যে সব মহিলা সর্বক্ষণ সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

পাঁচ. সব সময় অশ্লীল ভাষায় বকা-বাজীকারী মহিলাকে বিবাহ্ করবে না।

ছয়. বাচাল বা প্রলাপী মহিলাকেও বিবাহ্ করতে নেই।

সাত. বৃদ্ধা মহিলার সাথে সহবাসে যেহেতু যুবকদের মানসিক দুর্বলতা ও অলসতা সৃষ্টি হয়, সেহেতু বৃদ্ধাদেরকে বিবাহ করবে না।

জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, যুবতীদেরকে বিবাহ করে সহবাস করার দ্বারা জান তথা ভ্রুণ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে বৃদ্ধাদেরকে বিবাহ করে সহবাস করার দ্বারা অনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। সে সাথে অলসতা ও দুর্বলতা দেখা দেয়।

সহবাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা

প্রত্যেক বিবাহিত ছেলে-মেয়েদের সহবাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জরুরী। যে দম্পত্তি এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তাদের সহবাস ও জীব-জন্তুর সহবাসের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই বলে জ্ঞাণীরা মনে করেন। জীব-জন্তুর সহবাসের ক্ষেত্রে যেমন কোনো নিয়ম-নীতি নেই, তদ্রুপভাবে যেসব লোকেরা এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে না তারা সহবাসের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে না। বরং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সহবাস করে থাকে। এজন্য প্রথমে সহবাসের নিয়ম-নীতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যা উপকারী ও প্রয়োজনীয়। যেন এ বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা জ্ঞানার্জন করতে পারে। সহবাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ গঠনমূলক আলোচনা তানহায়ীকা সবক নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সহবাসের নীতিমালা

দিবা-রাত্রী সব সময় সহবাস করা যাবে। এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে দিনের পরিবর্তে রাতে সহবাস করাই উত্তম। যে রাতে সহবাস করার ইচ্ছা জাগবে দিনের বেলাই স্ত্রীর সাথে সে বিষয়ে আলোচনা করে রাখা উত্তম। যাতে স্বামীর জন্য স্ত্রী সেজেগুজে থাকতে পারে এবং নিজের গুপ্তাঙ্গ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারে। সাথে সাথে স্ত্রীরও সহবাসের প্রতি আগ্রহ জাগে। এতে স্বামীর উদ্দীপনার সাথে সাথে স্ত্রীর উদ্দীপনাও পূর্ণ হবে। যেমন, স্বামীর বীর্যপাতের আগ মুহূর্তে স্ত্রীকে জানালে স্ত্রীও তার চাহিদা স্বামীর সাথে সাথে পূর্ণ করবে। কেননা, বীর্যপাত অন্তর ও মস্তিষ্কের ধারণা থেকে উদ্দীপনার সাথে তরান্বিত হয়। আর যে রাতে সহবাস করবে সে দিন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিবে। যাতে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হলেও শারীরিক কোনো ক্ষতি না হয়।

সহবাস করার স্থান

সহবাস করার জন্য নির্ধারিত কোনো স্থান নেই। সব জাগায় সহবাস করা যাবে, তবে গোপন ও নির্জন স্থানে সহবাস করা উত্তম। ছাদবিশিষ্ট ঘরে এবং যে সব স্থানে লোকজনের বা বাচ্চাদের যাতায়াত নেই এমন স্থানে সহবাস করবে। সহবাসের সময় ঘরে বা বিছানায় এমন কোনো বাচ্চা রাখা ঠিক নয়, যারা সহবাস বিষয়ে জ্ঞান রাখে বা এ বিষয়ে তারাও স্বাদ ও আনন্দ পায়। তবে কোনো বাচ্চা যদি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সহবাসে কোনো সমস্যা নেই। যে ঘরে সহবাস করা হবে যে ঘরে যেন কোনো জীব-জন্তুও না থাকে। মোটকথা, সহবাসের জন্য নির্জন স্থান নির্বাচন করবে। খেয়াল রাখবে, যেন কোনো অবস্থাতেই পায়ু পথে অর্থাৎ পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস ভুলক্রমেও না হয়। হাদীসে এ রাস্তা দিয়ে সহবাস করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

সহবাসের সময় যে পোষাক পরিধান করতে হয়

সহবাস যে কোনো ভাবেই করা যায়। শরীরে কোনো কাপড় থাকুক বা না থাকুক এ জাতীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে একেবারে উলঙ্গ হয়ে সহবাস করাটা দেখতে অসুন্দর। কেননা, একেবারে উলঙ্গ হয়ে সহবাসকারীদের সন্তান অনেক ক্ষেত্রে নির্লজ্জ হয়ে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো একেবারে উলঙ্গ হয়ে সহবাস করেন নি। বরং সহবাসের সময় মাথার উপর কাপড় রাখতেন এবং সে সময় যত কথা বলতেন, সবই নিচু আওয়াজে বলতেন। আর স্ত্রীদেরকে বলতেন, তোমরা শান্তভাবে থাক। উশৃঙ্খল ও নড়াচড়া করতে নিষেধ করতেন। সহবাসের সময় পোষাক সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা স্বামী-স্ত্রী যখন সহবাস করবে, তখন গাধার ন্যায় একেবারে উলঙ্গ হয়ে সহবাস করো না। বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের সময় নিজেকে এবং স্ত্রীদেরকে কোনো না কোনো কাপড় দ্বারা আবৃত করে নিতেন।

সহবাসের মুহূর্তে মূল্যবান কথা

সহবাসের সময় নিজেকে ভীত মনে করবে না এবং ভয়ও পাবে না।

তাহলে সন্তানাদিও ভীতু জন্ম নিবে। সহবাসের সময় আপন স্ত্রী ব্যতিত কারো ছবি মনে কল্পনা করবে না। সহবাসের সময় অন্য মহিলাকে স্মরণ করে সহবাস করলে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করেও পাপি হতে হবে। এ সময় নিজের স্ত্রীকেই কল্পনা করবে। সহবাসের সময় কথাবার্তা যতো কম বলা যায়, ততই ভালো। সহবাসের সময় অধিক কথাবার্তা বললে, সন্তানাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুতলা ও বোবা হয়ে থাকে। পশ্চিম দিক মুখ করে সহবাস করবে না। এমন করা আদবের খেলাফ। অনেকে সহবাসের সময় স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখে থাকে। এটি খুবই খারাপ। কেননা, এর দ্বারা চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। কখনও আত্মভোলা রোগ হওয়ার সম্ভবনাও থাকে। সহবাসের সময় ধর্মীয় কোনো কিতাবাদি সামনে থাকলে, সেগুলোকে কোনো কিছু দ্বারা আবৃতি করে রাখবে। সহবাসের সময় কালো অসুন্দর ও কুশ্রী কারো ব্যাপারে বা সন্তানের চিন্তা করবে না। এতে জন্মগ্রহণকারী সন্তান কালো অসুন্দর ও কুশ্রী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এসম্পর্কে 'তানহায়ী কি সবক' নামক কিতাবে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষণীয় একটি বিরল ঘটনা

জনৈক ব্যক্তির একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। কিন্তু সন্তানটির মাথা দেখতে সাপের মাথার ন্যায় আর নিচের অংশ দেখতে মানুষের মত। বাচ্চার এ অবস্থা দেখে তার মাও তাকে দুধ পান করাতে ভয় পেত। ঘটনাটি কোনো এক বুযুর্গকে জানালে তিনি বললেন, সহবাসের সময় স্বামী স্ত্রী দু'জনের মধ্যে যে কেউ সাপের ছবি কল্পনা করেছিল। বুযুর্গ ব্যক্তির কথাটিকে স্বামী স্ত্রী উভয়ে সত্য বলে স্বীকার করল।

যে অবস্থায় সহবাস করা অনুচিত

১। মহিলাদের মাসিক বা ঋতুস্রাব অবস্থায়।

২। নিফাস (অর্থাৎ মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের পর চল্লিশ দিন বা এর কমে যে কয়দিনে রক্ত আসা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়) অবস্থায়। এ দু'সময়ের মধ্যে সহবাস করলে উভয়েই অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কেননা, এ সময়ের রক্তের প্রচুর পরিমাণ বিষাক্ত জীবানু থাকে। যার দ্বারা ভয়ানক রোগ হওয়ার সম্ভবনা প্রমাণিত। অনেক পুরষকে দেখা যে, এ

সময় সহবাস করার কারণে লজ্জাস্থানে এলার্জী জাতীয় বিভিন্ন রোগ হয়। লজ্জাস্থানে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়, আবার কারো ধাতু দুর্বলতা দেখা দেয়। এ সময়ের সহবাস দ্বারা সন্তান জন্ম নিলে অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের শরীরে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। শরীরে বিভিন্ন ধরনের ঘা হয়, যা থেকে অনবরত পানি ঝরতেই থাকে। এ সময়ের সহবাসে অনেক মহিলার মাসিকের রক্ত সহজে বন্ধ হয় না। সময় সময় রক্ত ঝরতেই থাকে এবং বাচ্চাদানী বাহিরে বের হয়ে আসে। আবার অনেক সময় মহিলাদের ভ্রূণ নষ্টের রোগ হয়ে থাকে। সাথে সাথে বাচ্চাদানীও দুর্বল হয়ে যায়। এছাড়াও এসময়ের সহবাসে নারী-পুরুষ উভয়েই বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কেননা ঋতুস্রাব ও নেফাসের রক্তে শরীরের ভিতরের রোগ জীবানুযুক্ত অপবিত্র উপকরণ থাকে। সে সাথে বিষাক্ত জীবাণুও থাকে। রক্ত স্রাবের সময় মহিলাদের সর্বক্ষণ রক্ত নির্গত হওয়ার কারণে কারো কারো যৌনাঙ্গটি এক প্রকার ফোলা ও উষ্ণ থাকে। ঋতুস্রাব বা নেফাস থেকে পবিত্র হয়ে গোসল করার আগ পর্যন্ত মাহিলাদের সাথে সহবাস করবে না।

৩। কাজের ব্যস্ততা বেশি থাকলে সে সময় সহবাস

৪। চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী ও বিচলিত হালতে সহবাস

৫। দুর্বল ও ক্লান্ত অবস্থায় সহবাস না করা।

৬। মাতাল অবস্থায় সহবাস না করা।

৭। পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে সহবাস না করা।

৮। একেবারে খালি পেটে অথবা ভরাপেটেও সহবাস না করা। এ অবস্থায় সহবাসে পেটের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এমনকি পাকস্থলী কলিজার উপর চলে আসারও সম্ভবনা রয়েছে।

বিজ্ঞদের মতে ভরাপেটে সহবাস করলে শগর (অর্থাৎ পেশাবের সাথে পুঁজ পড়া এবং শরীর খুবই দুর্বল হয়ে যাওয়া) রোগ হয়ে থাকে আবার একেবারে খালি পেটে সহবাস করা শরীরের জন্য আরও ক্ষতিকর। কেননা বীর্যপাতের পর অণ্ডকোষ নিজের খাদ্য চর্বি থেকে তলব করে থাকে। আর চর্বি নিজের খাবার তলব করে কলিজা থেকে। কলিজা তার খাবার তলব করে পাকস্থলী থেকে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেট থাকে একেবারে খাবার শূন্য। যার কারণে টিবি, ভীতিপ্রদ রোগ, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অসুস্থতা থেকে মুক্তির পর শারীরিক দুর্বলতা এখনো অবশিষ্ট আছে এ

অবস্থায় সহবাস না করা। মৃগ রোগ, টিবি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সহবাস থেকে দুরে থাকবে। মস্তিষ্ক ক্ষয় হয় এমন কাজের পর সহবাস না করা। যাদের চোখের দৃষ্টির রোগ, শারীরিক দুর্বলতা ও কলিজা, পাকস্থলী দুর্বল, তাদের জন্যও সহবাস করা ক্ষতিকর। তদ্রুপভাবে অর্শ্ব ও যৌনরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সহবাস থেকে যথাসম্ভব দুরে থাকবে।

৯। যাদের গনোরিয়া রোগ রয়েছে, তারাও সহবাস থেকে যথাসম্ভব দুরে থাকবে।

১০। অসুস্থ অবস্থায় ও জীবাণুযুক্ত বাতাস প্রবাহের সময় সহবাস না করা উচিত।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের ধারণা মতে চাঁদের এগারো তারিখে সহবাস করা নিজের বয়স কমিয়ে ফেলারই নামান্তর। তারা আরো বলেন, চাঁদের প্রথম রাত, মধ্য রাত এবং শেষ রাত অর্থাৎ মাসের শেষ দিনের রাতে সহবাস করবে না। কেননা এ সময়ে মহিলাদের সাথে শয়তান সহবাস করে থাকে, ফলে এ সময়ে স্বামী সহবাস করার দ্বারা সন্তান জন্ম নিলে অধিকাংশ সন্তান দুর্বল, বিকলাঙ্গ ও অঙ্গহানী হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়সের পূর্বে ভ্রুণ তৈরী হলে সে সন্তান অসুস্থ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিদের মতে রাত্রে প্রথমাংশে সহবাসের দ্বারা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে সেসব সন্তান অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করে। আর রাতের শেষ প্রহরে সহবাস করার দ্বারা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সন্তান সুস্থ সবল ও ধর্মভীরু হয়ে থাকে।

কতদিন পরপর সহবাস করা উচিত

বর্ণিত আছে জনৈক ব্যক্তি হাকীম ছাকরাতকে জিজ্ঞেস করেন যে, একজন সুস্থ ও সবল ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কতদিন পরপর সহবাস করবে? জবাবে হাকীম সাহেব বললেন, বৎসরে একবার। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, যদি কারো যৌনশক্তি ও উত্তেজনা এবং চাহিদা অধিক হয়? হাকীম সাহেব বললেন, তাহলে মাসে একবার। লোকটি আবারে জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে ব্যক্তি এতেও পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলে? হাকীম সাহেব বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে একবার। ঐ লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, এতেও যদি সে তৃপ্ত না হয়, তাহলে? হাকীম সাহেব বললেন, ধাতু বা বীর্য মানুষের শরীরের চালিকা শক্তি ও তৈল। সুতরাং যদি কেউ প্রতি সপ্তাহে একবার সহবাস করেও তৃপ্ত না হয়,

তাহলে সে যেন নিজের আত্মাকে বের করে ফেলে এবং জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত ব্যক্তির কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। আর সে সাথে কবরের জন্যও প্রস্তুতি নেয়। সুতরাং সহবাসের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। একেবারে বেশিও না আবার একেবারে কমও না। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কতক জ্ঞানীরা বলেন, প্রতি তিনদিন পরপর সহবাস করা উচিত। তিন দিনের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই সহবাস করবে না। পরিতৃপ্ত ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত খাবার যেমন ক্ষতিকর। ঠিক ঐরূপভাবে বেশি বেশি সহবাস করাও ক্ষতিকর। মোটকথা হলো, যৌনচাহিদার প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পুরুষের যৌনক্ষুধার আলামত

কোনো খারাপ কল্পনা জল্পনা করা ছাড়াই যদি কোনো পুরুষের যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে যায় এবং তা লম্বা হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এখন তার সহবাসের প্রয়োজন এবং তার যৌনক্ষুদা জাগরিত হয়েছে।

যৌনক্ষুধা থাকা না থাকা অবস্থায় সহবাসের উপকারিতা ও অপকারিতা

সহবাসের চাহিদা জাগরিত হওয়ার পর সহবাস করলে মনে একপ্রকার খুশি, প্রফুল্লতা, আনন্দ ও আরাম অনুভব হয় এবং সাথে সাথে জ্ঞান-বুদ্ধিও বৃদ্ধি পায়। প্রক্ষান্তরে সহবাসের চাহিদা না জাগা সত্ত্বেও সহবাস করলে সহবাসে অলসেমী অনুভব হয় এবং বীর্যপাতে তেমন কোনো আনন্দ বা স্বাদ পাওয়া যায় না। জ্ঞান কমে যায়। রাগ সৃষ্টি হয় এবং সহবাসের পর নিজেকে লজ্জিত ও হতাশা ভাবসম্পন্ন মনে হয়। সহবাসের মাঝে বিরতি দিলে দুর্বলতা অনুভব হয়। কেননা, মানুষ জন্মগতভাবে সহবাসের প্রতি আসক্ত। এ আসক্ততা অন্য কোনো বস্তুর ন্যায় নয়। এ আসক্ততার জন্য মানুষ কি না করে! দুনিয়ার সব বিসর্জন দিয়ে দেয়। একজন মহিলার জন্য নয় থেকে দশ মাস গর্ভে বাচ্চা ধারণ করা যে কত কঠিন বিষয় সেটি কেবল মহিলারাই বুঝে থাকে। তারপরও এ কঠিন কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা ভুলে স্বামীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় এবং এর দ্বারা যে সুখ ও আনন্দলাভ করে, তা ঐ কষ্টের তুলনায়

অনেক বেশি মজাদার মনে হয়। যে পুরুষ বা মহিলা একবার এর মজা অনুভব করেছে, সে আর তা বর্জন করতে পারে না। অতঃপর তাকে যৌনমিলনের তাড়নায় অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে। এজন্যই সহবাসের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সকল ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হাদীসের বাণি।

সহবাস মাত্রাতিরিক্ত করার ক্ষতি

যৌবনের তাড়নায় ব্যাকুল হয়ে সহবাসের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন না করলে। ভবিষ্যতে এর যে ক্ষতি রয়েছে, সেদিকেও ভ্রুক্ষেপ না করলে। অথবা জীবনের শুরুতে মাত্রাতিরিক্ত সহবাস করলে বেশিরভাগ মানুষ শেষ জীবনে একেবারে অচল হয়ে যায়। তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যায়। শরীরের মাঝেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যায়। রোগ-ব্যাধি যেন তার প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আবার কারো অবস্থা এমন হয় যে, তাদের জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম। তাকে দেখলে আপন সন্তানাদি ও স্ত্রীর অনিহা ভাব সৃষ্টি হয়। তাকে দেখলে ঘৃণা আসে। তদ্রুপভাবে কখনো কখনো সন্তানাদি ও স্ত্রীও তার নিকট অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র বনে যায়।

সহবাসের জন্য অগ্রীম প্রস্তুতি

পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও নির্জন স্থানই সহবাসের উপযুক্ত স্থান। সহবাসের সময় সুগন্ধী ও আতর সুঘ্রাণ ব্যবহার করা উত্তম। এসব ব্যবহার করলে হৃদয়ে আনন্দের বাতাস বয়ে যায়। মনের আনন্দ উল্লাসের সাথে সাথে যৌনচাহিদাও বাড়তে থাকে। কারণ আতর সুঘ্রাণ মানুষের অন্তরে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দানকারী উপাদান বিশেষ। যেসব স্থানে লোকজনের যাতায়াত চলে, সেসব স্থানে সহবাস করবে না। কারণ এসব স্থানে সহবাস করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, যৌনচাহিদা, উদ্দীপনা লোকজনের যাতায়াতের দরুন হ্রাস পেতে থাকে। মহিলাদের জন্যও সহবাসের পূর্বে পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেকে সাজিয়ে নিবে। নিজে পূর্ণাঙ্গ সাজ-সজ্জা গ্রহণ করবে। অতঃপর স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মহব্বত ভালোবাসার কথা বলবে, মন ভোলানো নরম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। পরস্পরে আনন্দ-ফুর্তি ও মজার মজার কথা বলবে। একে অপরকে জড়িয়ে

ধরে চুম্বন করবে। প্রেম ভালোবাসা দিয়ে একে অপরকে মোহিত করে ফেলবে। এতে পরস্পরের মাঝে মহব্বত ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। এসব করলে সহবাসের প্রতি উভয়ের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে। সহবাসের পূর্বে স্ত্রী তার যৌন স্থানকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধৌত করবে। এতে তার জরায়ু ছোট ও সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। অতঃপর যৌন স্থান পরিস্কার নেকড়া দিয়ে মুছে সুঘ্রাণ ব্যবহার করবে। এর দ্বারা স্বামীর মনে ভিন্ন একধরনের মজা অনুভব হবে। সবশেষে আপন বাসনা পূরণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

সহবাসের আদব

সহবাসের যতগুলো আদব রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল স্বামী-স্ত্রী একে অপরের লজ্জাস্থান না দেখা। যদিও তা দেখার দ্বারা অনেকের যৌনস্পৃহা বৃদ্ধিপায়। কিন্তু তা দেখার দ্বারা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। অতঃপর স্বামী তার স্বীয় লিঙ্গ অর্থাৎ প্রজনন যন্ত্র স্ত্রীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে থামিয়ে রাখবে। যেন স্ত্রীর যৌনক্ষুধা চরমে পৌঁছে এবং চোখের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এরপর স্বামী তার স্বীয় লিঙ্গ তীব্রতার সাথে প্রবেশ করতে তরান্বিত করবে এবং তরঙ্গের মত উঠানামা করাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অতি মাত্রার কাঠিন্যাতা, তীব্রতা, প্রচণ্ডতার সাথে লিঙ্গ চলাচলের দ্বারা কোনো কোনো মহিলারা জরায়ুর রোগে আক্রান্ত হয়। আর এরকম অতিমাত্রায় প্রচণ্ডতার সাথে সহবাস করাও মাকরুহ বা নিষেধ। কিন্তু এভাবে সহবাস করতে স্ত্রী যদি আনন্দবোধ করে এবং স্বামীকে একাজে উৎসাহ দেয় ও এর মাধ্যমে সে তৃপ্তি পায় বলে প্রকাশ করে, তাহলে মাকরুহ নয়। স্বামীর বীর্যপাতের সময় স্ত্রীও বীর্যপাতের অনুকূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে। স্বামীর বীর্যপাত আগে হলে, স্ত্রীর বীর্যপাতের জন্য স্বীয় লিঙ্গ যৌনাঙ্গে রেখে নাড়াচাড়া করতে থাকবে। আর যখন স্ত্রীর জরায়ূ শিথিল হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে যে, স্ত্রীরও বীর্যপাত হয়েছে। বীর্যপাতের পর স্ত্রী বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবে, যাতে স্বামীর বীর্য স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে চলাচল করবে না। সেই সাথে পেশাবও করা থেকে বিরত থাকবে।

সহবাসের উত্তম পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে অভিজ্ঞ হাকিমগণও সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর তা

হল– স্ত্রী নিজের পিঠের কণ্ঠন সোজা করে শয়ন করবে এবং স্বামী স্ত্রীর দুই রানের মাঝখানে এসে আপন লিঙ্গ স্বীয় স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করিয়ে সহবাস করবে। এ পদ্ধতি ছাড়াও আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এ বিষয়ে উপমহাদেশের হাকীমগণ ছত্রিশটি পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও সব ধরণের পদ্ধতিতে স্বাদ উপভোগ করা যায়। কিন্তু এতে স্বামী স্ত্রী পরস্পরে কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। বেশিরভাগ সময় ঐ ছত্রিশ পদ্ধতির মধ্যে বীর্য স্ত্রীর রেহেমের মধ্যে স্থায়ী হয় না। বিশেষ করে এ পদ্ধতিতে যখন স্ত্রী উপরে আর স্বামী থাকে নিজে। যদিও এ পদ্ধতিতে বেশি স্বাদ উপভোগ করা যায়। হাকীম বকরাত, জালিস ও এরিস্টটল একথার উপর একমত যে, মহিলারা দীর্ঘদিন সহবাস থেকে দূরে থাকলে জরায়ু প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হয়। আর এই প্রকার রোগের একামাত্র চিকিৎসা হলো সহবাস করা।

অত্যন্ত উপকারী গোপন রহস্য

সচেতন ও বুদ্ধিমান স্বামী কখনো স্ত্রীর নিকট পরাজয় বরণ করে না। স্বামী যদি ইচ্ছা করে তাহলে স্ত্রীকে সহবাসের ক্ষেত্রে সব সময় হারাতে পারবে। এরজন্য নিজেকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তবেইতো সে সব সময় বিজয়ী হবে। আল্লামা হাকীম আশরাফ আলী আমহরবী [এ কিতাবের লেখক] বলেন, বুদ্ধিমান স্বামীর উচিত যতক্ষণ স্ত্রীর বীর্যপাত না হয়, ততক্ষণ স্ত্রী থেকে পৃথক না হওয়া। যদি স্ত্রীর বীর্যপাতের পূর্বেই নিজের বীর্যপাত হবে বলে মনে হয়, তাহলে এহেন মুহূর্তে তাড়াতাড়ি স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং দ্রুততার সাথে শ্বাস গ্রহণ করবে। অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, যাতে তার বীর্য পূর্বের ন্যায় আপন স্থানে ফিরে যায়। এবার পুণরায় সহবাসে লিপ্ত হবে এবং সহবাসকালে স্ত্রীর ঠোঁট চুম্বন করবে। স্তনের বোটা মলতে থাকবে [প্রয়োজনে স্ত্রীর স্তন মুখে নিয়ে চুষতে থাকবে, দুধ জারি মহিলাদের ক্ষেত্রে স্তনের বোটা জিহ্বার নিচে এমনভাবে রেখে চুষতে থাকবে যেন কোনো ক্রমেই স্ত্রীর বুকের দুধ বের না হয়। কেননা স্ত্রীর দুধ পান করা স্বামীর জন্য হারাম। যদি ঘটনাক্রমে মুখের ভিতর চলে যায়, এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তওবা করবে। তবে অনেকে মনে করে যে, এর কারনে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।] এবং লিঙ্গের

মাথাকে জরায়ুর মুখে নাড়াচাড়া করতে থাকবে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার দ্বারা স্ত্রীর বীর্যপাত তরান্বিত হয়। আর যখন স্ত্রীর বীর্যপাত হতে শুরু হয়, তখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং দ্রুততার সাথে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে। আর যখন স্ত্রীর বীর্যপাত শেষ হয়ে যায়, তখন স্ত্রী তার স্বামীকে জানপ্রাণ দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসে। এই পদ্ধতিতে যখন তারা সহবাস করবে, তখন এ স্বামীর দ্বারা স্ত্রী সর্বদা প্রফুল্লতা লাভ করবে এবং নিজের জীবনকে অনেকটা অর্থপূর্ণ মনে করবে। উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহ স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের প্রেমে ব্যাকুল করার অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও স্ত্রীকে তৃপ্তি দেওয়ার আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যা সামনে উল্লেখ করা হবে।

মহিলাদেরকে উত্তেজিত করার বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, স্বামীর জন্য উচিত স্ত্রীকে তার যৌনক্ষুধায় উত্তেজিত করা। আর স্ত্রীকে উত্তেজিত করার পদ্ধতিও প্রত্যেক নারীর জন্য প্রযোজ্য নয়। বরং একক নারীর জন্য একেক রকম পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সব নারীই এক নয় বরং কারো চাহিদা ভিন্ন রকমও রয়েছে। এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আসল কথা হলো স্বামী অনেকটাই বুঝতে পারে যে, তার স্ত্রী কি চায়। কি কাজ করলে স্ত্রী উত্তেজিত হবে। এ বিষয়টি অনেক স্বামীই বুঝতে পারে এবং তার স্ত্রীকে তদানুযায়ী তৃপ্তি দিতে পারে। আবার অনেক স্বামী রয়েছে, যারা নিজেরাই সহবাস বিষয়ে পারদর্শী নয়। যার কারণে সে নিজেও এর স্বাদ পূর্ণাঙ্গভাবে উপভোগ করতে পারে না এবং স্ত্রীকেও দিতে পারে না। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে অবশ্যই উত্তেজিত করবে।

হাদীসের ভাষায়ও পাওয়া যায় যে, তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সরাসরি সহবাস কর না। বরং প্রথমে তাদেরকে নরম নরম কথা বলে, মিষ্টি আলাপ করে, ভালোবাসার কথা বলে, চুম্বন ও বক্ষ মৈথুন করে আলিঙ্গনাবদ্ধ কর। অর্থাৎ প্রথমে স্ত্রীদেরকে উত্তেজিত কর অতঃপর সহবাস কর।

যেসব অঙ্গ স্পর্শে মহিলারা উত্তেজিত হয়

মহিলাদের এমন বিশেষ কিছু অঙ্গ রয়েছে, যা স্পর্শ করার দ্বারা তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারো কারো চুলে বিলি কাটার দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আবার কারো যৌন উত্তেজক কথাবার্তা বলার দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আবার এমন অনেক মহিলা পাওয়া যায়, যাদের গর্দানে চুমো দিলেই তাদের

মাঝে উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। আবার কাউকে কাতুকুতু, সুঁড়সুঁড়ি দিলেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, অধিকাংশ মহিলাদের নিতম্ব স্পর্শ করার দ্বারা দ্রুত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে, যেন তাদের মাঝে যৌন চাহিদা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

চুম্বনের বহুরূপ

যেসব নর-নারী কখনোও কোনো যৌন সংসর্গ করে নি, তাদের পক্ষে চুম্বনের কতগুলি নিয়ম আছে। যথা–

❖ অনেক মেয়ে জীবনের প্রথম দিকে তার স্বামীর সাথে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। স্বামী তাকে জরিয়ে ধরে চুমো দিতে চায়। সে মুহূর্তে তার অবস্থা দেখলে মনে হয়, সে একটি লজ্জাবতি বৃক্ষ। লজ্জাবতি বৃক্ষের ন্যায় কেমন জানি সে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখলে মনে হয় সে তার স্বামীকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আসলে তা নয় বরং সে লজ্জাবোধ করছে বলেই নিজের অব্যক্ত কামনা [চুম্বন করা] পুরণ করতে পারছে না। অনেক সময় দেখা যায়, স্বামীর চুম্বনে চুম্বনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না বলেই নিজে থর্ থর্ করে কাপছে।

❖ স্ত্রী যখন তার স্বামীর সাথে মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠে এবং তাদের মাঝে লজ্জা-শরমের দেয়াল কিছুটা কমে যায়। তখন দেখা যায়, চুম্বনের প্রতি সেই স্বামীর তুলনায় আগ্রহী। তার প্রমাণ এভাবে পাওয়া যায় যে, স্বামী যখন তাকে চুম্বন করতে থাকে, তখন সে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে নেয়। তারপর অতি ধীরে ধীরে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে থাকে। এমনকি সে নিজেই তার স্বামীর ওষ্ঠদ্বয় চুষতে থাকে। এতে সে অনির্বাচনীয় আনন্দ লাভ করে।

সাধারণভাবে পুরুষ নারীর মধ্যে পরিচয় গভীর হলে তারা যে কয় প্রকারে একে অপরকে চুম্বন করে থাকে তা এভাবে বলা যায়–

❖ প্রেমিক প্রেমিকা সোজাসুজি মুখে মুখে, ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুম্বন করে থাকে।

❖ আবার কিছু নারী এমন রয়েছে যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে চুম্বন করে তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর দু'জনেই চুম্বন করতে থাকে। দু'জনের ঠোঁট পরস্পর আড়াআড়িভাবে থাকে এবং সজোরে চুম্বন করতে থাকে।

❖ কিছু কিছু স্বামী এমন রয়েছে যে, স্ত্রীকে চুম্বনের সময় এক হাত দিয়ে স্ত্রীর অধর নিজের দিকে ফিরিয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে তার চিবুক ধরে রাখে। তারপর তার দু'টি ঠোঁটে চুম্বন করে।

❖ অনেক স্বামী স্ত্রী একে অপরকে চুম্বন করার সময় শিষ দেবার মত শব্দ করেও চুম্বন করে থাকে।

❖ আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগানোর উদ্দেশ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে হালকাভাবে চুম্বন করতে থাকে। তদ্রুপভাবে স্ত্রীও তার স্বামীকে জাগানোর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে। এতে পরস্পরের প্রতি মহব্বত ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। স্বামীর এরকম আনন্দ ও দুষ্টামী পেলে সে মনে করবে আমার স্বামী কেবল আমাকেই ভালোবাসে। সে আমাকে ছাড়া কিছুই বুঝে না। ফলে সেও তার স্বামীকে জান প্রাণ উজার করে ভালোবাসতে থাকবে।

❖ অনেক পুরুষ তার স্ত্রীকে চুম্বন করতে করতে একসময় স্ত্রীর জিহ্বা চুষতে থাকে। তখন স্ত্রীও তার সাথে শরীক হয়ে যায় এবং স্বামীকে সেও তেমনটি করতে থাকে। অনেক লোক ধারণা করতে পারে যে এটি হয়তো শরীয়তে সমর্থন করবে না। এটা শরীয়ত গর্হিত কোনো কাজ নয়।

❖ অনেক স্বামী স্ত্রী যাদের মাঝে মিল-মহব্বত অতি মাত্রায় পাওয়া যায়। তারা পরস্পরে চুম্বন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অনেক সময় তারা পরস্পরে চুমাচুমির এক পর্যায়ে বলে যে, আস আমরা চুম্বনের প্রতিযোগিতা করি। দেখি কে বেশিক্ষণ চুম্বন করতে পারে।

সাধারণতঃ স্বামীই বেশিরভাগ জয়ী হবে, তখন স্ত্রী কৃত্রিম তর্ক করবে। বলবে- অন্যায়ভাবে আমাকে হারানো হয়েছে। স্বামী তাকে মিষ্টবাক্যে ভুলিয়ে আবার চুম্বন প্রতিযোগিতা শুরু করবে। এবারে স্ত্রীকে ইচ্ছা করেই জয়ী করা হবে। তখন সে আনন্দে হাসবে, নাচবে, অঙ্গভঙ্গী করবে। কিন্তু তখন সে যদি স্বামীকে ঠাট্টা করে, তখন রাগলে চলবে না। বরং তাকে আদর করে আরো চুম্বন দিয়ে বলবে আসলে তুমিই আমাকে বেশি ভালোবাস।

❖ অনেক সময় স্বামী অবিরাম মেহনত করে থাকে, স্ত্রী মনে মনে ভাবে বেচারা সেই যে কাজ শুরু করেছে, থামার কোনো নাম গন্ধও নেই। তাকে একটু শান্তনা দেয়া দরকার। এই ভেবে চিন্তা করে যে, তাকে কিভাবে আনন্দ দেয়া যায়। তখন মাথায় আসে যে, আমি তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে যে

কোনো এক পার্শ্বের গালে চুম্বন করব। অবশেষে তা বাস্তবায়ন করে দেয়। এতে স্বামীর পেছনের যে কষ্ট হচ্ছিল, তা একেবারে ভুলে যায়। তার মনে হয়, কই কাজ কাম করতে তো কোনো কষ্টই হচ্ছে না।

❖ অনেক সময় স্বামী বেচারা বিলম্বে বাড়ি ফিরে দেখে সোহাগিনী তার উপর অভিমান করে বসে আসে। তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় মুখভর্তি করে পিঠার চাল ভিজিয়েছে। বিধায় গালদ্বয় ফুলে উঠেছে। তখন স্বামী উচিত তার এ কৃত্রিম অভিমান ভাঙ্গানো। এহেন পরিস্থিতিতে অনেকেই ভুল করে থাকে। রাগারাগি শুরু করে এবং স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আসলে এরূপ পরিস্থিতিতে রাগারাগি না করে তাকে খুশি করার চেষ্টা করা দরকার। এজন্য অনেক সতেচন স্বামী তখন স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তার প্রশংসা করতে থাকে এবং বিভিন্ন স্থানে চুম্বন করতে থাকে। একসময় স্ত্রী হেঁসে দেয়। আর হাঁসার সাথে সাথেই তার সব অভিমান শেষ হয়ে যায়।

চুম্বনের স্থান

মহিলাদের যেসব স্থানে চুম্বন করলে তারা আনন্দপায় এবং স্বামীর পক্ষ থেকে এরূপ চুম্বন সর্বদাই কামনা করে থাকে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। স্ত্রীর গাল বা গণ্ডদ্বয়। ২। ওষ্ঠ–অধর।
৩। কপাল বা ললাট। ৪। মাথা ও চুল।
৫। চক্ষুদ্বয়। ৬। স্তনদ্বয়।
৭। কাঁধ, ঘাড়। ৮। বুক।
৯। নিতম্বদ্বয়। ১০। নাভী বা তলপেট।
১১। জিহ্বা। ১২। কানের লতি।
১৩। আঙ্গুলের মাথা। ১৪। উরু।
১৫। তলপেট। ১৬। বগল।
১৭। পিঠ। ১৮। গলা।
১৯। কটিদেশ। ২০। স্তন্যদ্বয়ের বোটা।
২১। ভগাঙ্কুর। ২২। যৌন প্রদেশ।
২৩। ভগাঙ্কুর মুণ্ড। ২৪। ভগাঙ্কুর ঢাকা চর্ম।

কিন্তু অনেক লোকেরই এ বিষয়ে সতচেন না হওয়ায় তাদের স্ত্রী তার দ্বারা তেমন একটা আনন্দ পায় না। অনেক মহিলা বলে যে, আমার স্বামী আস্ত

একটা বলদ। শুধু বিয়েই করেছে। কিচ্ছু বুঝে না। এ ব্যক্তি কেন যে পুরুষ হল, তা আমি কোনোক্রমেই বুঝি না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে মহিলা যতটুকু পারদর্শী পুরুষ ততটা পারদর্শী নয়। কিন্তু মহিলা সে লজ্জা শরমের কারণে মনের সুপ্ত কথাগুলো স্বামীকে বলতেও পারছে না আবার নিজেকে শান্তনাও দিতে পারছে না। যখন সে তার বান্ধবীদের কাছে তাদের স্বামীর আদর মহব্বত ও গোপনীয় কথাবার্তা শুনে, তখন তার হৃদয়টা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং মনে মনে ভাবে হায়! আমার স্বামী যদি এসব কিছুটা বুঝতো। তাহলে আমার জীবনটা সার্থক হতো।

তারিখ ভেদে স্ত্রীলোকের কামকেন্দ্রসমূহ

যৌনশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, স্ত্রীলোকের কামকেন্দ্র সর্বাবস্থায় একই স্থানে থাকে না। বরং স্ত্রীলোকের কামকেন্দ্র বিভিন্ন তারিখে শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে থাকে। ইহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির কৌশলমাত্র। অতএব কামকেন্দ্রের অবস্থআনের তারিখ অনুসারে স্ত্রীর ঐ সকল স্থানে মর্দন, চুম্বন ও স্পর্শ করলে, সঙ্গমের সময় স্ত্রীকে পূর্ণ তৃপ্ত করা যায় এবং অতি সহজে তার বীর্য যৌনী পথে এসে থাকে।এই প্রক্রিয়া জানা থাকলে স্ত্রীর নিকট লজ্জা পেতে হয় না।

চন্দ্রের তারিখানুসারে স্ত্রীর কামকেন্দ্র

১লা তারিখে–পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে থাকে।
২য় তারিখে– পদদ্বয়ের তলায় থাকে।
৩য় তারিখে– পদদ্বয়ের গিরায় থাকে।
৪র্থ তারিখে– উরুদ্বয়ের নিম্নভাগে থাকে।
৫ম তারিখে– উরুদ্বয়ের মধ্যভাবে থাকে।
৬ষ্ঠ তারিখে– কোমরের ভিতরে থাকে।
৭ম তারিখে– যৌনীনালীর মধ্যস্থানে থাকে।
৮ম তারিখে–নাভীর ভিতরে থাকে।
৯ম তারিখে– স্তনদ্বয়ের ভিতরে থাকে।
১০ম তারিখে–গলায় থাকে।
১১ তারিখে– মুখমণ্ডলে থাকে।

১২ তারিখে–নীচের ঠোঁটে থাকে।
১৩ তারিখে–কর্ণদ্বয়ের ভিতর থাকে।
১৪ তারিখে–কপালের মধ্যে থাকে।
১৫ তারিখে–মাথার তালুতে থাকে।
এরপরে পূণরায় নিম্নগামী হতে থাকে।
১৬ তারিখে–মাথার নিম্নাংশে নেমে থাকে।
১৭ তারিখে–চক্ষুদ্বয়ে এসে থাকে।
১৮ তারিখে–ওষ্ঠদ্বয়ে এসে থাকে।
১৯ তারিখে–মুখে এসে থাকে।
২০ তারিখে–থুতনীতে এসে থাকে।
২১ তারিখে–গলায় থাকে।
২২ তারিখে–বক্ষস্থলে থাকে।
২৩ তারিখে– মেরুদণ্ডে থাকে।
২৪ তারিখে–চোতরে থাকে।
২৫ তারিখে–উরুদ্বয়ে থাকে।
২৬ তারিখে–উরুদ্বয়ের মাঝখানে থাকে।
২৭৭ তারিখে–হাটুদ্বয়ের ভিতরে থাকে।
২৮ তারিখে–পদদ্বয়ের গোড়ালিতে থাকে।
২৯ তারিখে–পেশাবদ্বারে থাকে।
৩০ তারিখে– পদদ্বয়ের তলায় থাকে।

নারীর দেহে মর্দন বা টিপুনীর স্থান

অনেক পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে কেবল সহবাস করলেই তার দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন হয়েছে বলে ধারণা করে থাকে। আসলে তা নয়। বরং সহবাসের সাথে আরো অনেক কিছু সম্পৃক্ত রয়েছে। সহবাসের সাথে যেসব বিষয় সম্পৃক্ত তন্মধ্যে নারীর দেহের বিশেষ কিছু স্থান মর্দন করা বা টিপা'ও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। নারীর কোন্ স্থান মর্দন করলে তাদের মন খুশি হয় ও তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। দু'টি কাঁধ। ২। মাথা। ৩। স্তনবৃত্ত।
৪। পাছা। ৫। পিঠ।

৬। স্তন দু'টির বোটা হালকাভাবে ডলাডলি করা।
৭। তলপেটে হালকাভাবে হাতের ছোয়া দেয়া।

বিশেষ গোপন কথা

এ বিষয় সকলকেই অবগত হওয়া দরকার যে, বিজ্ঞানীদের মতে সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বীর্যপাত হলেই কেবল সন্তান হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর যদি এমন হয় যে, সহবাসের দ্বারা কেবল স্বামীর বীর্যপাত হলো, কিন্তু স্ত্রীর বীর্যপাত হলো না, তাহলে এ সহবাস দ্বারা সন্তান জন্ম নিবে না। তদ্রুপ সহবাসে স্ত্রীর বীর্যপাত হলো কিন্তু স্বামী বীর্যপাত হলো না। এতেও কোনো সন্তান জন্ম নিবে না। তবে আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন। সবই তার আয়াত্মাধীন। কিন্তু দুনিয়ায় যা সাধারণত আমরা দেখি ও জানি তাতে বলা যায় যে, হাজারো ঘটনা এমন রয়েছে যে, সহবাসের সময় স্বামীর বীর্যপাত হয়েছে কিন্তু স্ত্রীর বীর্যপাত হয় নি। যার কারনে এ সহবাসে কোনো সন্তান জন্ম নেয় নি। সুতরাং সন্তান কামনার্থী স্বামী-স্ত্রীর উচিত যে, স্বামীর বীর্যপাতের সাথে সাথে স্ত্রীর বীর্যপাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সেই সাথে স্ত্রীর চাহিদা পূরণ হলো কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখা। কেবল নিজের চাহিদা পূর্ণ করে স্ত্রী হতে পৃথক হওয়া স্ত্রীর জন্য অনেক অতৃপ্তি ও কষ্টদায়ক কথা। যা তাদের মনের কথা, নিজেরা ব্যক্ত করতে পারে না। তাদের বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফাটে না। অর্থাৎ বুকের মাঝে এ কষ্ট সহ্য করে কিন্তু তার মনের এ কষ্ট মুখে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। তাই নিজের মনের জ্বালায় পুড়তে থাকে। স্বামী নিজের চাহিদা পূরণ করেই ক্ষান্ত হলে এবং প্রায় সময়ই এমন করলে, অনেক সময় দেখা যায়, তাদের সংসারে অশান্তি নেমে আসে একে অপরের শত্রু হয়ে যায়।

বর্তমান কালের সত্য ঘটনা

১৯৯৮ ইং সাল ১৪১৯ হিজরীতে জুমার নামাযের পর জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলতে লাগল, হুযূর! আমার ছেলের বউ খোলা তালাক নিতে চাচ্ছে অর্থাৎ ছেলেকে টাকা দিয়ে নিজে তার থেকে তালাক নিতে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? সে বলল, শুধু এজন্য যে, [আমার ছেলে] প্রতি রাতে কেন তার সাথে নিম্নে চারবার সহবাস করতে পারে না। এ

ব্যাপারে স্ত্রীর বক্তব্য হলো, আমার স্বামীর দূর্বলতা রয়েছে। যার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ হতে পারে না। মোদ্দাকথা বর্তমান কালে স্বামীদের জন্য স্বীয় স্ত্রীর পূর্ণাঙ্গভাবে যৌনক্ষুধা মিটানো অতিব জরুরী। অনেক সময় দেখা গেছে যে, স্ত্রীর আমল আখলাক এক সময় খুব ভালো ছিল কিন্তু স্বামী সহবাসের দিক দিয়ে দুর্বল থাকার কারণে শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে ভিনপুরুষের সাথে কু-সম্পর্ক গড়ে তুলে। আর এরজন্য স্ত্রীর সাথে সাথে স্বামীই অপরাধী। কেননা, তার এ যৌন দূর্বলতার চিকিৎসা সে কেন করে নি।

আমার (অনুবাদক) ছাত্র জীবনের একটি দেখা ঘটনা

আমার দেখা একটি ঘটনা বলছি। আমি তখন টাঙ্গাইলে লেখাপড়া করি। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ৬০-৬৫ বছর বয়সে উপনীত একজন দপ্তরী ছিল। আমল আখলাকে সে ছিল খুবই ভালো। চুল দাড়ি পাকা লোকটি একেবারেই সহজ সরল। ফলে তার সাংসারিক এমনকি পারিবারিক গোপন কথাও অনেকের কাছে বলে ফেলত। সে বলত, 'আমি এ পর্যন্ত ছয়টি বিবাহ করেছি। কোনো স্ত্রীই আমার মন জয় করতে পারে নি। আমার চাহিদা পূরণে তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার সর্বশেষ স্ত্রীটি বেশ জোয়ান। স্ত্রীর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। সন্তান বলতে কেবল দু'টি ছেলে।' আমরা অনেকেই তাকে চাচা বলে ডাকতাম।

একদিন আমরা কয়েকজন চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, চাচা! আপনার সকল স্ত্রীরা আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? উত্তরে চাচা বললেন, 'তারা আমার খাহেশ পুরা করতে পারত না। আমার মন মত তারা কাজ করতে দেয় না। তারা আমার শক্তির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, চাচা! আপনি ঘরের গোপন কথা অনেকের কাছেই বলে থাকেন, কিছু মনে না করলে আমরা আপনার কাছে একটা ব্যাপার জানতে চাই। চাচা বললেন, কি জানতে চাও?

আপনি এ বয়সেও এক রাতে চাচীর সাথে কতবার সহবাস করতে সক্ষম। চাচা বললেন, এখনও আমি চার পাঁচবার সহবাস করতে পারি। আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম, চাচা! আপনি তো এখন প্রায় বৃদ্ধ, তারপরও চার পাঁচবার? কিভাবে সম্ভব?

চাচা বললেন, 'আমি যখন যৌবন বয়সে ছিলাম তখন এক কবিরাজ

আমাকে এক পদের হালুয়া বানিয়ে খাইয়েছিল, যার শক্তি এখনও রয়েছে।'

সে হালুয়া কিভাবে বানাতে হয়, এখনও সে কবিরাজ জীবিত আছেন কিনা, কোথায় পাওয়া যাবে সে হালুয়া, এ জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্ন করে চাচাকে আমরা অস্থির করে তুললাম। চাচা আমাকে লক্ষ করে বললেন, তোমার সঙ্গে লেখাপড়া করে এমন অনেক ছাত্র বা অনেক পরিচিত ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই এক প্রকার হালুয়া খেতে দেখেছ। কিন্তু তা যে আমার বানানো হালুয়া সেটি হয়তো তুমি জান না। আমার মনে হল যে, সত্যিই আমি অমুক অমুককে তো এক প্রকার হালুয়া খেতে দেখেছি। পরবর্তীতে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক এবং ছাত্র এ হালুয়া খেয়ে থাকে এবং হালুয়াটি সত্যিই অনেক কার্যকরী। আমি তখনও অবিবাহিত ছিলাম এজন্য চাচার কথাগুলো আমার ঠিক বিশ্বাস হত না।

আমাদের সঙ্গে সেই চাচার এলাকার একজন বাবুর্চি ছিলেন। তিনি বিয়ে করার জন্য মেয়ে দেখছিলেন। আমার সঙ্গে তার হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকার দরুণ আমি জানতাম যে তিনি দুর্বল পুরুষদের একজন। এমনকি বিয়ে করতেও তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি চাচার স্মরণাপন্ন হলেন এবং তার থেকে হালুয়া খেয়ে কিছুদিন পর বিবাহ করেন। বছরের ঘুরতে না ঘুরতেই তার ঘরে আল্লাহ্ তাআলা দান করেন একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান। সুসম্পর্কের ভিত্তিতে আমি বাবুর্চি ভাইকে চাচার কথাগুলোর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি চাচার প্রত্যেকটি কথাই সত্য বলে আমাকে আস্বস্ত করলেন। এছাড়াও আমি আরও অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রের কাছেও এর উপকারিতা এবং শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। যারা প্রত্যেকেই এই হালুয়া খেয়ে ভিষণ উপকৃত হয়েছে।

অতঃপর আমার লেখাপড়া শেষে বাড়ি ফেরার পালা। আমি বুঝতে পারলাম যে, এরপর আমার সাথে এই চাচার আর কখনও দেখা হবে না সুতরাং বিদায়ের আগেই তার থেকে হালুয়া বানানোর নিয়ম এবং উপাদানগুলো ভালভাবে লিখে নি। যেন আমি এবং আমার মতো অনেকেই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। হালুয়া তৈরী করতে যে ৩২টি উপাদানের প্রয়োজন হয় এবং কিভাবে তা তৈরি করতে হয় চাচা আমাকে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। নিম্নে আমি সেই ৩২টি উপাদানগুলোর নাম এবং হালুয়া বানানোর নিয়ম উল্লেখ করছি।

হালুয়া বানানোর উপাদান ঃ

উপাদান	পরিমাণ
বকুলের ছাল	১ পোয়া
অর্জুনের ছাল	১ পোয়া
সিমের দানা	২০টি
তাল মাখনা	১ ছটাক
কুখমা	১ ছটাক
উসবগুলের ভূষি	১ ছটাক
মধু	আধা কেজি
মিছরি	২ কেজি
ডিম (দেশী)	২ হালি
শবরি কলা	২ হালি
খারা জুরার পাতা	১৫টি
শেওড়া গাছের রস	১ সিকী
বট গাছের কস	১ সিকি
জলডঙ্গা গাছের কস	১ সিকি
আকন	১ সিকী
সুনা জারক	আধা তোলা
রূপা জারক	আধা তোলা
তামা জারক	আধা তোলা
কাসা জারক	আধা তোলা
লোহা জারক	আধা তোলা
শিশা জারক	আধা তোলা
পিতল জারক	আধা তোলা
রাং	আধা তোলা
রং	আধা তোলা
দস্তা	আধা তোলা
মুকারদাস	আধা তোলা
দুধ	৩ কেজি

শিমুলের মূল	৩ টি
আলকাশির দানা	৫০ গ্রাম
জায়ফল	৫টি
দারুচিনি	আধা তোলা
শক্তিবিন্দু (সিন্দু)	১ তোলা

হালুয়া বানানোর নিয়ম ঃ

১। প্রথমে কলা একেবারে ফিনিস করে মাখবে।

২। মিছরি পাটায় গুড়ো করে কলার সাথে মাখবে।

৩। উপরোক্ত বস্তুতে দুধ ঢেলে মিশাবে।

৪। সকল প্রকার ছাল ফাকি করে চালতি দিয়ে ছেকে সম্পূর্ণ গুড়ো করে মিশাতে হবে।

৫। সকল প্রকার জারক গুড়ো করে তাকে মাখতে হবে।

৬। এরপর তাতে মধু ঢেলে মিশাতে হবে।

সবশেষে আগুনে জ্বাল দিতে থাকবে। হালুয়া বানানো হয়ে গেলে তা থেকে দৈনিক সকাল বিকাল চা চামচের এক চামচ করে পান করবে।

বি.দ্র. শিমুলের মূল নতুন হলে সর্বোত্তম। শিমুলের মূলগুলো টুকরো টুকরো করে রোদে শুকিয়ে বেটে একেবারে ফিনিস করতে হবে। এই ফাকি যেন এক পোয়া হয়, তার জন্য যে কয়টা মূল দরকার তা সংগ্রহ করবে।

আমার জানা মতে এ ঔষধটি ১০০% উপকারী। তবে এ হালুয়া বানাতে দক্ষ হাকীম দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে, উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী অনেকেই হালুয়া বানায় কিন্তু আগুনে জ্বাল দিতে গিয়ে অনেক সময় বেশি জ্বাল দিয়ে ফেলে, যার কারণে সে হালুয়ায় এক ধরনের আগুনে পোড়া পোড়া গন্ধ আসে। আর তখন তা সেবনে অনীহা সৃষ্টি হয়।

সহবাসের উপযুক্ত সময়

স্বামী-স্ত্রীর জন্য কখন, কোন্ সময়ে সহবাস করা উচিত সে বিষয়ে জানা থাকা দরকার। অবশ্য যৌনবিদদের কথায় অনেকেরই অমিল পাওয়া যায়। কেউ বলেন রাতের শেষ ভাগে সহবাস আনন্দদায়ক। আবার কেউ বলেন, রাতের প্রথম ভাগে সহবাস করা তৃপ্তিদায়ক। তবে এই কথা সকলের মনে

রাখা উচিত যে, ভরা পেটে স্ত্রী সহবাস করা ঠিক নয়। তাতে রোগ-ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে। খাওয়ার পরে অন্তত দুই ঘন্টার ভিতরে সহবাস করা ঠিক হবে না।

স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হতে পাক পবিত্র হওয়ার পরে ১৪/১৫ দিন পর্যন্ত সহবাসের প্রবল বাসনা থাকে। ঐ সময়ের সহবাসে গর্ভ সঞ্চার হয়ে থাকে। বেশীরভাগ লোকের ধারণা, শেষ রাতে নারীদের কাম-বাসনা প্রবল থাকে এবং ঐ সময়ের সহবাসে স্বামী-স্ত্রী বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়ে থাকে। দিনের বেলা সহবাস না করে রাতে সহবাস করা উচিত। যেহেতু রাতের অন্ধকারে মনের মতো সাধ মিটাতে পারা যায় এবং ঐ সময়ের সহবাসে প্রায়ই ছেলে সন্তান জন্মে থাকে।

সহবাসের সময় নিষিদ্ধ কার্যাবলী

সহবাসের সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের দিকে তাকাবে না, তাতে চোখের জ্যোতি কমে যায়। সহবাসের অবস্থায় বাজে কথা-বার্তা বলবে না। তাতে সন্তান জন্ম হলে তার ক্ষতির সম্ভবনা থাকে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কিংবা দাঁড়িয়ে সহবাস করা যদিও জায়েয তবে এ পদ্ধতিটি অবলম্বন না করাই উত্তম। সহবাসকালে উন্মাদনায় স্ত্রীর গালে বা ঠোঁটে এমনভাবে দংশন করবে না যাতে দাগ পড়ে যায়। উহা স্ত্রীর লজ্জার কারণ হবে। স্ত্রীর সাথে সহবাসকালে যৌন-উন্মাদনায় অতি জোরে লিঙ্গ দ্বারা স্ত্রীর যৌনাঙ্গে চাপ দিবে না, তাতে স্ত্রী-অঙ্গ ক্ষত হয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। যাতে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ বেশী হয়ে থাকে। স্ত্রীকে স্বামীর দেহের উপরে তুলে উল্টা নিয়মে সঙ্গম করবে না, তাতে উভয়ের স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে।

সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মুহূর্তে

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রীর কামনা বাসনার চরম মুহূর্তে উত্তেজনায় উন্মাদিনী হয়ে যখন তার দেহ-মন এলিয়ে দিবে, তখনই সুযোগ বুঝে স্বামী তার অঙ্গ স্ত্রী-যোনীতে প্রবেশ করিয়ে মনোস্কামনা পুরা করতে থাকবে এবং উভয়ে চরম তৃপ্তি লাভ করবে, আনন্দিত হবে। কিন্তু এ সময় সহবাসের দোয়াটি ভুলে গেলে চলবে না। মুসলিম দম্পতিকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র ইবাদত কার্যে রত হওয়ার পূর্বে সহবাসের দোয়া পাঠ করা কর্তব্য।

সহবাসের দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ وَلَدًا صَالِحًا - اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ

وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী ওয়ালাদান ছ-লিহান। আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্ব-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্ব-না মিম্মা রাযাক্বতানা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাকে সু-সন্তান দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আমাদের জন্য নির্ধারিত বস্তু হতে শয়তানকে ফিরিয়ে রাখুন।

বীর্যপাতের সময় পড়ার দোয়া ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

উচ্চারণ ঃ আলহামদুলিল্লাহি জাআলা মিনাল মা-য়ি বাশারান।

অর্থঃ যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি তরল পানি (বীর্য) হতে মানুষ সৃষ্টি করেন।

সহবাসের স্থায়িত্বকাল

অনেক সময় কোনো কোনো স্বাস্থ্যবান পুরুষ সহবাস করতে গিয়ে বীর্যধারণ ক্ষমতার অভাব অনুভব করে থাকে। এতে তার মনে করার কিছুই নেই, তা কোনো কোনো সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। কোনো রোগ-ব্যাধির কারণে হয়েছে তা মনে করার কারণ নেই। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় সহবাস করার কারণে যদি তাড়াতাড়ি বীর্যপাত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করবে।

অবশ্য সহবাসের সময় তাড়াতাড়ি বীর্যপাত হলে স্ত্রী তৃপ্তি পায় না, স্ত্রী যাতে চরম পুলক লাভ করতে পারে সেদিকে স্বামীকে লক্ষ্য রেখে বীর্যপাতকে দীর্ঘায়িত করতে হবে। সহবাসের স্থায়িত্বকাল যাতে বেশী হয়, সেদিকে স্বামীকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

সহবাসের সময় স্থায়িত্ব বাড়ান এবং বীর্যপাতকে দীর্ঘায়িত করার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া পালন করা দরকার তা স্বামীর মন মানসিকতার উপর নির্ভর

করে থাকে। যেমন, স্ত্রী-সহবাসের সময় মনকে যৌন চিন্তা হতে দুরে সরিয়ে রাখলে অনেক সময় বীর্যপাত দেরীতে হয়। স্ত্রী সঙ্গমকালে যোনী নালীতে পুংলিঙ্গ দ্রুত উঠা নামার সময় বীর্য বের হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলে সে সময় নিঃশ্বাসকে বুক ভরে ভিতরে টেনে নিলে সাধারণত বীর্যপাত বন্ধ হয়ে থাকে। আবার লিঙ্গ উঠা-নামার সময় একটু বিশ্রাম নিলেও অনেক ক্ষেত্রে বীর্যপাত দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। অথবা সঙ্গমকালে খুব ধীর গতিতে লিঙ্গ চালনা করলে স্থায়িত্বকাল বেশী হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় মলদ্বার অতি জোরে চেপে ধরে রাখলে বীর্যপাত দেরীতে হওয়ার সুফল পাওয়া যায়। কখনো যৌন উত্তেজনাকে আয়ত্বে রেখে মন-মানসিকতাকে সুস্থ রেখে ধৈর্য্য ধারণ করে সহবাস করলে স্থায়িত্ব বেশী হতে পারে। মূল কথা হল, সকল নারীরই ঘর্ষণে তৃপ্তি হয়ে থাকে। অতএব, পুরুষের এই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কি প্রকারে মৈথুনের বা ঘর্ষণের স্থায়িত্বকে বাড়ানো যায়। এই বিষয়ে প্রতিটি স্বামী নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে পন্থা উদ্ভাবন করে নিবে।

কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অসম্ভব রকমের সঙ্গমে স্থায়িত্বকাল লম্বা করবে না। সম্ভবত আধা ঘন্টার উপরে সঙ্গমকাল স্থায়িত্ব করবে না। তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা হল এই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একইভাবে সমপুলক অনুভব করা বা তৃপ্তি লাভ করা যৌন মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

স্ত্রী-সহবাসের মাত্রা

পাশ্চাত্য দেশীয় কোনো একজন যৌন শাস্ত্রবিদ বলেছেন, প্রতি সপ্তাহে দু'বার, এক বছরে একশ চারবার স্ত্রী সহবাস করলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার কোনো ভয় থাকে না।

সাধারণতঃ এটা নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর শরীরের সুস্থ্যতা ও শক্তি সামর্থের উপর। উপরে উল্লিখিত যৌনবিদের উক্তির বিপরীত যৌন মিলন করেও অনেকে সুস্থ ও সবল থেকে দাম্পত্য জীবনে সুখে আছে। অনেকে বিবাহের প্রাথমিক অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করে দিব্বি আরামে আছে। তবে যাদের মন-মানসিকতা সুস্থ্য থাকে না বা স্বাস্থ্য ভালো নয় কিংবা প্রায়ই রোগ-ব্যাধি থাকে, তাদের কথা আলাদা।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা যে, অধিক পরিমাণে স্ত্রী সহবাস করলে

স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। এই রকম ধারণা ঠিক নয়। আসলে কে কতবার স্ত্রী সহবাস করবে উহা নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর চাহিদা ও উৎসাহের উপরে।

অনেকে ধারণা করে থাকে যে, বেশী মাত্রায় স্ত্রী সহবাস করলে বেশী বীর্যপাত হয়ে শরীর খারাপ করে। এই ধারণা ঠিক নয়। পুষ্টিকর আহারাদি করলে বা স্বাস্থ্য পরিচর্যা করলে, বীর্যের শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যায়। অবশ্য আমাদের দেশে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে–

মাসে এক, বছরে বার।

তার চেয়ে যত কমাতে পার।

আমাদের মতে এই কথাই বলব যে, এ সকল নীতি-বাক্য শুধু ঐ সকল লোকদের জন্য যাদের শরীর ও স্বাস্থ্য খারাপ বা দুর্বল হয়ে থাকে। কখনো কখনো দেখা যায় যে, স্ত্রী-সহবাসে অনেকের ভগ্ন স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেছে। আবার অনেকের দেখা যায় যে, রীতিমত সহবাস না করলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং সুস্থ্য থাকে না। মোট কথা হল যে, যাদের দেহ মন সুস্থ তাদের জন্য মাত্রা বেশি হওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। আর যাদের শরীর ও স্বাস্থ্য খারাপ বা দুর্বল তাদের জন্য মাত্রা কম হওয়াই আবশ্যক।

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে আনন্দ হয় কেন?

স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলনের সময় যৌনাঙ্গের সংস্পর্শে সুখানুভুতিজনিত কারণে মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি রহস্য এমনি যে, স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গ এক রকম স্পর্শ সুখানুভূতি তন্ত্র দ্বারা তৈরী করা হয়েছে, তাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আশাতীত আনন্দের দোলায় দোলায়িত হয়ে উঠে। মৃদু উষ্ণ পিচ্ছিল কোমল যোনিনালীর স্পর্শে পুরুষের উত্তেজনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তখন পুরুষের লিঙ্গ বার বার উঠা নামা করতে উৎসাহিত হয়।

স্ত্রীলোকেরও এই ধরণের হয়ে থাকে। তাদের যোনিপথে পুংলিঙ্গ প্রবেশ করা মাত্র কামাদ্রি প্রবেশ, ভগাঙ্কুর ও যোনিনালীতে এক ধরণের স্বর্গীয় সুখ লাভ করে থাকে। তখন তাদের অন্তরে এই বাসনা জাগরিত হয়ে থাকে যে, যোনিনালীতে দ্রুত লিঙ্গটা বার বার উঠা-নামা করলে অতি উত্তম হয়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌন মিলনের দ্বারা এই যে সুখানুভূতি লাভ করে থাকে, এর মূল রহস্য কোথায় নিহিত? আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি কৌশলের রহস্য

অনুসন্ধান করলে বুঝা যাবে যে, দেহের যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর উত্তেজনার পারস্পারিক ক্রিয়ার জন্যই দম্পত্তির যৌনাঙ্গসমূহ ঐ ধরণের সুখানুভব করে থাকে।

নারী-পুরুষের কামোত্তজনার উদ্রেক হলেই উহা দেহের সর্বত্র বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে যায়। তখন এই উত্তেজনার ধাক্কা চেতনার সাহায্যে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়ে সেখান হতে উহা ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজক কেন্দ্রসমূহে। এই উত্তেজনা কেন্দ্র হতে অনুভূতি শক্তি যৌনাঙ্গ সমূহের ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এই প্রকারে নর-নারীর যৌনাঙ্গ অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে থাকে। আর এই সক্রিয়তার কারণেই নর-নারী অচিন্তনীয় সুখ আর আনন্দ পেয়ে থাকে।

স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ভিতরে পুংলিঙ্গের দ্রুত উত্থান পতনের কারণে স্ত্রী-অঙ্গের ভিতরে যে শিহরণ জেগে থাকে, তার কারণে স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গে এ ধরণের অপূর্ব সুখের ছোয়া লেগে থাকে। এই সুখানুভবের জন্য তারা সটান পড়ে থাকে স্বামীর শুক্রাপাত না হওয়া পর্যন্ত। এই স্বর্গীয় সুখ সর্বাঙ্গ দ্বারা ভোগ করার জন্য কোনো কোনো স্ত্রীলোক পুরুষাঙ্গের উত্থান-পতনের সাথে সাথে তার যৌন প্রদেশও উচা নীচা করতে থাকে। এতে তারা চরম আনন্দ পেয়ে থাকে। এই স্বর্গীয় সুখের অনুভূতিকে তারা বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতে স্বামীকে বুঝিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত চরম আনন্দ ও অত্যাধিক তৃপ্তির মুহূর্তে যখন স্বামীর বীর্যপাত হয়ে থাকে তখনই শুধু দম্পত্তি আনন্দ ও তৃপ্তির পরিপূর্ণতা ভোগ করে থাকে।

চরম পুলকের সময় যৌনাঙ্গের অবস্থান

স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলনে রত অবস্থায় উত্তেজনা চরমে পৌছে যায়। সেই অবস্থায় পুরুষের অণ্ডকোষ হতে শুক্রবাহী নলের ভিতর দিয়ে এক প্রকার রস পুরুষের মুত্রনালীতে বের হয়ে আসে এবং তার সাথে প্রটেষ্টগ্রন্থি হতেও এক প্রকার রস বের হয়ে মিশে শুক্রে পরিণত হয়ে অতি চঞ্চলিত রূপ ধারণ করে পুরুষের মুত্রনালী দিয়ে দ্রুতবেগে স্ত্রী জরায়ুতে পতিত হয়। এই সময় স্ত্রী অত্যাধিক পুলক লাভ করে এবং তার ভিতরের গ্রন্থিগুলো হতে প্রচুর রস বের হয়ে থাকে এবং ভগাঙ্কুর নাচতে থাকে। এটা ছাড়া জরায়ু মুখ ও যোনিনালী মৃদু কম্পিত অবস্থায় প্রসারিত হয়ে থাকে।

পুরুষের বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে লিঙ্গটা অত্যাধিক শক্ত হয়ে থাকে, তখন

স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বীর্য ধারণের জন্য অত্যন্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে এবং এই মুহূর্তেই বীর্যপাত হয়ে থাকে। চরম আনন্দ ও তৃপ্তির অনুভূতিতে স্ত্রীর চোখদ্বয় বুজে যায় এবং দুই হাতে স্বামীকে জড়িয়ে বুকের দিকে চেপে রাখে। এর পরেই উভয়ে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং কিছু সময় বিশ্রাম নেয়। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায়, স্ত্রীর চরম পুলক প্রাপ্তির আগে স্বামীর বীর্যপাত হয়ে যায়। এই অবস্থায় স্ত্রীর চরম আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনবোধে স্বামী পুনঃসঙ্গমে লিপ্ত হবে।

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের উপকারিতা

(ক) মিলনের দ্বারা ঈমান মজবুত হয়ে থাকে এবং ইবাদতের দিকে মন ঝুকে থাকে। অন্তরের ভিতর বাজে কোনো কু-চিন্তা বা কু-কাজের ধারণা উদয় হয় না।

(খ) নিয়মিতভাবে সহবাস করলে দেহ মন সুস্থ্য থাকে, সাংসারিক কাজ কর্মে আনন্দ এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

(গ) স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের দ্বারা মন মস্তিষ্ক সদা সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। ঈমানী শক্তি সুদৃঢ় হয় এবং অনাবিল আনন্দ লাভ করে।

(ঘ) স্বামী-স্ত্রীর রতিক্রিয়ায় মন মানসিকতা শান্ত ও সংযত থাকে। উশৃঙ্খলতা বা চরিত্রহীনতার নাগ পাশ হতে দুরে থেকে সৎকার্যের দিকে ধাবিত হয়।

(ঙ) ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী যদি স্বামী-স্ত্রী সহবাস করে, তবে তা আল্লাহ্ তাআলার দেয়া অফুরন্ত নেয়ামতের তুল্য হয়। এটা বেহেশতের ভিতরের অনাস্বাদিত নেয়ামতের তুল্য। এ কথা মনে করে সহবাস করলে উভয়ের অন্তর এক অনাকাঙ্খিত আনন্দে ভরে ওঠে।

(চ) প্রধান উপকার এই যে, আল্লাহ্‌র মহান উদ্দেশ্য মানব বংশ বৃদ্ধি হয় এবং এই নিয়মে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে তাদের সমস্ত জিন্দেগীর যৌন মিলনকে ইবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং কাল কিয়ামতে মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।

সহবাসের অপকারিতা

স্বামী-স্ত্রীর মিলনে যেমন প্রভূত উপকার রয়েছে। তেমনি উহাতে মারাত্মক

ক্ষতিরও আশংকা আছে। যে কোনো কাজ কর্মের সীমা লঙ্ঘণ যেমন ভালো নয়। তদ্রুপ স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে মাত্রাতিরিক্ত সহবাস করলে উপকারের চেয়ে অপকার বেশী হয়ে থাকে। যেমন–

(ক) পুরুষের অধিক পরিমাণে বীর্যপাতের ফলে শরীর ও স্বাস্থ্য দুর্বল হয়। এক্ষেত্রে ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রহণ করবে।

(খ) অতিরিক্ত সহবাসে যৌন-পিপাসা আস্তে আস্তে লোপ পায়।

(গ) গাল ভেঙ্গে যায়, চক্ষু কোঠারাগত হয়। ধীরে ধীরে ধাতু-দুর্বল্য দেখা দেয়। এমনকি ধ্বজভঙ্গ রোগ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে পূর্বেই সতর্ক হয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

(ঘ) অতিমাত্রায় সহবাসে নারীদের যৌবন ও সৌন্দর্য হারিয়ে যায় এবং দেহ ভেঙ্গে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রদর রোগ দেখা দেয়। এই ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করে মাত্রা কমিয়ে ফেলবে। প্রয়োজন হলে চিকিৎসা করাবে।

(ঙ) নারীদের রক্তহীনতার কারণে শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যায়, চেহারার লাবণ্যতা এবং কমনীয়তা কমে যায়।

সুতরাং সহবাসের মাত্রা কমিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যৌন সুখ লাভ করলে কোনো ক্ষতির আশংকা থাকে না। অধৈর্য হয়ে অতি মাত্রায় সহবাস হতে পূর্বেই সাবধানতা অবলম্বন করবে। এতদ্বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মহিলাদের দ্রুত বীর্যপাত ঘটানোর কৌশল

ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি যে গর্ভধারণের জন্য স্বামীর যেমন বীর্যপাত আবশ্যক, তেমনিভাবে স্ত্রীর বীর্যপাতও জরুরী। বীর্যপাত না হলে পুরুষ যেমন কষ্ট পেয়ে থাকে, ঠিক মহিলারাও তেমনি কষ্ট অনুভব করে থাকে। সাধারণতঃ পুরুষের বীর্যপাত মহিলার তুলনায় আগে হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, পুরুষের মেজাজ গরম। অন্যদিকে মহিলাদের মেজাজ পুরুষদের তুলনায় ঠাণ্ডা ও নরম। সুতরাং মহিলাদের দ্রুত বীর্যপাত ঘটানোর উত্তম পদ্ধতি হলো, প্রত্যেক সহবাসের পূর্বে তাকে চুম্বনে চুম্বনে পাগলীনি বানিয়ে ফেলবে, আলিঙ্গন করবে, স্তনের বোটা নাড়াচাড়া করবে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। সুঁড়সুঁড়ি, স্তন মর্দন, মলামলি অতিরিক্ত পরিমাণে করবে। মাঝে মাঝে তার দিকে কামনায় ভরপুর এরূপ ভাব নিয়ে তাকিয়ে

থাকবে। এরূপ করলে মহিলাদের উত্তেজনায় উত্তাল খেলতে শুরু করে। একসময় সে নিজেই তার ভাব-ভঙ্গিমা দ্বারা বোঝাবে যে আমি আর সইতে পারছি না। আমাকে কিছু একটা কর। আমাকে ছিড়ে ছিড়ে টুকুরা টুকরা করে খেয়ে ফেল। এরূপ অবস্থা দেখতে পেলে বুঝবে যে সে এখন আহত বাঘিনী হয়ে গেছে। অতঃপর সহবাসে লিপ্ত হবে। তখন কিছুক্ষণ সময় সহবাস করলেই দেখা যায় যে, স্ত্রীর বীর্যপাত হয়ে গেছে। তবে এক্ষেত্রে স্বামী নিজেকে সংযত রাখবে। আর যদি নিজেই অধিক উত্তেজিত হয়ে যায়, তাহলে সামান্য সময়ের মধ্যেই নিজেই নিস্তেজ হয়ে যাবে। স্ত্রীর বীর্যপাত আরম্ভ হবে এমন মুহূর্তে স্বামী অকেজো হলে স্ত্রীর জন্য এটা সীমাহীন কষ্টকর যা কারো কাছে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। স্বামীকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেললেও হয়তো তাদের মনের জ্বালা কিছুই কম হবে না।

মহিলাদের কাম উত্তেজনা যেভাবে জাগাতে হবে

নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করলে অতি দ্রুত মহিলাদের কাম উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। যথা–

১। মুখ, কপাল, গাল ইত্যাদি স্থানে ঘনঘন চুম্বন করা ও ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করা।

২। সহবাসের পূর্বে মহিলার দেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করা। ধীরে ধীরে তা নাড়াচাড়া করলেও কাম উত্তেজনা জেগে উঠে।

৩। মহিলাদের যৌন ইন্দ্রিয়গুলো স্পর্শ, ঘর্ষণ ও মর্দন করলেও উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়।

৪। বিশেষ করে স্তন ও ভগাঙ্কুল মর্দনে কাম উত্তেজনা জাগার সহায়ক।

৫। প্রয়োজনে সীমার ভেতর আঘাত, দংশন বা নিপীড়ন করা চলে।

সহবাসের আগে স্ত্রীকে ভালোভাবে উত্তেজিত করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় স্ত্রীর অতৃপ্তি থেকে যেতে পারে।

মহিলাদের বীর্যস্খলনে লক্ষণ

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যখন একত্রিত হয় তখনই ভ্রূণ তৈরী হয়। মহিলাদের বীর্যস্খলন বুঝার যতগুলো উপায় রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল-মহিলা নিজেই বলবে যে, আমার বীর্যপাত হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মনের এ গোপন কথাটি

লজ্জাশীল মহিলারা নিজের মুখে প্রকাশ করতে পারে না। প্রবাদ আছে- মহিলাদের বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফাটে না। সুতরাং তার হাবভাব ও আচার-আচরণ দেখে বুঝে নিতে হবে যে, তার বীর্যপাত হয়েছে কিনা। তদ্রুপভাবে পূর্বে উদ্দীপনা ও আগ্রহে জড়িয়ে ধরা আলিঙ্গন হালকা ও শিথিল হয়ে যাওয়া এবং পূর্বের উদ্দীপনা আর অবশিষ্ট না থাকা, এ সকল লক্ষণে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর বীর্যপাত হয়ে গেছে।

মহিলাদের কাম উত্তেজনার লক্ষণ

মহিলারা উত্তেজিত হলে সাধারণত নিম্নের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়-

১। উত্তেজিত হলে বা কাম বিহ্বল হলে তাদের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

২। নিশ্বাস জোরে জোরে পড়তে থাকে।

৩। চোহারার মধ্যে উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

৪। হাত পা শিথিল হয়ে পড়ে।

৫। চোখ বুজে থাকতে চায়।

৬। লজ্জা কমে যায়, বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করলে তাতে বাধা দেয় না।

৭। গোপন স্থানে হাত বা চাপ দিলে তা উপভোগ করে।

৮। সব রকম ভয়, সঙ্কোচ কাটিয়ে নিজ যৌবন অর্পণ করে।

অভিজ্ঞদের মতে মহিলাদের বীর্যপাতের তিনটি লক্ষণ ঃ

১। মহিলাদের বীর্যপাত হওয়ার মুহূর্তে তারা পুরুষকে খামচে বা, জাপটে ধরবে। কেউ কেউ এমনভাবে চেপে ধরবে যে, সঙ্গম করাই মুশকিল হবে।

২। কোনো কোনো মহিলার বীর্যপাতের সময় অবস্থা এমন হয় যে, তাকে দেখতে মনে হবে সে এখন শান্ত ভদ্র মহিলার ন্যায় ঘুমিয়ে যাবে। অর্থাৎ বীর্যপাতের সময় তার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে।

৩। আবার কারো কারো অবস্থা এমন হয় যে, সে শ্বাস প্রশ্বাস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ বীর্যপাতের সময় ঘণ ঘণ শ্বাস নিতে থাকবে।

মহিলাদের তৃপ্তির লক্ষণ

অনেক স্বামী মনে করে যে, অধিক সময় সহবাস করলেই স্ত্রী তৃপ্ত হয়ে

যায়। আসলে তা নয় বরং স্ত্রী তৃপ্ত হয়েছে কিনা তা সেই ভালো জানে। হয়ত স্বামীকে খুশি করার জন্য বলে যে, আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি। আসলে লজ্জা শরমের কারণে মনের জ্বালা প্রকাশ করতে পারছে না। স্বামী ভাবতে পারে যে আমার স্ত্রীর যৌন ক্ষুধা এতো বেশি, যে অনেক্ষণ সহবাস করার পরও সে তৃপ্ত হলো না। না জানি সে তার মনের খাহেশ পুরণের জন্য আমার অজান্তে কার কার সাথে সম্পর্ক রাখে। এরূপ ধারণা আসতে পারে ভেবে স্ত্রী তার স্বামীকে বলে 'আমার বীর্যস্খলন হয়েছে'। আসলে তার বীর্যস্খলন এখনও হয় নি। সহবাসের দ্বারা স্ত্রী তৃপ্ত হলো কিনা তা জানার অনেক উপায় রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। দেহ নুয়ে পড়া।
২। সারা দেহ অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়া।
৩। দ্রুত হৃৎস্পন্দন হতে থাকা।
৪। আবেশে চোখ বুজে থাকা।
৫। যোনি থেকে রসস্রাব নির্গত হওয়া।
৬। দেহ বার বার শিহরিত বা কেঁপে কেঁপে ওঠা।
৭। পূর্ণ তৃপ্তির আবেশে অজ্ঞানের মতো হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
৮। ধীরে ধীরে গোঁ গোঁ বা প্রাণীর অনুরূপ শব্দ বের হতে পারে।
৯। স্বামীকে জোর করে বুকে চেপেও ধরে রাখতে পারে।

সহবাসের পূর্বে স্বামীর কর্তব্য

১। স্বামীর উচিত স্ত্রীকে প্রিয়তমা জ্ঞানে বা সত্যিকারের ধর্মপত্নী জ্ঞানে নিজের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারও দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তির প্রতি খেয়াল রাখা। নিজের কামনা বাসনা পরিতৃপ্ত করাই সহবাসের একমাত্র লক্ষ হওয়া উচিত নয়।

২। কোনো প্রকার বল প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

৩। চুম্বন, আলিঙ্গন, নিপীড়ন ইত্যাদি নানাভাবে স্ত্রীর মনে পূর্ণ কামভাব জাগিয়ে তারপর তার সাথে সহবাসে রত হওয়া প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য।

৪। স্ত্রী ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তার সঙ্গে কখনো সহবাসে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

৫। স্ত্রী কখনো নিজের যৌন উত্তেজনাকে মুখে প্রকাশ করে না। তবে

সেটা অনেকটা লক্ষণ দেখে বুঝে নিতে হয়।

৬। স্ত্রীর কর্তব্য সর্বদা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভাব ফুটিয়ে তোলা।

৭। স্বামীকে ঘৃণা করা, তাকে নানা কু-কথা ইত্যাদি বলা কখনই উচিত নয়। সহবাসের অনিচ্ছা থাকলে তা তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত। ঘৃণা বা বিরক্তিসূচক তিরস্কার করা কখনও উচিত নয়। এতে স্বামীর মনে দুঃখ ও বিরক্তি জাগতে পারে।

৮। স্ত্রীর কর্তব্য– স্বামীর চুম্বন, দংশন ও আলিঙ্গনের প্রতিউত্তর দেওয়া।

৯। স্ত্রীর পূর্ণ কামভাব জাগলে স্বামীকে কৌশলে তা বুঝিয়ে দেওয়া।

১০। মহিলাদের উত্তেজনা ধীরে ধীরে আসে, আবার তা ধীরে ধীরে তৃপ্ত হয়। পক্ষান্তরে পুরুষের উত্তেজনা আসে আকস্মাৎ আবার তা শেষ হয়েও যায় আকস্মাৎ। তাই মহিলাদের পূর্ণ কামভাব না জাগিয়ে সহবাসে লিপ্ত হলে তারা পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। এরজন্য অনেক মহিলাই পরপুরুষের সাথে কু-সম্পর্ক করে থাকে। যা দাম্পত্য জীবনের জন্য খুবই মারাত্মক বিষয়।

সহবাস করার পদ্ধতি

সহবাস করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। তবে গর্ভধারণের জন্য সবচেয়ে উপকারী ও উত্তম পদ্ধতি হলো, স্ত্রী চিত হয়ে শয়ন করবে এবং স্বামী তার দুই রাণের মাঝে এসে স্ত্রীকে পুরোপুরিভাবে আবৃত করে নিবে। অর্থাৎ স্ত্রীর উপর একপ্রকার শুয়ে যাবে। আর স্বামী যখন তার স্ত্রীকে এভাবে আবৃত করে নিবে এবং নিজের লিঙ্গ স্ত্রীর নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করাবে অতঃপর সবশেষে স্ত্রীর বাচ্চাদানির মুখে স্বামীর বীর্য নির্গত হবে। তখন তার এ বীর্যের কীট মহিলার বাচ্চাদানীতে প্রবেশ করবে এবং সন্তান জন্ম নিবে। এছাড়া সহবাসের আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কিছু পদ্ধতি এমন আছে যেগুলোতে সাধারণত সন্তান জন্ম নেয় না। কারণ ঐসব পদ্ধতির সহবাসে বাচ্চাদানীতে স্বামীর বীর্য প্রবেশই করে না। অধিকাংশ বীর্য বাহিরে বের হয়ে যায়। কখনও এমন হয় যে, প্রজনন যন্ত্রের নালীতে বীর্য অবশিষ্ট থাকে, যা ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়। শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সহবাস প্রয়োজনীয় উপকরণ। তবে সে সাথে নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণও করা উচিত।

সহবাসের কিছু পদ্ধতিঃ

"নারীরা তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। সুতরাং তোমরা ক্ষেতের যে কোনো দিক দিয়ে আসতে পারো।" –আল কোরআন

স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর জন্য ফসলের ক্ষেত স্বরূপ। ফসলের ক্ষেত যেভাবে ইচ্ছা যে কোনো সময় চাষাবাদ করা যায়। তদ্রুপ স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যে কোনো সময় ও যে কোনো অবস্থাতে সহবাস করতে পারবে। এতে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। শরীয়ত কেবল মহিলাদের বিশেষ কিছু সময়ে তথা- ঋতুস্রাব ও সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যতদিন রক্তস্রাব যায় তবে চল্লিশ দিনের উর্ধ্বে নয়। এ সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছে। পাশাপাশি স্ত্রীর মলদ্বারে বা পিছনের রাস্তায় কাম চরিতার্থ করা হারাম করেছে।

স্বামী-স্ত্রী মিলনে যেসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে তার কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

❖ স্ত্রী কোনো বিছানার উপরে [মাটিতে পাতাই হোক বা চৌকি বা খাটের উপরেই হোক] শয়ন করবে। স্বামী তার বুকের উপর শয়ন করবে। অতঃপর চুম্বন, আলিঙ্গন, নখচ্ছেদ্য, দংশনচ্ছেদ্য করতে পারে। কিন্তু স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীকে কাম উন্মত্ত করে নেওয়া। তার পর স্বামী তার স্ত্রীর বক্ষ আবরণ ও কটি আবরণ একে একে উন্মোচন করে তাকে আরো উত্তেজিত করবে এবং তার আবরণহীন গুপ্তাঙ্গে নিজের পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাবার চেষ্টা করবে। এভাবে আনন্দ ফুর্তি করার দ্বারা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ থেকে একপ্রকার পিচ্ছিল পানি বের হয়ে আসবে এতে সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো অতি সহজ হয়ে যাবে। অতঃপর স্বামী আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে।

❖ স্ত্রী তার জানু গুটিয়ে তুলে, উরুদ্বয় উঁচু করে এবং পরস্পর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে তার যোনি একেবারে ব্যাদিত মুখ করে দিলে স্বামীর জন্য সুবিধা হতে পারে।

❖ স্ত্রী তার হাঁটু এবং উরুদ্বয় এমনভাবে জড়িয়ে ধরবে, যাতে স্ত্রীর কোমরের দিকে সেগুলি গিয়ে লেগে যায়। এতে একটি সাধারণ স্ত্রীর মত সুখদান করতে পারে।

❖ স্ত্রী তার উরুদ্বয় বেকিয়ে স্বামীর বুকের উপর রাখবে এবং স্বামীও তার হাত দু'টি দিয়ে স্ত্রীর কটিদেশ চেপে ধরে সহবাস করতে শুরু করবে। এতে পুরুষাঙ্গটি যোনির একেবারে শেষ দিকে চলে যাবে।

❖ স্ত্রী এক পা লম্বা করে অপর পা স্বামীর বুকের উপর রাখবে। এভাবেও অনেক পুরুষ সহবাস করে থাকে।

❖ স্ত্রী এক পা লম্বা করে বিছানায় রাখবে আর অপর পা বেকিয়ে তার নিজের মাথায় ঠেকাবে। এই ভঙ্গিমাটি আয়ত্বে আনতে কিছুটা অভ্যাসের প্রয়োজন।

❖ স্ত্রী তার পা গুটিয়ে উরুর সঙ্গে যোগ করে এবং স্বামীর পাছার তলদেশ জড়িয়ে ধরে তার গোড়ালি নিজের পাছায় রাখবে এবং এ সময় হাঁটু গেড়েও সহবাস করা যেতে পারে।

❖ স্ত্রী বিছানায় শুয়ে তার উরুদ্বয় উপরে তুলে ছড়ায়ে দিবে এবং এক উরু অন্য উরুর উপর অদল-বদল করে চাপিয়ে দিবে।

❖ স্ত্রী উপুড় হয়ে বুকের উপর শয়ন করবে। স্বামী তার স্ত্রীর পিঠের উপর শুয়ে পেছন দিক থেকে যোনির মধ্যে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাবে।

❖ আবার অনেক স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহবাস করে। এক্ষেত্রে স্ত্রী তার এক পা উপর দিকে উঠিয়ে স্বামীর হাটুর উপর রাখবে আর নিচ দিক থেকে স্বামী তার পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাবে।

❖ স্ত্রী তার হস্তদ্বয় দ্বারা হাঁটু দু'টি মুড়ে ধরবে। স্বামী তার কনুই দিয়ে স্ত্রীকে তুলে ধরে সহবাস শুরু করবে।

❖ স্বামী কোনো দেয়াল বা থামে ঠেক দিয়ে দাঁড়াবে বা তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে স্বামীর সামনে দাঁড়াবে। স্বামী তার স্ত্রীর নিতম্ব ধরে তুলে নেবে। তারপর যোনিতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সহবাস করতে থাকবে।

❖ স্ত্রী তার হাত পা চারটিই মাটির উপরে রেখে দেবে এবং স্বামী তাকে দুই হাতে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরবে। এবং পেছন থেকেই যোনিতে পরুষাঙ্গ প্রবেশ করাবে।

❖ স্বামী স্ত্রী বসে বসেও সহবাস করতে পারে।

❖ অনেক স্বামী মাঝে মাঝে চায় যে, স্ত্রী তার উপর উঠে তার সাথে সহবাস করুক। এর জন্য স্বামীকে বিছানায় শুতে হবে অতঃপর দু'পা লম্বা বা গুটিয়ে নিয়ে দু'পায়ের মাঝখানে স্ত্রীকে জায়গা করে দিতে হবে। এভাবেও সহবাস করা যেতে পারে। নারীরা যখন পূর্ণ আনন্দ পেতে থাকে, তখন নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বিভিন্ন ধ্বনি বের হয়ে আসে।

সহবাসের সময় বিশেষ কাজ

সহবাসের সময় স্বামীর উত্তাল তরঙ্গের সাথে সাথে স্ত্রীও সেই তরঙ্গে যোগ দিবে। নিজেকে একেবারে শিথিল করে রাখবে না। আসল তরঙ্গতো স্বামীর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। যার দ্বারা স্বামীর বীর্যপাতের সুবিধা হয়। আর সাধারণত মহিলাদের বীর্যপাত স্বামীর তুলনায় কিছুটা বিলম্বে হয়। স্বামী স্ত্রীর তরঙ্গ একত্রে চলতে থাকলে, স্ত্রীর বীর্যপাতও সহজ ও তাড়াতাড়ি হয়। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারে। অন্যথায় কেবল স্বামীই মোটামুটি স্বাদ পেয়ে থাকে।

পুরুষদের জন্য সহবাসের পর যে কাজ করা জরুরী

সহবাসের পর পুরুষদের জন্য পেশাব করা জরুরী। এতে পুরুষাঙ্গের রগ, শিরা ও নালায় কোনো প্রকার বীর্য বাকি থাকবে না। কেননা পুরুষাঙ্গের নালায় বীর্য বাকি থাকলে পুরুষাঙ্গের শিরা ও নালায় ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। আর এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ রোগের চিকিৎসাও বেশ জটিল।

সহবাসের পর পেশাব করার ভিন্ন পদ্ধতি

আমরা সাধারণত যেভাবে পেশাব করে থাকি। সহবাসের পর পেশাবের ধরনটি একটু ভিন্ন হলে ভালো হয়। সহবাস করার পর পেশাব চলাবস্থায় হঠাৎ পেশাব করা বন্ধ করে দিবে। আবার পেশাব করা শুরু করবে এবং আবারো হঠাৎ বন্ধ করে দিবে। এভাবে তিন চারবার করলে পুরুষাঙ্গের নালায় বীর্যের ফোটা প্রজনন বাকি থাকলে তা বের হয়ে যাবে এবং মূত্রথলির রোগ থেকে বেঁচে যাবে।

সহবাসের পর শৌচকার্য করার ভিন্ন পদ্ধতি

সহবাসের পর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে শৌচকার্য না করাই উত্তম। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা শৌচকার্য করলে জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর সেই সাথে যৌনাঙ্গের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। সহবাসের পর শৌচকার্য করার সময় হালকা গরম পানি অথবা মাটি দ্বারা কাপড় অথবা টয়লেট টিস্যু দ্বারা শৌচকার্য করবে।

সহবাসের পর খাদ্য গ্রহণ

সহবাসের পর মিষ্টি এবং হালকা গরম ধরণের কিছু খাদ্য খাওয়া খুবই জরুরী। যেমন-গাজরের হালুয়া, ডিমের হালুয়া, মধু মিশ্রিত দুধ, বাদামের হালুয়া। খাওয়ার মত কিছুই না পেলে শুধু মধু থাকলেও খেয়ে নিবে। একেবারে না খেয়ে থাকবে না। খাওয়ার মত যা পাবে অন্তত তাই খাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সহবাসের পর কোনো ক্রমেই ঠাণ্ডা পানি পান করবে না। এমনকি সাথে সাথে গোসলও করবে না। যদি অধিক তৃষ্ণা পায়, তাহলে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পানি অথবা দুধ পান করবে। বর্তমানে এক ধরনের ট্যাবলেট রয়েছে, যা খেলে ক্ষতিপুরণ হয়।

সহবাসের পর দূর্বলতার ঔষধ

উপাদান	পরিমাণ
মুরকুটি	১ তোলা
মাছতগী	১ তোলা
পানের শিকড়	১ তোলা
চুবচিনি	১ তোলা
দারুচিনি	সোয়া তোলা
বাবলা গাছের আঠা	১ তোলা
উদকাঠ	সোয়া ১ তোলা
ভঙ্গরাজ (তাজা)	সোয়া তোলা
কাচা রেশক	দেড় তোলা
খাটি মোমিয়া	২ তোলা
বাদামের তৈল	সোয়া তোলা
মাইয়া (কাঠ বিশেষ)	২ তোলা

এ হালুয়া যেভাবে তৈরী করতে হয়

স্ত্রী সহবাসের পর দূর্বলতা অনুভব হলে মন মস্তিষ্ককে শক্তিশালী, শরীরে প্রফুল্লতা ও কার্যক্ষমতা সৃষ্টিকারী হালুয়া ব্যবহার করা উচিত। এর জন্য ফলদায়ক ঔষধের বিবরণ হল, মোমিয়া এবং মাইয়াহ একসঙ্গে মিশাবে।

অতঃপর বাকি ঔষধগুলো গুঁড়ো করে বাদামের তেলে ছিটিয়ে দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রণ করে খামিরা বানাবে। তারপর খামিরা বুট বা ছোলার আকারে গোলাকার করবে। ২ থেকে ৩টি করে গোলাকার কুসুম গরম দুধ দ্বারা সেবন করবে। হাকিমের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ তৈরি করবে না।

যিনা ব্যভিচার সম্পর্কে ছোট্ট আলোচনা

আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান- তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যখন যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তার থেকে আলাদা হয়ে যায়। ক্ষমাহীন কঠিন অপরাধের মধ্যে যিনা ব্যভিচার একটি অন্যতম অপরাধ। যিনা ব্যভিচারের অপ্রকৃষ্ট প্রভাব যেমন পুরুষের উপর পড়ে, তেমনিভাবে স্ত্রীর উপড়েও পড়ে। ঐরূপভাবে তাদের সন্তানের উপরও পড়ে। এমনকি এর প্রভাব বংশানুক্রমে অনেক দুর পর্যন্ত প্রভাবিত হয়।

রাস্তার মহিলাদের সাথে কু-সম্পর্কের ক্ষতির দিক

দশজনের পেশাব এবং একজন বেশ্যার মাঝে তেমন একটা পার্থক্য নেই। বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবানু আক্রান্ত ব্যক্তিরা এ জাতীয়া মহিলাদের সাথে কু-সম্পর্ক করে থাকে। যেভাবে এক স্থানে বিশজন ব্যক্তি পেশাব করে। তেমনিভাবে একজন বেশ্যাকে বিশজন ব্যক্তিও ব্যবহার করে।

বেশ্যার কাছে হাজারো ব্যক্তির যাতায়াত থাকে। তারা কখনো একজন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করে না। তাদের নির্দিষ্ট কোনো স্বামী নেই। সাধারণ হিসাব মতে দৈনিক একজন বেশ্যার নিকট পাঁচজন ব্যক্তি আসে। আরো কমিয়ে আমরা যদি দৈনিক পাঁচজনের পরিবর্তে একজন হিসাব করি, তারপরও মাসে ত্রিশজন লোক তার সাথে অপকর্ম করে। আর যদি দৈনিক পাঁচজন ধরা হয়, তাহলে সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে। কোনো স্থানে পাঁচজন ব্যক্তি পেশাব করলে কিছু দিন পর সেই স্থান হতে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করবে। অবশেষে সিটি কর্পোরেশনের লোকজন পরিবেশ রক্ষার্থে পাউডার দ্বারা ধৌত করতে বাধ্য হবে। এবার প্রশ্ন হলো এ বেশ্যা, পতিতা, নটি, দেহপসারিণীর জরায়ূকে কে পরিস্কার করেন? যারাই তাদের কাছে গমন করে, তারা তাকে তার দেহ ভোগের বিনিময়ে টাকা দেয়। কিন্তু এ কথা কেউ

জিজ্ঞেস করে না যে, তোমার কোনো রোগ আছে কিনা? যেহেতু বিভিন্ন ধরণের পুরুষের বীর্য তার মধ্যে প্রবেশ করে, সেহেতু সে স্থানে হাজারো জীবাণু সৃষ্টি হতেই পারে। এ ধরণের যিনাকারিণীর পেশাব লাল রঙয়ের হয়ে থাকে এবং পেশাবের আগে এক প্রকার সাদা পদার্থ বের হয়। পেশাবের সাথে পুঁজ বের হয়। এরূপ বেশ্যাদের সাথে যিনাকারী ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে, তারও এ রোগ হতে পারে। এসব লোকদের এইচ. আই.ভি (HIV) এইডস রোগও হয়ে থাকে। সেই সাথে যৌনক্ষমতা হারায় এবং বিদঘুটে রোগের সৃষ্টি হয়।

এ জাতীয় যিনা ব্যভিচার ধ্বংসাত্মক

যারা বেশ্যাদের সাথে যিনা করে, তাদের থেকে হায়া লজ্জা উঠে যায়। হারিয়ে ফেলে নিজ পবিত্র স্ত্রীর সাথে সহবাসের বাসনা। তারা বেশ্যাদের সাথেই যিনা ও যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য অস্থির থাকে। আবার বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়। যেমন-এইডস। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যার ঔষধ বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যিনাকারীর চেহারায় দুর্ভাগ্যের ছাপ পড়ে। তার চেহারায় নূরানীয়াতের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। এক পর্যায়ে নিজের জীবনের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ ডাক্তার, কবিরাজ, হাকীমদের কাছেই খরচ হয়ে যায়। দুর্বিসহ হয়ে উঠে নিজের জীবন। এজন্যেই যিনা সম্পদের, জীবনের, ইজ্জত-সম্মানের, ঈমানের জন্য ধ্বংসের উপকরণ।

পুরুষত্ব উদ্দীপনা হ্রাস পাওয়ার আলোচনা

বর্তমানে এ রোগটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কিছু কিছু লোক এ রোগটি নিজের হাতে সৃষ্টি করে। সাধারণত শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হওয়ার কারণে যৌনশক্তি হ্রাস পায়। কখনো কখনো বার্ধক্যজনিত কারণেও হ্রাস পায়। আর যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হওয়ার কারণে এ রোগ হয়ে থাকে তা হলো- অন্তর, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ধমনি ইত্যাদি। এ অঙ্গগুলিকে শরীরের রাজাও বলা হয়ে থাকে। এর সাথে এটিও প্রমাণিত হয় যে, যৌনাঙ্গের শক্তি এবং তা উত্তেজিত হওয়া দেহের সব অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং অন্তর, কলিজা, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও শিরা। এ পাঁচটি অঙ্গের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। যদি এই পাঁচটি অঙ্গ থেকে কোনো একটি দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে

তার প্রভাব যৌনশক্তির উপর পরে। অথবা এভাবেও উপলব্ধি করা যায় যে, যৌনশক্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল। তার একটি উদাহরণ এভাবে দেয়া যায় যে, একটি তাবু বানালে তার চারপাশে চারটি থাম লাগে এবং মধ্যখানে একটি। এখন যদি মাঝখানের থাম না দেয়া হয়, তাহলে যেমন তাবুটি দুর্বল হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে যৌন শক্তিরও একই অবস্থা।

সকলের জন্য বিশেষ পরামর্শ

প্রথমত কোন্ অঙ্গের দূর্বলতার কারণে রোগের সৃষ্টি, তা নির্ণয়ে সকল ডাক্তার, চিকিৎসক, কবিরাজ, হাকীম ও রোগী সকলেই এ ব্যাপারে সচেতন হবেন। অতঃপর তার মূল কারণ কি? তা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করবেন। অন্যথায় রোগীরা তাদের ঘামঝড়া উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে থাকবে। আর হাকীম সাহেব ঔষধ পরিবর্তন করতে থাকবেন। অবশেষে হাকীম সাহেবের ইজ্জত সম্মানের ক্ষতি সাধিত হবে। আর রোগীর টাকা পয়সা শেষ হয়ে যাবে।

হুশিয়ার হোন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন

অনেককে দেখা যায়, তারা নিজেদের বিগত জীবনের যৌনশক্তিকে পুনরায় ফিরে পেতে বিভিন্ন হাতুড়ে ডাক্তার বা রাস্তার লেকচারদের ধারস্ত হয়। যা একেবারে অনুচিত। কারণ ঐসব নামধারী ডাক্তাররাইতো রোগ ও ঔষধ বিষয়ে অজ্ঞ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের নিকট যৌনশক্তি বৃদ্ধির ঔষধ আছে, তাই বলে সবক্ষেত্রে তো আর এ ঔষধ চলবে না। বরং যৌনশক্তির কোন ক্ষেত্রে এ ঔষধ কার্যকর তা জানতে হবে। আর এজন্য তাকে এ বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। কেননা, যৌনশক্তির হ্রাস পাওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সেগুলো প্রথমে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর সে মোতাবেক ঔষধ দিতে হবে। অনেকে বলে থাকে যে, অমুক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম এবং অনেক টাকার ঔষধও এনেছিলাম, কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। আসলে এর কারণ হলো, ডাক্তার নিজেই তার রোগ নির্বাচন করতে পারে নি। ফলে সে মোতাবেক ঔষধও দিতে পারে নি।

যৌনশক্তি কমে যাওয়ার কারণ

যৌনশক্তি কমে যাওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে রোগি ও ডাক্তার উভয়ের জানা প্রয়োজন–

১। হৃৎপিণ্ডের দূর্বলতার কারণে যৌনশক্তি কমে যায়।

২। বদহজমের কারণেও যৌনশক্তি কমে যায়। কেননা খাদ্য হজম না হওয়ার কারণে রক্ত তৈরী হয় না। আর রক্ত তৈরী না হলে বীর্যও তৈরী হবে না। এর কারণ হলো, বীর্যতো রক্ত থেকেই তৈরী হয়ে থাকে।

৩। যকৃত দুর্বল হওয়ার কারণে যৌনশক্তি কমে যায়। এর কারণ হলো, কলিজা হলো মানুষের শরীরের রক্ত প্রস্তুতকারীর অন্যতম একটি উপাদান। বিশেষ করে যকৃতের কাজই হলো রক্ত তৈরী করা। যকৃত দুর্বলের লক্ষণ হলো- মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়া। শরীরের রঙ হলদে হলদে হয়ে যাওয়া। সহবাসের সময় উত্তেজনা কমে যাওয়া। এসব যখন দেখা দিবে, তখন বুঝতে হবে যে, তার যকৃত দুর্বল হয়ে গেছে।

৪। অনেক যুবকের মাঝে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তা হল, সে নিজেকে দুর্বল মনে করে। এর সবচেয়ে বেশি যে কারণটি পাওয়া যায়- তার ধারণা 'আমি মনে হয় স্ত্রীর সাথে সহবাসে পরাজয় বরণ করব'। এ হল তার অন্তরের দুর্বলতা। এ মানসিক রোগ যখন তার মাঝে কাজ করতে থাকবে, তখন অটোমেটিক আসল সময়ে যৌনশক্তি কমে আসবে। সহবাসের ইচ্ছা করতেই হৃৎপিণ্ড ধক ধক করতে থাকে। সহবাসের সময় বা সহবাসের পর এসব লোকেরা হাঁপিয়ে উঠে হৃদয় ধক ধক করতে থাকে।

৫। আবার অনেকের মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণেও যৌনশক্তি কমে যায়। যখন যৌনাঙ্গের শিরা দুর্বল হয়ে যায়, সবসময় রোগীর মাথায় ব্যাথা অনুভব করে কিংবা সহবাসের পর পরই অস্থিরতা অনুভব করে এবং চোখে অন্ধকার দেখে। সহবাসের পরই অধিক ক্লান্তি নেমে আসে। তাহলে বুঝতে হবে যে, তার মস্তিষ্কের দুর্বলতা রয়েছে। যার কারণে তার যৌনশক্তি হ্রাস পেয়েছে।

৬। অনেক সময় পার্শ্ব'র দুর্বলতার কারণেও যৌনশক্তি কমে যায়। যদি কারো পাজরে ব্যাথা অনুভব হয় বা পার্শ্ব পরিবর্তন করলেই ব্যাথা শুরু হয়ে যায়। বারংবার পেশাবের প্রয়োজন দেখা দেয়। যৌনাঙ্গের উত্তেজনা পূর্ণভাবে অনুভব না হয়। মাঝে মধ্যে ব্যাথা অনুভব হয়। তাহলে বুঝতে হবে যে, তার পার্শ্ব দুর্বলতার কারণেই তার যৌনশক্তি কমে গেছে।

যৌনশক্তি কমে যাওয়ার বিশেষ কারণ

রোগী দুর্বল হওয়ার কারণে কোনো কাজ-কর্ম করার দ্বারা চিন্তা-ভাবনায় পেরেশান থাকে। কোমর, বুক, মাথায় প্রায় সময় ব্যাথা অনুভব হয়। হজমশক্তি দুর্বল, মেরুদণ্ডের মধ্যে পিপিলিকা চলাচলের অনুভব হয়। চোখে ঝাপসা দেখে। বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি দুর্বল এবং পেশাবের সাথে সাদা ধাতু বের হয়। বিশেষ পরামর্শ হলো, যৌনশক্তি কমে যাওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। কেবল বিশেষ বিশেষ কারণসমূহ উল্লেখ করা হল। যৌনশক্তি কমে যাওয়ার আরো বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। এখানে সব কারণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কেননা, তাতে বইয়ের কলেবর অনেক দীর্ঘ হবে। এজন্য সকল হাকীমের উচিত হলো এ জাতীয় সমস্ত কারণ নিজের আয়ত্বে রাখা। কেননা এ রোগটি শুধু একটি কারণেই হয় না বরং বিভিন্ন কারণেই হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সৎপরামর্শ হলো এ রোগের জন্য বিশেষজ্ঞ হাকীমের সাথে পরামর্শক্রমে চিকিৎসা গ্রহণ করা। আশা করা যায়, নিশ্চয় এ জাতীয় রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে। (ইনশাআল্লাহ্)

পুরুষত্বহীনের চিকিৎসা

জন্মগতভাবে পুরুষত্বহীন ব্যক্তিদের চিকিৎসা অসম্ভব। তদ্রুপভাবে যদি জন্মগতভাবে পুরুষত্ব গুণের চেয়ে মেয়েলী গুণ বেশি হয়, তাহলেও এ ধরনের রোগীদের চিকিৎসা অসম্ভব। তবে যদি জন্মের পর এ জাতীয় রোগ দেখা দেয়, তাহলে তার চিকিৎসা সম্ভব। এদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যবান, মোটা তাদের চিকিৎসা কিছুটা কষ্টকর। কিন্তু যারা হ্যাংলা-পাতলা, তাদের চিকিৎসা করা খুবই সহজ। সাধারণত মোটা লোকদের যৌনশক্তি কম হয়ে থাকে। তাদের যৌনশক্তি যদিও অধিক থাকে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তা বিলুপ্ত হতে থাকে। বৃদ্ধদের জন্য এ চিকিৎসা একেবারেই নিষ্ফল। এ সকল রোগীদের উচিত প্রথমে তাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা ও শারীরিক মজবুতী ও হৃৎপিণ্ড শক্তিশালীকারী ঔষধ খাওয়া। এতে শারীরিক শক্তি ফিরে আসলে যৌনশক্তিও ফিরে আসবে। যথাসম্ভব এরা সহবাস কম করবে। এসকল রোগীদের জন্য "ফুয়াতুর রাজেয়া" ঔষধ করা দরকার। এতে তাদের হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী হবে। খাওয়ার চাহিদা জাগবে। পেটের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। শারীরিক ব্যাথা কিছুটা কমে যাবে। পেটের বায়ু বের করে বীর্যকে ঘন করবে।

একটি গোপন কথা

সকল যৌনশক্তিতে দুর্বল রোগীদের উচিত প্রথমত শারীরিক দুর্বলতাসমূহ দুর করা। বিশেষ করে অন্তর, যকৃৎ, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, পার্শ্বের মধ্যের দুর্বলতা দুর করতে আপ্রাণ চেষ্টা তদবীর করবে। এর পর প্রয়োজন মতো চিকিৎসা গ্রহণ করবে।

একটি স্মরণীয় বিষয়

যৌনশক্তির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চিকিৎসার তুলনায় ভিটামিন জাতীয় খাবারই অধিক উপকারী। শক্তিবর্ধক খাদ্যই যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। বহু পরীক্ষা-নিরিক্ষা ও যাচাইয়ের পর একথার উপর সকলেই একমত হয়েছেন যে, ঘি, দুধ, গোস্ত, ডিম শক্তিবর্ধন ও হজমশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ উপকারী। এ জাতীয় খাবার যতটুকু হজম হবে যৌনশক্তি সে পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে শক্তিবর্ধক খাদ্য সহজ সাবলীলভাবে হজম হয়ে যায়। যেসব লোকদের খাবারের প্রতি খুব চাহিদা রয়েছে, তাদের খাবার খুব দ্রুত হজম হয়ে শরীরের অংশ হয়ে যায়। প্রতিদিন পরিমাণ মতো ব্যায়াম করতে হবে এবং ফ্রেস তাজা পানি দ্বারা গোসল করবে অথবা নিম পাতার গরম পানি দ্বারাও গোসল করা যাবে। সব সময় নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখবে। অধিক ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। টক জাতীয় খাবার গ্রহণ না করাই উত্তম। নেশা জাতীয় জিনিস যেমন-মদ, আফিম, গাজা ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকবে। সকাল-বিকাল বাগবাগিচায় বা নদীর তীরে হাটাহাটি করবে। শারিরীক সুস্থ্যতা ও যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য এসব খুবই কার্যকরী ও ফলদায়ক।

একটি বিশেষ দিক নির্দেশনা

সকলকে নিজ হৃৎপিণ্ডের প্রতি যত্নবান হতে হবে। বিশেষ করে যৌন রোগীদেরতো হর-হামেশাই খেয়াল রাখতে হবে। কেননা, যার হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী তার শরীর সুস্থ্য। যাদের হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী, তারা যত রুটি ও চিনিই আহার করুক না কেন তাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যাদের হৃৎপিণ্ড দুর্বল, দেশীয় ঘি, মোরগ ইত্যাদি নামী দামী খাবার খেলেও তাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে না। বরং ধীরে ধীরে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

একটি শিক্ষনীয় ঘটনা

জনৈক অভাবী ব্যক্তির একজন বন্ধু ছিল, যার অর্থ সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। অভাবী ব্যক্তি ছিল স্বাস্থ্যবান। আর সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল একেবারে রোগা-পাতলা অসুস্থ। কোনো এক সময় সম্পদশালী বন্ধু তার অভাবী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, বন্ধু! তোমার কি সুন্দর স্বাস্থ্য! আচ্ছা তুমি কি খাবার খাও? জবাবে সে বলল, দোস্ত আমি তোমার চেয়ে অনেক সুস্বাদু খাবার খাই এবং প্রতি মাসেই বিবাহ করি। পরবর্তীতে কোনো একদিন সে তার ঐ বন্ধুকে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিল। যথাসময়ে সে এসেও হাজির হল। মেযবান এখন খাবারের পরিবর্তে খোশগল্প শুরু করল। এদিকে বন্ধুর পেট ক্ষুদার যন্ত্রণায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাবার ব্যবস্থার কোনো নাম নিশানা নেই। শেষ পর্যন্ত সে বন্ধুকে বলল, দোস্ত! আমার অনেক ক্ষুধা লেগে গেছে। এভাবে আরো কিছু সময় চলে যাওয়ার পর আবারো তাকে তার ক্ষুধার বিষয়টি অবগত করালো। মেযবান যখন বুঝতে পারল যে, আমার এ বন্ধু ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেছে। তখন তাকে বলল, দোস্ত! আমার নিকট বাসী রুটি ও শাক ছাড়া কিছুই নেই। ধনী বন্ধু বলল, যা আছে, তাই উপস্থিত কর। ক্ষুধায় আমি একেবারে মরে যাচ্ছি। অতঃপর সে ঐ বাসি রুটি ও শাক তার সামনে উপস্থিত করল। খাবার সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে খাবারের উপর একপ্রকার ঝাপিয়ে পড়ল, তার মনে হলো, এত সুস্বাদু খাবার! এমন মজার খাবার মনে হয় বাপের জন্মেও খাই নি। যখন তার পেট ভরে আসল, তখন মেযবান তার জন্য উত্তম উত্তম রান্না করা গোশত, পোলাও ইত্যাদি হাজির করল। এবার ধনী বন্ধু বলল, দোস্ত! যত ভালো খাবারই তুমি আমার সামনে আন এখন আমি আর তা খাব না। একটু আগে আমি যা খেয়েছি এবং তাতে যে স্বাদ পেয়েছি এ সকল খাবারে মনে হয় আর তা পাওয়া যাবে না। এবার গরীব বন্ধু তাকে লক্ষ করে বলল, দোস্ত! তোমাদের মতো আমীর ও নেতারা ক্ষুধার পূর্বেই পৃথিবীর সকল ভালো ভালো খাবার খেয়ে থাকে। কখনো ক্ষুধা অনুভব করে না। কিন্তু আমি তোমাদের ন্যায় মনে চাইলেই খাই না। যখন বেশি ক্ষুধা অনুভব করি, কেবল তখনই খেয়ে থাকি। অতঃপর আমি আমার দোস্তকে সুস্বাদু মজাদার খাবার গ্রহণের কিছু নীতিমালা জানালাম। আমার দোস্ত বলল, বন্ধু তোমার সুস্বাদু খাবার বিষয়ে আমি অবগত হলাম কিন্তু প্রতিমাসে তুমি যে বিবাহ কর বলেছিলে, সেটি তো বুঝলাম না। মেযবান

বলল- আমি প্রতিমাসে আমার স্ত্রীর নিকট কেবল একবার সহবাসের উদ্দেশ্যে গমন করি। মনে যখন প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যৌনক্ষুধায় উত্তেজিত হই, তবেই তার সাথে সহবাস করি। আর তাতে আমার এরূপ প্রফুল্লতা আসে যেন আমি নতুন বিবাহ করেছি। আর যারা অধিক সহবাস করে, সহবাসের ইচ্ছা হলেই সহবাস করে। তারা তেমন আনন্দ ও প্রফুল্লতা অনুভব করে না, যেমন নাকি আমি অনুভব করি। ধনী বন্ধু তার গরীব বন্ধুর উপদেশমূলক দু'টি কথার সত্যতা বুঝতে পারল। এ ঘটনা উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, ক্ষুধার্থ অবস্থায় যে খাবার গ্রহণ করা হয়, তা দ্বারা শক্তি আসে, রক্ত তৈরী হয়। আর যে খাবার ক্ষুধার্থ অবস্থায় গ্রহণ করা হয় না, সেটি বিষের ন্যায়। অর্থাৎ কেবল ক্ষতিই করে। আর যৌনক্ষুধার প্রবলতায় সহবাস করলে পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে অহেতুক সহবাস করলে বা মনে সামান্য আগ্রহ জাগছে আর অমনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে পূর্ণাঙ্গভাবে তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় না।

যৌনস্পৃহায় দুর্বলতার কারণ

যৌনশক্তির দুর্বলতা দু'ভাবে হয়ে থাকে। প্রথমত উত্তেজনা-উদ্দীপনার অভাব, আর দ্বিতীয়টি হলো ধাতু বা বীর্য হ্রাস পাওয়ার কারণে। প্রথমটির কারণ হলো, যেসব খাবার যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে, শরীরে সেসব খাবারের অভাব। অথবা কোনো রোগের কারণে তা হ্রাস পেয়েছে। উত্তেজনার মূলে যে বাতাস ও রক্ত থাকে তা কমে যায়। ফলে উত্তেজনার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের রোগ থেকে বাঁচতে হলে- হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এমন খাবার গ্রহণ করতে হবে। এতে শরীর শক্তিশালী হবে। এর সাথে সাথে সহবাস কমিয়ে দিয়ে নিজেকে কিছুটা আরামে রাখবে। সময়ে সুযোগ মতো আনন্দ ভ্রমণ করবে। যেসব খেলা ধুলা ও সুগন্ধি মনে প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে তা ব্যবহার করবে। আর দ্বিতীয় কারণটির জন্য বীর্য উৎপাদনকারী খাবার গ্রহণ করবে।

চিন্তার বিষয় ঃ এক- কখনও এমন হয় যে, সহবাসে অধিক সময় লাগছে। এর কারণেও যৌনশক্তি হ্রাস পায়। কারও এরূপ সমস্যা হলে এ বিষয়ের কোনো বই পড়বে, যাতে সহবাস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অথবা প্রেমিক প্রেমিকার জ্ঞানের কিতাব পাঠ করবে বা জীব-জন্তুর মিলনের দৃশ্য অবলোকন করবে।

চিন্তার বিষয় ঃ দুই– কখনও রোগ-ব্যাধি দীর্ঘস্থায়ী হলে মনের ভিতরে চিন্তা-পেরেশানী বৃদ্ধি পায়। আর এ কারণেও অনেকের অন্তর দুর্বল হয়ে যায়। অন্তর দুর্বল হলে যৌনশক্তি লোপ পাবেই। অন্তর উৎফুল্ল থাকে এমন কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখবে। এভাবে অনেকটা অন্তরের দুর্বলতা কেটে যাবে।

চিন্তার বিষয় ঃ তিন– অনেকের যৌনাঙ্গ বাঁকা থাকে। অথবা যৌনাঙ্গের শিরাগুলো দুর্বল থাকে। এ সকল রোগ যাদের রয়েছে, তাদের চিকিৎসা হল, যৌনাঙ্গের শিরাকে মজবুতকারী তৈল মালিশ করা। তবে 'তেলাখাস' তৈল ব্যবহারে ধারণাতীত উপকার লাভ হয়।

সাবধান!

ইননীন বলা হয় ঐ সকল লোককে যারা জন্মগতভাবেই পুরুষত্বহীন। এসব ব্যক্তিদের কোনো চিকিৎসা নেই। তারা যেন এ কাজে কোনো ক্রমেই টাকা পয়সা খরচ না করে। জন্মগত কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে, মানুষের পুরুষত্বহীন হয়ে যাওয়ার। বিস্তারিত জানতে 'তানহায়ী কি সবক' কিতাব দেখুন। সংক্ষিপ্তভাবে যৌনশক্তি বৃদ্ধিকারী কিছু খাদ্যের নাম উল্লেখ করছি-

১. উটনীর দুধ। যত সহজে হজম সম্ভব হয় তা লাগাতার পান করবে।

২. আটঞ্জের বীচি চার মাশা আঙ্গুরের রসের সাথে মিশিয়ে পান করবে। এর দ্বারা যৌনশক্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে।

৩. গাজর বা মধুর দ্বারা তৈরী মুরব্বা খাবে।

৪. ঘি এর সাথে ডিমের হলুদ অংশটি ভূনা করে পিষানো এক মাশা আদার সাথে রান্না করে খাবে।

৫. গাজরের রস। হজমী বর্ধক কবিরাজী ঔষধ। যা কলিজাকে শক্তিশালী করে। মিষ্টি গাজর নিয়ে তার মধ্যের ডাটাটি ফেলে দিয়ে এবং তার উপরের হালকা আবরণ পরিস্কার করে নিবে। অতঃপর সে গাজরকে দুধের মধ্যে গরম করবে। যখন তা গলে মিশে যাবে, তখন লোহার চালনিতে চালিয়ে এক কিলো মধু মিশিয়ে আগুনের মধ্যে দিবে। যখন রান্নার নিকটবর্তী হবে তখন আদা, মসতৃলগী, দারুচিনি, গোলমরিচ, জাফরান, ছনবলতি (সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) এক তোলা করে সাসাকল মিছরি (বণ্য গাজর ঔষধ বিশেষ) দুই তোলা কাটিয়ে মিশিয়ে আগুনের মধ্যে পূর্ণভাবে রান্না করবে। অতঃপর প্রতিদিন দুই তোলা করে খাবে।

৬. মোরগের গোশত, যা বীর্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে থাকে।
৭. মুরগীর গোশত ঐ সময় উপকারী যখন সে এখনো ডিম দেয় নি।
৮. দুধের মধ্যে বাত্তাগান বাদাম দিয়ে পান করবে।

গোপন রহস্যের বিশেষ খাবার

যৌনশক্তি বৃদ্ধিকারী ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম এ কথাটি মাথায় রাখতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে মরগের গোশত অনেক উপকারী। তবে বেশি উপকারী হলো লাল বা কালো রঙয়ের মোরগ। এছাড়া অন্য রঙয়ের মোরগ গ্রহণ করবে না। কেননা, কালো ও লাল রঙয়ের মোরগ উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে উত্তেজনাও বেশি। মোরগ রান্নার পদ্ধতি–

এক কিলোগ্রাম মোরগের গোশতের সাথে দশটি পেয়াজ যা কমপক্ষে পরিমাণে তিনশত গ্রাম হয়। এক কাপ সরিষার তৈল, সে সাথে পরিমাণমত মসলা দিয়ে ভুনা করবে। এসব খাবার খেলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

মুরগীর ডিম অনেক উপকারী

মুরগীর ডিমও যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে বেশ উপকারী। সমস্যা হলো দৈনিক মুরগীর ডিম খেলে চেহারায় দাগ সৃষ্টি হয়। ডিম ধীর গতিতে হজম হয়। এজন্য কেবল ডিমের হলুদ অংশ খাওয়া উচিত। কাঁচা ডিমও বেশ উপকারী।

যেভাবে বানাতে হয়

পরিপূর্ণভাবে ডিমকে ফুটানো যাবে না। অন্যথায় তা বদহজম সৃষ্টির কারণ হতে পারে। অতি তাড়াতাড়ি ডিম হজমের জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে- ফুটন্ত গরম পানিতে ডিম ছেড়ে দিবে এবং ধোয়া উঠা পর্যন্ত তাকে সিদ্ধ করবে। অর্থাৎ শান্তভাবে একশবার আল্লাহ্ আল্লাহ্ পবিত্র শব্দটি পাঠ করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততটুকু সময় ডিমকে সিদ্ধ করবে।

খেজুর যৌনশক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উপায়

শুকনা খেজুরের প্রভাব যৌনশক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অনেকটা গ্রহণযোগ্য। আমাদের ধর্মেও এ খেজুরের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এমনকি খেজুর খাওয়াকে শরীয়তে সুন্নাতের পর্যায় রাখা হয়েছে।

একেবারে গরীব ও অঢেল সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিরাও এটাকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠানে খেজুর বিতরণকে একটি প্রয়োজনীয় বস্তু মনে করা হয়। খেজুর ছাড়া অনেক দামী খাবার থাকা সত্তেও এটা অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয় কেননা, এটা যৌনশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী একটি বস্তু। এর দ্বারা বীর্য অসম্ভব আকারে তৈরী হয়।

যৌনশক্তি সম্পর্কে কারো কারো ধারণা

অনেকে এমন রয়েছে যে, যদি দু'চার দিন স্ত্রীর সাথে সহবাসে হেরে যায়, তখন তার মনে এ কথাটি জেগে ওঠে যে, আমার যৌনশক্তি মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। অথচ সে পূর্ণ সুস্থ। এমন লোকেরা যদি জীব-জন্তুর মিলন দেখে তবে নিজেদের ভুল ধারণা পালটে যাবে।

ধ্বযভঙ্গ রোগীর ঔষধ

উপাদান	পরিমাণ
সিদ্ধি গাছের পাতা	৩ মাশা
কাঁচা বাদাম	৩ মাশা
জয়ফল	২ মাশা
যত্রিক	২ মাশা
দারুচিনি	১ মাশা
জায়ত্রী	১ মাশা (গরম মসলা বিশেষ)

ধ্বজভঙ্গ রোগীদের ঔষধ নিম্নরূপ

উপরোক্ত উপাদানসমূহ একত্রে গুড়া করে গোলাপের পানি দ্বারা খামিরা বানিয়ে বুট অথবা ছোলার আকারে গোলাকার করবে এবং দৈনিক সকাল-বিকাল দু'টি করে খাবে। এভাবে লাগাতার পঁচিশ দিন খাবে। ইনশাআল্লাহ্ তার ধ্বজভঙ্গ রোগ ভালো হয়ে যাবে।

যৌনশক্তি কমে যাওয়ার জন্য চিনিও একটি মাধ্যম

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কারো কারো যৌনশক্তি হ্রাস পেয়েছে বেশি পরিমাণে চিনি খাওয়ার দ্বারা। এজন্য "দাওয়া হাইরাত" অবশ্যই গ্রহণ

করবে। আর এটি বেশ উপকারী ঔষধ। এর সাথে সাথে চিনি খাওয়ার পরিমাণ আগের তুলনায় কিছুটা কমিয়ে দিবে। এ চিকিৎসাটি সকল সুগার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য।

আসক্তির চিকিৎসা

কারো প্রতি আসক্ত হওয়ার বিষয়টি বর্তমানে খুবই দেখা যাচ্ছে। অনেক পুরুষ পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তাদের জন্য উত্তম চিকিৎসা হলো, সম্ভব হলে সে মেয়ের সাথে তার বিবাহ পড়িয়ে দেওয়া। অন্যথায় তার প্রতি গভীর ঘৃণা সৃষ্টি করবে। অন্য সুন্দরী যুবতী, রূপবতী, ষোড়শী কন্যার রূপগুণ বর্ণনা করে সে ছেলেকে বিবাহ দিয়ে দিবে। আশা করা যায় এর দ্বারা পরনারীর প্রতি আসক্ত রোগটি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সকলের জন্যই বিশেষ কথা

নিম্নোক্ত কথাগুলো সকলের মেনে চলা আবশ্যক। বিশেষ করে যারা যৌনরোগে আক্রান্ত। নিম্নোক্ত কথাগুলোর উপর আমল করার দ্বারা অনেক বিপদজনক রোগ-ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা যাবে। যে রোগ শরীরে দেখা দিয়েছে সেসব রোগ থেকেও মুক্তি লাভ হবে। কথাটি হল—

দৈনিক সূর্য উঠার আগেই ঘুম থেকে উঠতে হবে। মুখ পরিস্কার করে খালি পেটে মনের রুচি অনুযায়ী গরম বা ঠাণ্ডা পানি বেশি পরিমানে পান করবে। বাথরুমের চাপ প্রবল হলে বাথরুমে যেতে হবে। যেসব লোক মূত্ররোগে আক্রান্ত, তাদের জন্য এটা করা খুবই জরুরী। এতে মূত্রত্যাগে সহজতা হবে। বাথরুমে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে। কেননা, এতে বাথরুম হতে তাড়াতাড়ি ফারেগ হওয়া যায়। আর এ পদ্ধতিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সুন্নাতও।

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া। যেহেতু বেশিরভাগ স্বপ্নদোষ শেষ রাতে হয়ে থাকে তাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা। সকালে হাটাহাটি করাও শরীরের জন্য অনেক উপকারী। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, সকালের ভ্রমণ অলঙ্কার বিশেষ। এর দ্বারা অন্তর ও মন মেজাজ পরিস্কার হয়। বাদ ফজর ঘন্টা দুয়েক সজোরে হাটাহাটি করা শরীর সুস্থ রাখার গোপন রহস্য। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা ও অশ্লীল ছায়াছবি দেখা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে

রাখবে। নামায রোযা ইত্যাদি আমলের প্রতি যত্নবান হবে। কমপক্ষে প্রতিমাসে একদিন রোযা অবশ্যই রাখতে চেষ্টা করবে। পেটের গ্যাস ও মূত্যত্যাগের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের আলসেমি করবে না। মূত্রত্যাগের রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবে। জেনে রাখবে পেটের রোগ সকল রোগের প্রাথমিক অবস্থা। পেটের রোগের কারণেই নিরানব্বইটি রোগ হয়ে থাকে। আমাশা দেখা দিলে দু'এক বেলা অনাহারী থাকবে বা আগের তুলনায় কম খাবে। তবে পানি বেশি বেশি পান করবে। বিশেষ করে সকালে পেট পুরে পানি পান করবে। শাক-সবজিই খাবারের প্রধান বানাবে। মনে রাখতে হবে, ঢেঁড়সের দ্বারা আমাশার সৃষ্টি হতে পারে। সেহেতু আমাশা থাকাবস্থায় ঢেঁড়স বর্জন করবে। অধিকাংশ স্বপ্নদোষ পেটের দুর্বলতার সুযোগেই হয়ে থাকে। এজন্য রাতের খাবার কম খেয়ে কমপক্ষে একশ আশি কদম সমপরিমাণ স্থান চলাচল করবে। ঘুমানোর দুইঘন্টা পূর্বে রাতের খাবার খাবে। তবে উত্তম পদ্ধতি হল রাতের খাবার খেয়ে এশার নামায পড়া। রাতে ঘুমানোর পূর্বে দুধ পান করবে। তবে এক্ষেত্রে ফুটন্ত গরম দুধ পান করা থেকে বেঁচে থাকবে। চাই তা রাতে হোক বা দিনের বেলাই হোক। রাতের ঘুমানোর পূর্বে ভরপেট পানি পান করবে না। এতেও স্বপ্নদোষ হওয়ার আশংকা রয়েছে। দিনের বেলা ইচ্ছা করলে পেটভরে খাবার খেতে পারবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম করবে। অর্থাৎ তুলনামূলক কিছুটা কম খাবে। বরং পেটের কিছু অংশ খালি রাখবে। রাতে ঘুম যাওয়ার পূর্বে পেশাব পায়খানা করে ঘুমাবে এবং পেশাবের পর যৌনাঙ্গে ঠান্ডা পানি ব্যবহার করবে। এর দ্বারা স্বপ্নদোষ থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

সহবাসের পর দেহের যত্ন

১। সহবাসের পর দু'জনের কিছুক্ষণ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে অবস্থান করবে। এতে মানসিক তৃপ্তি হয়। ধীরে ধীরে দেহ শীতল হয়। এতে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

২। অবশ্যই প্রত্যেকে নিজ নিজ যৌনাঙ্গ ভালোভাবে ধৌত করবে। এটি অবশ্য পালনীয়। তবে সহবাসের কিছুক্ষণ পর।

৩। উভয়ে ভালোভাবে গোসল করবে। গোসল না করলে মন সঙ্কোচিত হয়ে থাকে, কাজ-কর্মে বিমর্ষভাব তৈরি হয়, একঘেয়েমি আসে।

৪। শর্করা মিশ্রিত এক গ্লাস পানি কিঞ্চিত লেবুর রস বা দধি কিংবা শুধু ঠাণ্ডা পানি হলেও খেতে হবে। যা শরীরের জন্য মঙ্গল।

৫। প্রয়োজন ক্ষতিপূরক কোনো ঔষধ সেবন করা যেতে পারে।

৬। সহবাসের পর ঘুমানো একান্ত প্রয়োজন।

৭। সহবাসের আগে বা পরে নেশা সেবন করা ভালো নয়। এতে দৈহিক ক্ষতি হয়। মানসিক অসাড়তা আসতে পারে।

৮। সহবাসের পর অধিক রাত্রি জাগরণ, অধ্যয়ন, শোক প্রকাশ, কলহ, কোনো দুরুহ বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা ও মানসিক কোনো উত্তেজনা ভালো নয়।

পুরুষের যৌবন আগমণের লক্ষণ

পুরুষের যৌবন আগমন বিভিন্ন লক্ষণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে। যেমন-

১। কণ্ঠস্বর ভারী হওয়া।

২। গোঁফের মধ্যে রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠা।

৩। বগলে ও গুপ্তস্থানে লোম দেখা দেয়া।

৪। তাদের দেহের মধ্যে বীর্য বা কাম শক্তি সৃষ্টি হওয়া।

৫। মানসিক পরিবর্তন ঘটা।

নারীর যৌবন আগমণের লক্ষণ

নারীর যৌবন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের যে সব চিহ্ন ফুটে ওঠে, তা হলো–

১। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হওয়া।

২। দেহে নারী-সুলভ কমনীয়তা ফুটে ওঠা।

৩। হাত, পা, নিতম্ব ইত্যাদিতে মেদ জমে ওঠা।

৪। বক্ষদেশ উঁচু ও উন্নত হওয়া।

৫। মানসিক পরিবর্তন দেখা দেওয়া।

৬। প্রতি আটাশ দিন বা তার চেয়ে কম-বেশিতে মাসিক বা ঋতুস্রাব দেখা দেয়া। এটি নারীর যৌবন আগমনের জন্য বিশেষ একটি চিহ্ন।

পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট নারীকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উপায়

হাকিম জালিনুস বলেন– যার স্ত্রী পর পুরুষানুগামিনী, সে স্ত্রী যখন চিরুণী দিয়ে মস্তকের চুল আঁচড়িয়ে ফেলে দিবে, তখন সে চুল আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম ছাইগুলো পুরুষাঙ্গে লাগিয়ে স্ত্রী সহবাস করলে ঐ স্ত্রীর কাছে ভিন্ন কোনো পুরুষ আগমন করলেও কাপুরুষ হয়ে তখনই লজ্জিত অবস্থায় পলায়ন করবে। অন্য কোনো পুরুষ সে স্ত্রীর সাথে সহবাসে সক্ষম হবে না। বাধ্য হয়ে তাকে তার স্বামীর বশীভূত হয়ে থাকতে হবে। ক্রমে যে তাকে শান্তভাব ধারণ করতে হবে এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

নারী বশীভূতকরণ হেকমত

"বাসতাতান ফিল ইয়াওমি ওয়াল জিসমি ওয়াল্লাহুল ইউ'তিল মুলকা মাই য়াশা, ওয়া হুয়াস সামী-উল আলীম"

১। উক্ত আয়াতটি চল্লিশবার পাঠ করে রমনীর পরিধান করা বস্ত্রের এক কোণে ফুক দিয়ে বেঁধে রাখবে এবং উক্ত আয়াত দুধ দিয়ে রমণীর কাপড়ে এক কোনে উহার নামসহ লিখবে। যখন ঐ কাপড় পরিধান করবে, অমনি অধৈর্য্য হয়ে ঐ পুরুষের নিকট উপস্থিত হবে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জন মন-প্রাণে মিশে থাকবে।

২। শনি ও মঙ্গলবারে শ্মশানের কয়লা, অস্থি আর কবরের মাটি ও তথাকার তুলসি গাছ তুলে আনবে। এরপর যে রমনীকে বশ করতে ইচ্ছুক সে রমনীর পরিধেয় বসনের এক কোণ কাঁচি দিয়ে কেটে নিবে এবং ঐ রমনীর নখ ও মাথার চুল কেটে রাখবে। তার পর শ্মশানের কয়লা, কবরের মাটি একত্রে মিশ্রিত করে ঐ মাটি দিয়ে একটি পুতুল বানাবে এবং পুতুলের পেটের মধ্যে তুলসির শিকড়, অস্থি, কাপড় কাটা, মাথার চুল বা নখ পুরে দিবে। পরে পুতুলটি সে রমনীর ঘাড়ে স্পর্শ করিয়ে একটি লোহার পেরেকে গেঁথে ঘরের দেয়ালে বেঁধে রাখবে। তার নাম নিয়ে একশ একটা আলপিন দিয়ে বিঁধে রাখবে। রমনী তখনই এসে পুরুষের সাথে মিলন করবে।

নিজের অবাধ্য স্ত্রী বশ করার উপায়

ইলাজে লোকমানিয়া'র মধ্যে এ বচনটি লেখা আছে–

"শুন শুন ওরে ধুতরা শুন পতি, জানি তোমার জাতি

ফলানার অঙ্গধর ভিতরে ধর, শিরে উঠে মস্তকে ধর,
দোহাই সোলেমানের নারী অমুক পুরুষ অঙ্গে এসে বাস কর।"

একটি জোড়া ধুতরা ফুল হাতে নিয়ে উক্ত বচনটি তিনবার পাঠ করে জোড়া ধুতরার ফুলে ফুঁ দিবে এবং ঐ পড়া ফুল স্ত্রীকে দেখালে সে আসক্ত হয়ে স্বামীর সাথে মিলন করবে। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কখনই বিচ্ছেদ হবে না।

যে নারী লজ্জাবতী গাছের পাতা নিজের শয্যার নিচে রেখে দিবে, তার নিকট যেমন কোনো পুরুষ গমন করুক না কেন, কাপুরুষের ন্যায় সহবাসে অক্ষম হয়ে লজ্জিত হয়ে চলে যাবে। এ হেকমতটি অনেক স্ত্রীলোক পরীক্ষা করে আশাতীত ফল পেয়েছে।

স্ত্রীলোক সরীসৃপ কেঁচো মরা শুষ্ক করে যদি শয়ন করার শয্যার নিচে রেখে দেয়, কোনো পুরুষই ঐ রমনীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম হবে না।

স্বামীর আগেই স্ত্রীর বীর্যপাতের উপায়

অনেক স্ত্রীর ধাতু এমন কঠিন যে, স্বামী সহবাস করে উঠে গেলেও তার বীর্যপাত হয় না। যদি স্বামী বীর্য আগে বের হয়ে যায়, আর স্ত্রীর বীর্য বের না হয়, সে নারীর মনের কষ্ট ব্যক্ত করার কোনো স্থান থাকে না। স্বামীর মনেও একটি আক্ষেপ থেকে যায় যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে পেরে উঠলো না। সহবাসের ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দিতে পারলো না। এরূপ আক্ষেপ সৃষ্টি হওয়াতে অনেক স্বামী ধীরে ধীরে সহবাসের সাহস হারিয়ে ফেলে, ফলে ধীরে ধীরে তার সহবাসের আগ্রহ হ্রাস পায় এবং যখনই সহবাস করতে যায়, দেখা যায় যে, তার ঐ চিন্তার কারণে বীর্যপাত পূর্বের তুলনায় আরো তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। এজন্য স্বামীকে নিম্নোক্ত তদবীর গ্রহণ করতে হবে। এতে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে জয়ী হতে পারবে।

১। বিশুদ্ধহিং আধা তোলা, চামিলির তেলসহ কোনো পাত্রে গরম করে একটু গাঢ় করবে। সহবাস করার পূর্বে ঐ তেল পুরুষাঙ্গে মালিশ করে সহবাস করবে। এর দ্বারা স্বামীর আগেই তার স্ত্রীর বীর্যপাত হতে এবং এতে স্ত্রীর মনে অধিক আনন্দ জন্মাবে। এমনকি সহবাসের সময় উভয়ে আত্মহারা হবে।

২। চৌকিয়া সোহাগা ও আরবী গদ, এ দু'টি আগুনে খৈ করে ফুটিয়ে গুড়ো করে পানির সাথে গুলে বটিকা তৈরি করবে। যখন সহবাস করার প্রবল

ইচ্ছা হবে, তখন ঐ বটিকা ভেঙ্গে মুখে থুথুতে গুলে পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে সহবাস করলে স্ত্রীর বীর্য তার আগেই বের হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার স্বামীর প্রেমানুরাগী হয়ে চিরকাল থাকবে। এটি এ কাজের জন্য খুবই কার্যকরী।

দীর্ঘক্ষণ সহবাস করার তদবীর

হাকিমগণ বলেন- অনেক পুরুষ এমন আছে, নারীদের নিকট গমন করা মাত্রই তাদের বীর্যপাত হয়ে যায়, এতে পুরুষদের মনে এক প্রকার আক্ষেপ থেকে যায়। তবে কেউ যদি বহুক্ষণ স্ত্রী সহবাস করতে ইচ্ছে করে, তাকে নিম্নোক্ত তদবীর অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

এক ঃ রবিবার দিনে একটি কাক মেরে তার জিব কেটে শুকাবে। পরে ঐ জিভটাকে একটা মাদুলিতে ভরবে। স্ত্রী সহবাসের সময় ঐ মাদুলি কোমরে রেখে সহবাসে লিপ্ত হলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মাদুলি কাছে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যস্খলন হবে না। কোমর হতে যখন মাদুলি খুলবে অমনি বীর্যস্খলন হবে। নতুবা দুই ঘণ্টাতেও বীর্যস্খলন হবে না।

দুই ঃ কালো কুকুরের বাম চোখের পাপড়ি একটা আর কিছুটা কালো ধুতরার বাকল মাদুলিতে ভরে রেখে স্ত্রীগমন করলে বীর্যস্খলন হয় না।

তিন ঃ কাকের নলির অস্থি যতক্ষণ কোমরে বেঁধে রাখবে ততক্ষণ বীর্যস্খলন হবে না।

চার ঃ কুমিরের লিঙ্গ, কিংবা গণ্ডারের লিঙ্গ, নতুবা আসেওড়ার শিকর। এ তিনটির যেটা ইচ্ছে কোমরে রেখে স্ত্রীসহবাস করলে বীর্যস্খলণ হবে না।

পাঁচ ঃ আফিম দুই রতি, হরিদ্রা চার রতি পিষে গুলী বানাবে। আহারের পর পান খেয়ে উক্ত গুলী ভক্ষণ ও এক মুষ্টি চিড়া, একটা লবঙ্গ খেয়ে সহবাস করলে সহজে বীর্যস্খলন হয় না।

ছয় ঃ আখন্দ পাঁচ দেরেম, পিপুলের বিচি পাঁচ দেরেম, আদা ভুনা আধা কাচ্চি, খসখস ফাঁকি দশ দেরেম, পুরাতন গুড় বিশ দেরেম, এ সকল দ্রব্য একত্রে মিশিয়ে বাইশটি গুলী বানাবে এবং স্ত্রীগমনের সময় একটা গুলী খেয়ে সহবাস করলে বীর্যস্খলণ হবে না। বীর্যস্খলনের জন্য অম্বল খেতে হবে।

সাত ঃ শিরা তোখমে কাহ, শিরা তোখমে খোরফা, শরবতে শিরা খস খস, শিরা তোখমে কাকড়ি, তোখমে খস খস কাকড়ি, নিশফর মিহিন করে পিষবে। মুসূরের ডাল খোসক করে খাবে। গোলে আনমানি চন্দন, ধনে পিষে

পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হলে মহা সুখানুভব করবে।

আট ঃ লবঙ্গ, জাফরান, আকড়করা এটা সমানভাগ, মেস্ক সামান্য প্রকার মধুর সাথে মিশ্রিত করে তা পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে আধা ঘন্টা পরে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে তারা পরস্পরে মহানুসখানুভব করতে পারবে।

নয় ঃ কাফুর (কর্পূর) সোহাগা প্রত্যেকটি এক মাশা, ১২টি লবঙ্গ, ষোলটা কাবাব চিনি। এসব দ্রব্য মিহিন গুঁড়া করে গুলী বানাবে। সহবাসের সময় তা পানিতে গুলে পুরুষাঙ্গে মালিশ করে নিবে; এরূপ করলে স্ত্রী সহবাসের স্বাদ ও মজা জীবনে ভুলতে পারবে না এবং স্ত্রী বিনামূল্যে পুরুষের অধীন হয়ে থাকবে।

দশ ঃ শ্বেতকরবী পুষ্প ছায়াতে শুকিয়ে পরে কুটে ফেলবে। ঐ আটা পোস্ত খসখসের পানিতে মিশিয়ে কলাই পরিমাণে গুলি নির্মাণ করে রাখবে। স্ত্রী সহবাসের সময় তা পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিবে এতে স্ত্রী গমনে কি প্রকার সুখানন্দ হয় যে, তার পরীক্ষা করলেই জানতে পারবে।

এগারো ঃ ছোলরছ ফিটকিরি পিষে ছোলরছ আগুনে উত্তপ্ত করে রেখে দিবে। সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গে মালিশ করে সহবাসে লিপ্ত হবে। এতে উভয়ে আনন্দে অধীর হয়ে পড়বে।

বার ঃ স্ত্রীকে যদি সহবাসে বিমুগ্ধ করিয়ে প্রণয় বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাও ইউনানী হাকিমগণের হেকমত সত্য বলে মনে ধারণা হয়, তাহলে বিশ্বাস সহকারে এ তদবীরগুলো করে দেখ। আদা, আকরকরা, তারচিনি, মিছরি, প্রত্যেকটি ছয় মাশা ওজনে নিয়ে কুটে পিষে সোপের পানিতে গুলে বড়ি করে রাখবে। সহবাসের দশ বার মিনিট পূর্বে ঐ বড়ি জৈতুন তেলের সাথে মিলিয়ে প্রলেপ দিয়ে সহবাস করলে এরূপ সুখানুভব করবে যে, তা জীবনে ভুলতে পারবে না।

নারীর কামনার পুরুষ

১। বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও যুবক।

২। সুন্দর গাত্রবর্ণ, সুদর্শণ ও সুশ্রী।

৩। যার মধ্যে নিজস্ব স্বকীয়তা বা বিশেষ দৃঢ়তা আছে।

৪। যে কিছুটা অহঙ্কারী, গর্বিত।

৫। যার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে।

৬। যার বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা আছে।

৭। যে পুরুষের নিজস্ব উপার্জন যথেষ্ট এবং সে তাকে প্রতিপালন করার যোগ্য।

৮। যে পুরুষের অন্য স্ত্রী নাই বা অন্য নারীর প্রতি গভীর আসক্তি নাই।

৯। যে নির্ভরযোগ্য তাকে সারা জীবন আশ্রয় দিতে পারবে।

১০। নায়ক, সুশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচি সম্পন্ন হলে খুব ভালো।

১১। খেয়ালী ও কল্পনা প্রবণ পুরুষকেও অনেক নারী পছন্দ করে থাকে।

১২। যে পুরুষের নানা গুণ আছে। যেমন- গান, বাজনা, শিশু সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি। কোনোও বিশেষ গুণের অধিকারী যে পুরুষ।

১৩। যে পুরুষ উচ্চ বংশোদ্ভুত।

১৪। বয়সে নারীর চেয়ে কিছুটা অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বছরের বড়।

১৫। যে পুরুষ নারীকে সত্যিই গভীরভাবে ভালোবাসে।

১৬। খুব কামুক বা লম্পট পুরুষকে চায় না।

১৭। বয়স্ক বা অনাসক্ত পুরুষকে চায় না।

১৮। জুয়াড়ি বা বেশ্যাসক্ত পুরুষকে চায় না। এই ধরনের অন্যান্য দোষ থাকলেও তাকে নারী ঘৃণা করে।

১৯। যে পুরুষ হৃদয়হীন বা অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হয় তাকে নারী চায় না।

২০। যে পুরুষ পৌরুষত্বহীন বা দৃঢ়তাহীন তাকেও নারী চায় না।

কি কারণে নারী পরপুরুষ চায় না

১। যখন স্বামীর সঙ্গে গভীর ভালোবাসা থাকে।

২। যখন তার ছেলে-মেয়ে থাকে।

৩। যখন তার বয়স বাড়ে।

৪। যখন সে কোনো মনস্তাপ পায়।

৫। যখন সর্বদা স্বামীর কাছে থাকে।

৬। যখন সে তার নতুন প্রেমিকের বিষয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত।

৭। তার প্রেমিকের কাছে যেতে বিপত্তি থাকে।

৮। যখন সে বুঝতে পারে, নতুন প্রেমিক শুধু ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়।

৯। যখন সে বোঝে ঐ পুরুষ অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছে।

১০। যখন সে সন্দেহ করে নবপ্রেমিক তার গুপ্তপ্রেমের কথা সহজে ব্যক্ত করতে পারে।

১১। যখন সে মনে করে নবপ্রেমিকের প্রেম নিবেদন একটা ছলনা মাত্র।

১২। যদি সে মনে করে নবপ্রেমিক তার বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারায় তাকে ভোগ করাবে।

১৩। স্বামী টের পেতে পারে যদি এমন ভয় থাকে।

১৪। যখন নতুন প্রেমিক প্রচুর কাম ক্রীয়া অবগত, তখন তার সঙ্গে মিলনে ভয় পায়।

১৫। দীর্ঘদিন স্বামীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করেছে। তখন সে নতুন প্রেমিককে ভয় পায়।

১৬। যদি হরিণী নারীর নবপ্রেমিকের বুষ বা অশ্ব জাতীয় লিঙ্গ।

১৭। যখন সে দেখে নতুন প্রেমিক স্থান কাল মানতে চায় না।

১৮। যখন সে দেখে নতুন প্রেমিকের সমাজে কোনো স্থান নেই।

১৯। যখন দেখে নতুন প্রেমিক তার সঙ্কেত বা ইশারা ইত্যাদি বোঝে না। খুব নির্বোধ।

২০। যখন হস্তিনী নারী দেখে তার প্রেমিকের শশক জাতীয় লিঙ্গ।

২১। যখন সে বুঝে তার সঙ্গমে প্রেমিকের শারীরিক, আর্থিক ক্ষতি হবে।

২২। যখন দেখে নবপ্রেমিকের বয়স বেশি।

২৩। যখন বুঝবে নবপ্রেমিক তাকে সন্দেহ করছে।

২৫। যখন তার মনে খুব ধর্মভাব বর্তমান ও এসব বিষয়ে চিন্তা করে।

পরনারীর কাম্য পুরুষ

পরনারী কোন কোন ধরনের পুরুষ বিশেষভাবে কামনা করে, নিম্নলিখিত গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিরা সহজেই পরনারীকে আকর্ষণ করতে পারে।

১। যে পুরুষ কামশাস্ত্রে বেশ সুপণ্ডিত।

২। যে পুরুষ বেশ গুছিয়ে গল্প বলতে পারে।

৩। যে পুরুষ বাল্যকালে খেলার সাথী ছিল।

৪। যে পুরুষ সুন্দর ও সুদর্শন যুবক।

৫। যে পুরুষ খেলার সঙ্গী।

৬। যে পুরুষ নারীর কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং কোন যথোচিতভাবে তার আবদার শোনে।

৭। যে পুরুষ বুঝে সুঝে কথা বলে।

৮। নারী যা চায় তা, সহজে যে জোগাড় করে দিতে পারে।

৯। নারীর প্রেমিকের পূর্ববর্তী দূত।

১০। যে যুবক নারীর গুপ্ত কথা জানে।

১১। যে অনেক বিলাসিনী নারীর কেন্দ্রীভূত হয়।

১২। যে পুরুষ তার অভিলাষিত নারীর সাথীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে।

১৩। যে তার সম্পত্তির জন্যে সুবিদিত।

১৪। যে একজন নারীর সঙ্গে একত্র বয়সে বেড়েছে।

১৫। একজন কামুক বলে বিদিত। তার প্রতিপত্তি বা অর্থ আছে।

১৬। কামুক পরিচায়ক।

১৭। ধাত্রী কন্যার প্রেমিক বা স্বামী।

১৮। সংসারে যে নতুন বরস্বরূপ এসেছে।

১৯। যে পুরুষ বন ভোজন ও উদ্যান উৎসবে কৃতি।

২০। একজন অপব্যয়ী বা ব্যয়ে মুক্তহস্ত।

২১। আমোদপ্রিয় অর্থাৎ নাটক সিনেমা দেখতে ভালোবাসে।

২২। বৃষ জাতীয় পুরুষ-নারী বোঝে তাদের দ্বারা পূর্ণ কামতৃপ্তি সম্ভব।

২৩। অতি সাহসী এবং মস্তান ধরনের লোক।

২৪। যে লোক নারীর স্বামীর থেকে বেশি বিদ্বান সুন্দরতর বা বেশি প্রতিভাসম্পন্ন।

২৫। যে খুব বাবুয়ানা করে বেড়ায়।

পুরুষ যেভাবে নানা হাবভাব করে নারীর মনহরণ করতে পারে, তেমনি অনেক নারী ইঙ্গিত প্রকারে পুরুষের সুগম হতে পারে। এ জাতীয় কিছু নারীর কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। যে নারী তাদের গৃহদ্বারে পথিকদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

২। যে বাড়ীর ছাদ থেকে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

৩। যে পল্লী পুরুষেরা বেশি গুলতানি করে- আর যে নারী তাতে সহজে যোগ দেয়।

সূচীপত্র

৪। যে বিদেশীর দিকে কটাক্ষনেত্রে তাকায়।

৫। বিদেশীরা তাকালে যে নারী তাদের দিকেও বারবার তাকায়।

৬। যে নারীর স্বামী বিনা কারণে অন্য নারীকে বিয়ে করেছে।

৭। যে নারী স্বামীকে ঘৃণা করে।

৮। স্বামী কর্তৃক ঘৃণিতা নারী।

৯। যে স্বভাবতঃই অতি অবগুণ্ঠনবতী।

১০। যে নারী অপুত্রকা।

১১। যে নারী সর্বদা তার পিতৃগৃহে বাস করে।

১২। যে সব নারীর পুত্র-কন্যা প্রায়ই মারা যায়।

১৩। যে নারী তার নিজের বাড়িতে বা পল্লীর অন্য বাড়িতে বিভিন্ন সমিতিতে যোগদান করে।

১৪। যে প্রথমেই ইচ্ছা করে পুরুষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে।

১৫। কোনো অভিনেতা বা নর্তকের স্ত্রী।

১৬। বাল্য বিধবা নারী।

১৭। যে নারী নিজে দরিদ্র হলেও বিলাসী জীবন যাপন করতে ভালোবাসে।

১৮। যার স্বামীর অনেকগুলি কনিষ্ঠা প্রণয়িনী বা পত্নী আছে।

১৯। যে নারী স্বামীকে অপদার্থ বলে বিবেচনা করে কিন্তু নিজে বেশ সুন্দরী।

২০। যে নারী নিজে বেশ গুণবতী কিন্তু স্বামী একেবারে অপদার্থ।

২১। যে নারী অন্য পতির সঙ্গে বিবাহ স্থির কিন্তু তখনও বিবাহিতা নয়।

২২। যে নারীর নায়কের স্বভাব প্রভৃতি তার গুপ্ত প্রেমিকের তুল্য।

২৩। যে নারী সর্বদা অপরিচিত লোকের মতে মত দিয়ে থাকে।

২৪। যে নারী বিনা কারণে স্বামী কর্তৃক অপমানিতা হয়েছে।

২৫। যে নারী স-পত্নীদের দ্বারা অপমানিতা।

২৬। যে নারীর স্বামী প্রায়ই বিদেশে বাস করে।

২৭। যে নারী অতি কামুক।

২৮। যার স্বামী বেশি বাইরে সারাদিন থাকে।

২৯। যে নারীর স্বামী নিষ্ঠুর।

৩০। ভীরু স্বভাব, বেঁটে বিকলাঙ্গ ও বৃদ্ধ যে নারীর স্বামী।

৩১। মণিকারের পত্নী বা পত্নীগণ।
৩২। কোনোও কৃষক পত্নী যে নগরে বাস করে।
৩৩। যে নারীর স্বামী যৌন শীতলযুক্ত।
৩৪। যে নারীর স্বামীর গা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়ে থাকে।

স্ত্রীর মন উচাটান করার তদবীর

যে স্ত্রী স্বামীর সাথে সহবাস করতে আগ্রহী নয়, সপ্তাহে কি মাসের মধ্যেও একবার সহবাস করতে রাজী হয় না। তার মন সহবাসে আগ্রহী করতে নিম্নোক্ত তদবীর গ্রহণ করতে হবে। যথা–

একটা কালো বেগুন নিয়ে তাতে মাটির প্রলেপ দিবে, তারপর আগুনের তাপে তা পাকাবে। তারপর উপরের মাটি ফেলে দিয়ে ঐ বেগুনের ভিতর তিন দিন পর্যন্ত পিপুল পুরে রাখবে, তিন দিন পরে পিপুলগুলো বের করে শুকিয়ে ফেলবে। পিপুল শুকিয়ে গেলে চূর্ণ করে মধুর সাথে মিশিয়ে পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। এতে তার মনে সহবাসের আগ্রহ জন্ম নিবে। তার মন পুরুষকে ফেরেশতার ন্যায় দেখতে চাবে এবং সবসময় পুরুষের কথাই মনে পড়বে। এটি খুবই উপকারী তদবীর।

মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ সঙ্কীর্ণ ও ছোট করার হেকমত

স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ প্রশস্ত হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কখনই সহবাসে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। এ জাতীয় সমস্যায় অনেকেই মনে কষ্ট পেয়ে থাকে, কিন্তু এ লজ্জার বিষয়টি কারো কাছে বলতে পারে না। এজন্য প্রসিদ্ধ হাকিমগণ এরূপ তদবীর করতে বলেছেন। যথা–

মাজুফল চূর্ণ তিন তোলা, কাফুর চার আনা ওজনের, এক তোলা মধুর সাথে মিশ্রিত করে নাভির নিম্নে গুপ্তাঙ্গে তিন দিন প্রলেপ দিবে, গুপ্তাঙ্গ সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। তদ্রুপভাবে বিরবুটি পিষে ঘিয়ের সাথে গরম করে তিন দিন পর্যন্ত সেক দিলেও গুপ্তাঙ্গ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে।

মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ প্রশস্ত করার হেকমত

স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ সঙ্কীর্ণ হলেও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে এক প্রকার যন্ত্রনা ভোগ করে। এজন্য প্রসিদ্ধ হাকীমগণ এরূপ হেকমত গ্রহণ করতে বলেছেন। যথা–

১। কন্দর মধুর সাথে মিলিয়ে নাভীর নিম্ন হতে গুপ্তাঙ্গ পর্যন্ত মালিশ করবে। এরূপ তিন দিন করলেই মনোস্কামনা পূর্ণ হবে।

২। নাগ কেশরী গাওয়া ঘিয়ে মিশ্রিত করে খাবে। দৈনিক সন্ধ্যায় গরম গরুর দুধ পান করবে। যথাসম্ভব সহবাস থেকে বিরত থাকবে এবং হিং আর সৈন্ধব লবণ সমান ওজন নিয়ে পানিতে গরম করবে। পরে সহ্য মত ঐ গরম তৈরি করা জল নিয়ে স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে সেক দিলে অবশ্যই তার গুপ্তাঙ্গ প্রশস্ত হবে।

স্তন যুগল ছোট ও কঠিন করার তদবীর

বর্তমানে অনেক যুবতী নারীর স্তনযুগল অতি অল্প বয়সে ঢিলা ও নতমুখী হয়, বক্ষস্থলে স্তনের মাথা গুঁজে পড়ে। এজন্য অনেক যুবক পুরুষ সে মেয়েকে পছন্দ করে না; কিন্তু স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে হলে নারীর উচিত; নিম্নোক্ত যে কোনো হেকমত গ্রহণ করে স্তনযুগলকে শক্ত ও সঙ্কীর্ণ করা।

১। যদি দুধ আর ঘি একত্রে মিশিয়ে গরম করে স্তনে প্রলেপ দেয়া যায়, কিংবা ডালিম আনারের খোলা চূর্ণ করে সরিষার তেলে পাক করে ঐ তেল গরম গরম মালিশ করার পরে গরম বস্ত্র দিয়ে কশে বেঁধে রাখতে পারে, তাহলে স্তনদ্বয় ছোট ও কঠিন হবে। তবে মাসাধিককাল এরূপ করবে-দু'এক দিনে কিছুই হবে না।

২। রুমি মস্তরী দুই তোলা, লবঙ্গ দুই তোলা খাঁটি মধুর সাথে চূর্ণ করে আগুনে গরম করে নামিয়ে রাখবে। এরূপ সপ্তাহকাল করলেই ছোট আকার ধারণ করবে।

৩। স্ত্রীলোকের প্রথম মাসিকের রক্ত যদি স্তনে মাখিয়ে দেয়া যায়, তাহলে স্তনযুগল কখনই নতমুখী হবে না।

মহিলাদের মাথার চুল ঘন, কালো ও দীর্ঘ করার উপায়

মহিলারা যতই স্বর্ণালংকার পরিধান করুক না কেন, যতই নামী দামী পোশাক পরিধান করুক না কেন, মাথার চুল কালো, চিকন ও দীর্ঘ না হলে তাকে একেবারেই অসুন্দর লাগে। সে সুন্দরী হলে কি হবে, মাথার চুল সুন্দর না হলে তাকে দেখতেও ভালো লাগে না। নারীর শোভা বর্ধনের বা সৌন্দর্যের মূল হচ্ছে মাথার চুল। অতএব, যে মহিলার মাথার চুল ঘন, কালো, চিকন ও দৈর্ঘ নহে, তাকে তার স্বামী তেমনটা মহব্বত করে না। এজন্য মহিলাদেরকে

মাথার চুলের যত্ন নিতে হবে। এর জন্য নিম্নোক্ত তদবীর গ্রহণ করা আবশ্যক। যথা–

প্রথমে তোখমা, ইসবগুল আর কুলের পাতা পানিতে গরম করে সে গরম পানিতে মাথা ধুবে। তারপর রৌগনে বানাফসা ও নিলফর চুলে লাগিয়ে দিবে এবং খুব মালিশ করবে। এরপর ঘন্টা দুই পরে ধৌত করবে। কয়েক দিন এরূপ করলে চুল চিকন ও দীর্ঘ হবে।

চুলের গোড়া শক্ত ও বৃদ্ধি করার উপায়

অনকে সুন্দরী, লাবণ্যবতী যুবতী রমনীর মাথার চুল উঠে গিয়ে রমণীকে কুশ্রী করে ফেলে, তজ্জন্য স্বামী স্ত্রীকে অপছন্দ করে। অতএব রমণীদের চুলের গোড়া শক্ত করার ও অল্পদিনের মধ্যে কেশ বৃদ্ধি করার তদবীর নিম্নরূপ–

প্রথমে রৌগনে আমলা চুলে ভালো করে মাখবে। অতঃপর কাবুলী হর্থরা বরাউন, তাজা মাজুফল, আকাকিয়া রৌগন চুলের গোড়ায় মালিশ করবে। এতে অল্প দিনের মধ্যে চুলের গোড়া শক্ত ও চুল বৃদ্ধি হবে। কেশ চিকন ও দীর্ঘ হলেই রমনীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

মহিলাদের গর্ভ

মহিলাদের গর্ভের পরিচয়

মহান রাব্বুল আলামীনের হাজারো মাখলুকাতের মধ্যে মানবজাতি অন্যতম। তাদের বংশের গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে নর-নারীর হৃদয়ে কামনা-বাসনার স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ মানব সৃষ্টির গতিধারা রক্ষা হয়ে থাকে কেবল নর-নারীর বিবাহের মাধ্যমে বৈধ যৌন মিলনের দ্বারা। তাদের এ বৈধ মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কুদরতে সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে যেসব উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে বৈধভাবে তারা যৌনমিলন করুক এটিও তার একটি উদ্দেশ্য।

অতএব, প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে, তার ডিম্বের সম্মেলনে গর্ভের সঞ্চার হয়ে থাকে। সুতরাং গর্ভ সঞ্চার, গর্ভের আলামত, গর্ভবতী নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, সন্তান পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিকতার সাথে নিম্নে উল্লেখ করা হবে। তবে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, ছেলের বয়স যখন ২০/২১

বছর এর কম আর মেয়ের বয়স ১৬/১৭ বছর হবে, এমন বয়সেই জনক-জননী হওয়া উচিৎ। এর কম বয়েস অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়সে জনক-জননী হওয়া অনুচিত। কেননা, এ বয়সে সন্তান নিলে বেশিরভাগ বেঁচে থাকে না। মৃত্যুর হার অধিক হয়ে থাকে।

গর্ভ সঞ্চার হয় যেভাবে

স্বামী-স্ত্রী সঙ্গমকালে মহান আল্লাহ্‌র কুদরতে স্বামীর শুক্রকিট স্ত্রীর জরায়ুস্থিত ডিম্বের সাথে মিলিত হয়ে গর্ভের সূচনা করে থাকে। ঐ জরায়ুর নিকটস্থ ডিম্ববাহী নলের ভিতরে শুক্রকীট ও ডিম্বের সংমিশ্রণে ভ্রুণাঙ্কুর স্বাভাবিক মধ্যে এসে তাকে। ঐ সময় ভ্রুণাঙ্কুরটিকে বাহির দিক দিয়ে একটি পাতলা পর্দা ঢেকে ফেলে। ঐ প্রকারের পর্দায় ঢাকা পড়ার পরে তার ভিতরে এক রকমের জলীয় পদার্থ তৈরি হয়। এই অবস্থায় ভ্রুণাঙ্কুরটি ঐ জলীয় পদার্থের ভিতরে ভাসমান থেকে ভ্রুণ বিকাশের দিকে আগাতে থাকে।

ভ্রুণের ক্রম বৃদ্ধি

পূর্বে বর্ণিত অবস্থায় ভ্রুণাঙ্কুরটি গর্ভাশয়ে অবস্থান করতে থাকে। পনের বিশ দিনের ভিতরে ভ্রুণের আকৃতি প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

প্রথম মাসে ঃ ভ্রুণের চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও মেরুদণ্ডের আকার অনুভব করা যায়।

দ্বিতীয় মাসে ঃ ভ্রুণ এক হতে দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। তখন ভ্রুণের চক্ষু, কর্ণ, নাক, ঠোঁট, আঙ্গুলী ইত্যাদি পুরোপুরি তৈরী হয়ে যায়।

তৃতীয় মাসে ঃ ভ্রুণ লম্বায় প্রায় তিন ইঞ্চির মত হয়ে থাকে। এই মাসে ভ্রুণের হাত, পা ও মাথা তৈরী হয়ে থাকে। ভ্রুণের ওজন তখন প্রায় তিন আউন্স হয়ে থাকে। এই মাসে জরায়ুতে গর্ভফুল তৈরী হয়ে থাকে এবং তা ভ্রুণের নাভীর সাথে যুক্ত থাকে।

চতুর্থ মাসে ঃ এই মাসে ভ্রুণ লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি হতে সাত ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সময় ভ্রুণের সমস্ত অঙ্গ তৈরী হয়ে একটি শিশুর রূপ ধারণ করে থাকে। এই মাসে ভ্রুণের হৃৎপিণ্ড তৈরী হয়ে তার ভিতরে আল্লাহ্‌র হুকুমে রূহ সৃষ্টি হয় এবং ফেরেশতা এসে তার ভাগ্যলিপি অর্থাৎ তকদীর লিখে দেন। এই

মাসে ভ্রুণের লিঙ্গও সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই মাসে ভ্রুণের ভিতরে সংমিশ্রণে হৃদস্পন্দন শুরু হয়ে থাকে এবং ভ্রুণটি নড়াচড়া করে থাকে।

এখানে একটু চিন্তার বিষয় এই যে, ভ্রুণটি মাতৃগর্ভে পর্দার অন্তরালে কি প্রকারে বেঁচে থাকে। সেটি হল, পুরুষের শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বের সংমিশ্রণের দ্বারা যখন ভ্রুণের সৃষ্টি হয়, তখন ভ্রুণের চতুর্দিকে একটি পর্দা সৃষ্টি হয়ে তাকে ঘিরে রাখে আর তার ভিতরে ভ্রুণের চতুর্দিকে এক প্রকার জলীয় পদার্থ তৈরী হয়। আর ঐ জলীয় পদার্থের ভিতরে ভ্রুণটি ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই জলীয় পদার্থই সন্তান প্রসবের পূর্বক্ষণে যোনীপথ দিয়ে বের হয়ে আসে। তাকেই পানি ভাঙ্গা বলা হয়। এই পদার্থকে অন্তর পর্দাও বলা হয়। আর একটি পর্দা তার বাহিরে থাকে। তার কাজ হল, ভ্রুণটিকে জরায়ুগাত্রে সংলগ্ন করে রাখা, যাতে ভ্রুণটি কোনো প্রকারে স্থানান্তরিত হতে না পারে।

পঞ্চম মাসে ঃ এই মাসে ভ্রুণটি নয় থেকে দশ ইঞ্চির মত লম্বা হয়ে থাকে এবং তার ওজন প্রায় এক পোয়ার মত হয়। উক্ত মাসের ভ্রুণের শরীরে পিঙ্গল বর্ণের লোম গজিয়ে থাকে এবং এক প্রকার পানির মত সাদা পিচ্ছিল পদার্থ ভ্রুণের দেহকে আবৃত করে রাখে। এই পিচ্ছিল পদার্থ সন্তান ভূমিষ্ট হতে সহায়তা করে থাকে। এই মাসেই ভ্রুণের ভিতরে চেতনা উদয় হয়ে থাকে এবং গর্ভবতী সন্তানের অঙ্গ পরিচালনা অনুভব করে থাকে।

ষষ্ঠ মাসে ঃ এই মাসে ভ্রুণের ওজন প্রায় এক সেরের মত হয় এবং লম্বায় প্রায় বার তের ইঞ্চি হয়ে থাকে। আর তার মাথায় চুল গজায় এবং চোখের পাতা ও ভ্রুর জন্ম হয়।

সপ্তম মাসে ঃ এই মাসে ভ্রুণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ মোটামুটিভাবে গঠিত হয়ে থাকে। এই মাসে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার মত উপযুক্ত হয়ে থাকে। কোনো কোনো গর্ভবতী এই মাসে সন্তান প্রবস করে থাকে এবং কোনো কোনো শিশু বেঁচে থাকে। তবে বেশীরভাগ শিশুই বাঁচে না। এই মাসে শিশু লম্বায় পনের ষোল ইঞ্চি হয়ে থাকে এবং ওজনে দেড় সের হতে দুই সের পর্যন্ত হয়।

অষ্টম মাসে ঃ এই মাসে ভ্রুণের ওজন প্রায় দুই সের হতে সোয়া দুই সের পর্যন্ত এবং লম্বার প্রায় সতের কি আঠার ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই মাসে ভ্রুণের দেহের লোমগুলো উঠে যেতে থাকে।

নবম মাসে ঃ এই মাসে ভ্রুণের ওজন প্রায়ই পূর্বাবস্থায় থাকে। তবে

লম্বায় সামান্য বেড়ে থাকে। এই মাসের বেশীরভাগ গর্ভবতী তার সন্তান প্রসব করে থাকে।

দশম মাসে ঃ এই মাসে গর্ভের সন্তানের গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তার ওজন সাধারণত তিন সের হতে সোয়া তিন সের পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং লম্বায় বিশ হতে একুশ ইঞ্চির মত হয়ে থাকে। দশ মাস বা দু'শত পচাত্তর দিন হতে দুই শত আশি দিন পূর্ণ হলে গর্ভবতীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় এবং সন্তান প্রসব করে থাকে। দশ মাসের পরে যদি গর্ববতী স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব না হয় তখন জরুরী ভিত্তিতে ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শত্রুর দ্বারা যাদু-টোনার কারণেও সন্তান প্রসব দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। তখন উপযুক্ত আলেমের শরাণাপন্ন হয়ে তদবীর গ্রহণ করবে।

ভ্রুণের নাড়ীর পরিচয়

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভ্রুণের গায়ে দু'টি পর্দা তার চতুর্দিকে ঢেকে রেখেছে। একটি অন্তর পর্দা আরেকটি হলো বাহির পর্দা। এই পর্দার উপরের কোনো এক স্থান হতে চিকন একটি রশির মত ভ্রুণের পেট পর্যন্ত নাভীর সাথে মিশেছে।

ভ্রুণটিকে দেখলে বোঝা যায় যে, তা যেন একটি রশি দ্বারা ঝুলানো অবস্থায় জলীয় পদার্থের ভিতরে চুবিয়ে রাখা হয়েছে। এই রশিটিকেই নাভী রজ্জু বা নাড়ী বলা হয়। গর্ববতীর সন্তান প্রসবের পরে এই নাড়ীটি শিশুর পেটে নাভীর সাথে মিলিত থাকে, তাকে কেটে ফেলতে হয়।

এই নাড়ীর সাহায্যেই গর্ভস্থ ভ্রুণের খাদ্য ও বায়ু সরবরাহ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরতে এই নাড়ীর ভিতর দিয়ে মাতৃজঠর হতে খাদ্যের সারাংশ ভ্রুণের পেটের ভিতরে এসে থাকে এবং তা দ্বারাই গর্ভের সন্তান বেঁচে থাকে।

গর্ভফুলের পরিচয়

মায়ের গর্ভের সন্তানের জন্য খাবার বায়ু সরবরাহ করা যেমন নাড়ীর প্রয়োজন, তদ্রুপ গর্ভফুলের প্রয়োজনও জরুরী। নাড়ীর উপরের অংশ এই গর্ভফুলের সাথে মিশে রয়েছে। এই নাড়ীর উপরের প্রান্ত গর্ভাশয়ের ভিতর দিকের প্রাচীর গাত্রে যে স্থানে গিয়ে মিশেছে ঐ স্থানেই আল্লাহ্‌র অসীম

কুদরতে গড়ে উঠেছে গর্ভফুল। এই গর্ভফুলের দিকটা জরায়ুর সাথে লেগে থাকে এবং অপর দিকটা ভ্রূণের দিকে ঠিক গর্ভফুলের উপর প্রান্তের সহিত মিশে থাকে। গর্ভবতীর দেহ হতে তার গর্ভস্থ সন্তানের দেহে এই গর্ভফুলের মাধ্যমে নাড়ীর ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল করে থাকে। আর গর্ভবতীর রক্তের ধারা বয়ে গর্ভস্থ সন্তানের খাদ্যের যোগান এসে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অপার মহিমা এখানে যে, একই রাস্তা দিয়ে মা ও শিশুর রক্ত এবং শিশুর রক্তের পরিত্যাগী পদার্থের মিলন হয়ে থাকলেও উভয়ের রক্তের ধারা কোনো সময় মিশে একত্রিত হয় না।

গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পরে সামনের মাসে যদি হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব না হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার পেটে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। এটাই গর্ভ সঞ্চার অনুভব করার প্রথম ও প্রধাণ লক্ষণ।

অবশ্য জরায়ুর কোনো রোগ-ব্যাধির কারণেও কিছু দিনের জন্য মাসিক বন্ধ থাকতে পারে। তবে অন্যান্য কতগুলো লক্ষণ আছে, যার দ্বারা গর্ভ সঞ্চার হয়েছে কিনা তা বুঝা যায়।

গর্ভ সঞ্চারের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, মেয়েদের শরীরে বমি বমি ভাব হওয়া। কিছু আহার করলেই বমির ভাব হওয়া। তবে এই বমি বমি ভাবও যে গর্ভ সঞ্চারের নিশ্চিত লক্ষণ এটা পুরাপুরি বুঝা যায় না। অন্য কোনো কারণেও বমির ভাব হতে পারে। আবার অনেক মেয়েলোকের বমির ভাব আদৌ হয় না।

গর্ভ সঞ্চারের তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে, স্তনদ্বয় স্ফীত হয়ে তার পরিসর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং একটু শির শির ভাব অনুভব করে থাকে। স্তনদ্বয়ের বোটার চতুর্দিকে পিঙ্গল বর্ণের গোলাকার দাগগুলো কাল রং ধারণ করে।

গর্ভ সঞ্চারের আরেকটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, গর্ভ সঞ্চারের চতুর্থ মাসের প্রথম দিকে স্তনদ্বয় টিপলে তার বোটা দিয়ে এক প্রকার সাদা রস বের হয়ে থাকে।

গর্ভের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, স্ত্রীলোকের ঘন ঘন পেশাবের বেগ হয়। এই অবস্থায় জরায়ু বড় হয়ে মুত্রাশয়ের উপর চাপ পড়ে থাকে, যার কারণে গর্ভবতীর ঘন ঘন পেশাবের বেগ হয়ে থাকে।

উপরোক্ত লক্ষণগুলো যদিও গর্ভসঞ্চারের নির্ভুল লক্ষণ তবুও সাত আট সপ্তাহের ভিতরে তা সঠিকভাবে বুঝা মস্কিল হয়ে পড়ে। তবে তিন মাসের ভিতরে গর্ভের সবগুলো লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। তখন গর্ভবতী মেয়েলোক নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারে না। সকলেই বাহির দৃষ্টি দ্বারা দেখে বুঝতে পারে। যেমন-গর্ভবতীর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, মুখের রুচি কমে যায়, পেট ভরে আহার করতে পারে না। তলপেট ক্রমান্বয়ে ভারী হয়ে উচু হতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, গর্ভস্থ সন্তানের ওজনের কারণে হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হয়। তখন গর্ভবতীকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই বিষয়ে গর্ভবতীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গর্ভবতী নারীর খাদ্য বিচার

১। গর্ভবতী নারী সবসময় গুরুপাক খাদ্য বর্জন করবে এবং বাসী, পঁচা ও গন্ধ খাবার খাবে না। শুধু লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য খাবে। গর্ভাবস্থায় নারীদের পক্ষে যে কোনো প্রকারের গোস্ত কম খাওয়া উচিত।

২। গর্ভাবস্থায় নারীদের ক্যালসিয়ামের অভাব বেশী হয়ে থাকে। অথচ তা খুবই প্রয়োজন। এজন্য গর্ভবতীকে নিজের ও পেটের বাচ্চার স্বাস্থ্য বজায় রাখতে ক্যালসিয়ামযুক্ত খাদ্য বেশী পরিমাণে খেতে হবে। যেমন- দুধ, কলা, মাছ, ঘি, মাখন, বিভিন্ন প্রকারের ফল ও শাকসবজি ইত্যাদি। এসবের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও আয়রণ রয়েছে।

গর্ভবতীর স্বাস্থ্য ও পরিধেয় বিচার

১। গর্ভবতীকে গর্ভাবস্থায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় ও পোষাক পরিধান করতে হবে। অপরিস্কার ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোষাক ব্যবহার করবে না। রীতিমত পরনের কাপড়, পেটিকোট, ব্লাউজ ইত্যাদি সাবান দিয়ে পরিস্কার করে ধুয়ে নিবে।

২। গর্ভবতীর ঘুমানোর ও বসার স্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। বিছানার তোষক, বালিশ ইত্যাদি নরম হতে হবে। সেখানে আলো বাতাসের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই সব বিষয়ের প্রতি গর্ভবতীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩। গর্ভবতী মেয়েলোক সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র

থাকতে চেষ্টা করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হবে। ধর্মীয় পুস্তকাদি ও কুরআন পাঠে মগ্ন হবে। এতে গর্ভের সন্তান নেককার ও সৎ স্বভাবের হবে।

৪। শাড়ী কাপড় অথবা সেলোয়ার কোমরের সাথে বেশী খিচিয়ে পরিধান করবে না। কোলের অন্য শিশু বাচ্চাকে পেটের উপর নিয়ে শয়ন করবে না।

৫। কোনো প্রকার ভারী বোঝা টানবে না বা কাজ করবে না। যেমন- ঢেকিতে চাল তৈরী করা, পানি ভর্তি কলসী কাখে নিয়ে আসা, কুপ হতে ভারী বালতি দ্বারা পানি তোলা ইত্যাদি। কিন্তু অলস হয়ে বসেও থাকবে না। তাতে শরীর ও স্বাস্থ্য খারাপ হয়। সময় সময় ছোট ছোট কাজ কর্ম করবে এবং আস্তে আস্তে আলো বাতাসে হাঁটা-চলা করবে। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

৬। যেখানে বেশী লোকজনের সমাগম সেখানে যাবে না। যেমন- বিবাহ বা অন্য কোনো ভোজের অনুষ্ঠান, সিনেমা দেখতে বা নাচ-গানের আসরে যাবে না।

৭। ভয় কিংবা আতঙ্কময় স্থানে বসবাস করবে না। দুরবর্তী কোনো স্থানে হেঁটে যাবে না। বেশি ঝাকি লাগে এমন কোনো যানবাহনে উঠবে না। পেশাব পায়খানার বেগ বেশি সময় আটকে রাখবে না। সময় হলেই বাথরুমে গিয়ে হাযত পুরা করবে।

৮। কবরস্থান ও শ্মশানের নিকটের রাস্তা দিয়ে কখনো যাতায়াত করবে না। কোনো প্রকার ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগীর কাছে যাবে না।

৯। গর্ভবতী মহিলা কখনো ঝগড়া বিবাদে জড়াবে না। কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষও রাখবে না। সর্বদা রাগ গোস্সা পরিহার করে চলবে। এই আচার-আচরণ গর্ভের সন্তানের ভিতরে প্রবর্তিত হতে পারে। অতএব তা বর্জনীয়।

১০। যে সকল দৃশ্য দেখলে অন্তরে ভয় হয় বা ঘৃণা বা বিরক্তির উদ্ভব হয়, তা দেখবে না বা তার নিকট কখনো যাবে না। কেননা, এটাও গর্ভের সন্তানের উপর প্রবর্তিত হতে পারে।

১১। গর্ভবতী মহিলা দিনের বেলা বেশী ঘুমাবে না। তাতে শরীরে অলসতা এসে থাকে এবং তা পেটের সন্তানের ভিতরেও দেখা দিতে পারে।

১২। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত স্বামী সহবাস করবে না। তাতে গর্ভপাত হবার সম্ভবনা থাকে এবং পেটের বাচ্চা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল, বিকলাঙ্গ ও লজ্জাহীন

হয়ে থাকে। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করবে না। তাতে পেটের সন্তান বোকা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

১৩। গর্ভবতী মহিলা বেশি ঝাল খাবার খাবে না। এতে পরবর্তীতে সন্তানের চর্মরোগ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তদ্রুপভাবে অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যও খাবে না। তাতেও সন্তান বোবা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

গর্ভাবস্থায় সহবাস

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে সে মুহূর্তে তার সাথে সহবাস না করাই উত্তম। আর যদি সুস্থ্য থাকে, তাহলে তার সাথে সহবাস করতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে এক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য যে ছুরতে সহবাস সুবিধাজনক মনে হবে সেভাবেই তার সাথে সহবাস করবে।

গর্ভবতী থাকাকালিন সময়ে অনেকের চেহারা স্বাস্থ্য ফেকাসে হয়ে যায়। চোহারার সৌন্দর্যতা নষ্ট হয়ে যায়। আর এতে অনেকে মনে করে যে, তার স্বামী তাকে পূর্বের ন্যায় আর আদর মহব্বত করে না। আসলে এসবই তার ভুল ধারণা। আবার অনেক মহিলা তখন ভবিষ্যত ভালো-মন্দ চিন্তা ভাবনা করে মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে থাকে। সে অবস্থায় স্বামী কর্তৃক কিছু সুখ দেয়ার জন্য তার সাথে সহবাস করাও প্রয়োজন। তবে স্ত্রীর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি মাত্রায় সহবাস করা আদৌ ঠিক হবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বামীর এমনটি করার কারণে বাচ্চার ক্ষতি হয়ে গেছে।

গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে সম্পর্কে ধারণা

গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে এ বিষয়টি জানার জন্য সকলেরই আগ্রহ জেগে থাকে। অনেকে ছেলে সন্তান লাভ করার জন্য অধির আগ্রহী থাকে। আবার কিছু লোক মেয়ের প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। আবার অনেকে ছেলে সন্তান কামনা ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাকে দান করেন মেয়ে সন্তান। এতে সে মনে মনে গোস্সা করে থাকে। যা তার জন্য খুবই বোকামীর কাজ। আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন যে, কাকে ছেলে দিলে ভালো হবে আর কাকে মেয়ে দিলে ভালো হবে। ছেলে মেয়ে যাই হোক না কেন এদের রিযকের দায়িত্ব আল্লাহ্র যিম্মায়।

সন্তানের রঙ দেখতে কেমন হবে এসব বিষয়ে বিজ্ঞানীদের অনেক মতভেদ রয়েছে। যাহোক নিম্নে এরূপ কিছু আলোচনা উল্লেখ করা হল। তবে একটি বিষয় সব সময় মনে রাখতে হবে যে, বৈজ্ঞানিকদের এসব আলোচনা কিন্তু শতভাগ সত্য নয়। বরং অনেক সময় তাদের কথা মিলে যায়, আবার অনেক সময় তাদের কথার সাথে কাজে মিল পাওয়া যায় না। আবার তাদের আলোচনাকে একেবারে ভ্রান্ত বলে ধারণা করাও ঠিক হবে না। আল্লাহ্‌র কুদরতের মহিমা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন সব যন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে, যা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ গর্ভাবস্থার শেষ দিকে বুঝা যায়। আমি এখন প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

(ক) যদি সহবাসের সময় স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর উত্তেজনা অধিক হয় এবং দৈহিক শক্তিও স্বামী অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে সে স্থলে কন্যা সন্তান হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে। এর উল্টোটা হলে ছেলে সন্তান হওয়ার সম্ভবনা অধিক থাকে।

(খ) অনেক লোক ধারণা করে থাকে যে, পুরুষের ডান দিকের শুক্রাশয় বা অণ্ডকোষ হতে বীর্যক্ষরণ হলে পুত্র সন্তান জন্ম হয়ে থাকে। আবার বাম দিকের শুক্রাশয় হতে বীর্যক্ষরণ হলে কন্যা সন্তান জন্ম হয়ে থাকে। তদ্রুপ স্ত্রীলোকের ডান দিকের ডিম্বকোষ হতে ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীটের সাথে সংমিশ্রিত হলে পুত্র সন্তান হয়ে থাকে। আবার বাম দিকের ডিম্বকোষ হতে ডিম্ব মিশ্রিত হলে কন্যা সন্তান জন্ম হয়ে থাকে।

(গ) কোনো কোনো যৌনবিদগণের ধারণা এই যে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং স্বামী শক্তিশালী হলে পুত্র সন্তান জন্ম হয়। আর স্ত্রীলোক সবল ও স্বামী দুর্বল হলে কন্যা সন্তান হয়ে থাকে।

(ঘ) কারো কারো বক্তব্য হলো, গর্ভ সঞ্চারের সময় পুরুষের বীর্য বেশী হলে পর পুত্র সন্তান লাভ হয়। আবার সহবাসের সময় স্বামীর শুক্রস্খলনের সময় যদি নাকের ডানদিকের ছিদ্র দ্বারা নিঃশ্বাস বহে, তবে পুত্র সন্তান লাভ করে। আর নাকের বাম ছিদ্র দিয়ে যদি নিঃশ্বাস বহে, তবে কন্যা সন্তান জন্ম হয়।

(ঙ) মহিলাদের ঋতুস্রাবের প্রথম দিন হতে যদি জোড় দিনে সহবাসের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে পুত্র সন্তান জন্মিবে। আর বেজোড় দিনে হলে

পর কন্যা সন্তান জন্মিয়ে থাকে।

(চ) কোনো যৌনবিদ মত পোষণ করে থাকেন যে, স্বামী ডান কাতে শুইয়ে সহবাস করলে ফল হয় পুত্র সন্তান, আর বাম কাতে শুয়ে সহবাস করলে কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে।

(ছ) কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মহিলাদের ঋতুস্রাব হতে পবিত্র হয়ে পবিত্রাবস্থার শেষের দিকে স্বামী সহবাস করলে ছেলে সন্তান জন্মায়। আর ঋতুস্রাব হতে পবিত্র হওয়ার প্রথম দিকে সহবাস করলে মেয়ে সন্তান জন্ম হয়ে থাকে।

(জ) কোনো কোনো যৌন বিজ্ঞানীর মতে, গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মহিলাদের হালকা লঘুপাক খাদ্য আহার করলে পুত্র সন্তান জন্ম হয়ে থাকে। যেমন- শাক-শব্জি ও ফল ফলাদি ইত্যাদি খাদ্য।

গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে চেনার উপায়

গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে তা চেনার অনেকগুলো উপায় রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো গর্ভবতী মহিলার দুধ উকুন অথবা চিচরীর (কীট বিশেষ) উপর ঢেলে দিবে। যদি ঐ উকুন অথবা কীট দুধের মাঝখান থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে তা মেয়ে সন্তানের গর্ভ। আর যদি উকুন অথবা কীট দুধ হতে বের হতে না পারে, তাহলে তা ছেলে সন্তানের গর্ভ।

অনেক অর্থ-সম্পদের অধিকারীরা আল্লাহ্র রহমতকে অস্বীকার করে। মূল্যায়ন না করে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করে দেখে যে, ছেলে কি না মেয়ে। যদি মেয়ে সন্তান হয়ে থাকে, তাহলে তা নষ্ট করে দেয়। কিছু নাফরমান, বেঈমান ডাক্তারও নিজের অর্থের লোভে গর্ভের বাচ্চা মেয়ে বলে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেয়, যাতে তার কিছু টাকা পয়সা উপার্জন হয়।

এক্ষেত্রে সকলকে স্মরণ রাখতে হবে যে, একশ বিশদিন অথবা তার থেকে বেশি দিনের বাচ্চা নষ্ট করার অর্থ কোনো জীবিত মানুষকে হত্যা করার গুনাহ্। হ্যাঁ যদি এ সময়ের কম বাচ্চার গর্ভপাত করার আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় বা গর্ভবতী হওয়ার পর জীবনের ভয় হয় বলে ধার্মিক অভিজ্ঞ ডাক্তারদের রিপোর্ট পাওয়া যায়, তাহলে আবশ্যক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মুফতী সাহেবদের পরামর্শে গর্ভপাত করা যাবে। গর্ভের বাচ্চার জ্ঞানতো শুধুই আল্লাহ্র আছে। মানুষ তার অনুমান করতে পারে মাত্র। বিশ্বাসযোগ্য বলে এতে কিছু নেই।

সূচীপত্র

প্রসবের পূর্বে জরায়ুর স্ফীতির পরিচয়

মহিলাদের গর্ভ সঞ্চারের পরে জরায়ু কোমল হতে শুরু করে। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে জরায়ুর মুখ আস্তে ধীরে বড় হতে থাকে। গর্ভের বয়স সাত মাসের সময় জরায়ুর মুখে আঙ্গুলী ঢুকানো যায়। এই প্রকারে গর্ভের সন্তানের আকার বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে ক্রমান্বয়ে জরায়ুর মুখ বড় হয়ে সন্তান প্রসবের পথ প্রশস্ত করে দেয়। গর্ভকালীন সময় জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থা হতে সাত আট গুণ বড় হয়ে থাকে এবং ওজনেও ঐ প্রকারে ভারী হয়ে থাকে।

প্রসব বিষয়ক আলোচনা

প্রসব বেদনার লক্ষণ ও সন্তান প্রসব

গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ট হবার পনের-বিশদিন পূর্ব হতে গর্ভবতীর জরায়ু নীচের দিকে কিছুটা নেমে আসে। ঐ সময় সন্তানের মাথা যোনী মুখের দিকে নেমে আসে। সেজন্য ঐ সময় প্রসুতী দেহে কিছুটা আরাম অনুভব করে থাকে। ধীরে ধীরে গর্ভবতীর জরায়ুর মুখ প্রশস্ত হতে থাকে এবং প্রসুতীর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট কম হয়ে থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ট হবার পাঁচ সাত দিন পূর্ব হতে গর্ভবতীর পেট কিছুটা শক্ত হচ্ছে অনুভব করে থাকে এবং মাঝে মাঝে কিছুটা ফুলে উঠে। এতে কোনো প্রকার যন্ত্রণা বা কষ্ট হয় না। কিন্তু এ সময় বুঝতে হবে যে, অতি শিঘ্রী প্রসব বেদনা আরম্ভ হবে।

এ সময় জরায়ু আপন ইচ্ছায় আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরতে সঙ্কুচিত হতে থাকে। অর্থাৎ ভ্রূণের গায় চাপ দিতে থাকে, যাতে সে জরায়ু হতে বের হয়ে যায়। এই সংকোচন ক্রিয়া প্রথমে আস্তে আস্তে শুরু হয়ে থাকে এবং তাতে যে ব্যাথা অনুভূত হয় তাকেই প্রসব-বেদনা বলা হয়ে থাকে। ক্রমান্বয়ে জরায়ুর সঙ্কোচন ক্রিয়া বাড়তে থাকে এবং প্রসব বেদনা তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। প্রসব বেদনা আরম্ভকাল হতে প্রসূতীর যোনীনালী হতে এক প্রকার তরল পদার্থ স্রাব হতে থাকে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসবের পূর্বে গর্ভের সন্তান নড়াচড়া করার কারণে প্রসূতীর বেদনা তীব্র আকার ধারণ করে থাকে। যার ফলে প্রসূতীর শরীর বিবর্ণ হয়ে যায়। এমনকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাতে চিন্তিত হবার বা ভয়ের

কোনো কারণ নেই। সাধারণ নিয়মে প্রসব বেদনা রাত্রিকালেই আরম্ভ হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে।

মূল প্রসব বেদনার লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রসূতীর কোমরের দুই পাশ হতে এক প্রকার কনকনে বেদনা শুরু হয়ে আস্তে আস্তে পুরা তলপেটে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময় থেকে বেদনা লোপ পেয়ে যায়। কিছু সময় বিরতি থেকে পুনঃ পুনঃ কোমরের দুই পাশ হতে বেদনা শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে বেদনার তীব্রতা বাড়তে থাকে। বেদনা বিরতির সময় প্রসূতী কিছুটা স্বস্তি বোধ করে থাকে। কিন্তু এটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। এভাবে বার বার বেদনা অনুভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত তা তীব্র আকার ধারণ করে ঘন ঘন বেদনা হতে থাকে। জরায়ু এই বার বার সংকোচনের কারণে বার বার বেদনা অনুভূত হয়ে থাকে। আর আস্তে আস্তে জরায়ুর মুখ সন্তান বের হবার জন্য বড় হতে থাকে। মহান আল্লাহ্ তাআলার কুদরতে জরায়ুর এই প্রকারের পুনঃ পুনঃ সঙ্কুচিত হবার কারণে আপনা আপনি ভ্রূণ জরায়ুর প্রশস্ত মুখ দিয়ে বের হয়ে যোনীনালীর ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে এগিয়ে আসে এবং এভাবে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে থাকে।

গর্ভবতীর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময় প্রসব বেদনা ডাক্তারী মতে বিশ হতে চব্বিশ ঘন্টা স্থায়ী হয়ে থাকে। আবার যাদের কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে, তাদের প্রসব বেদনা আট হতে দশ ঘন্টা বা তার চেয়েও কম সময় স্থায়ী হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীতও দেখা যায়। কখনো দুই হতে তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিছু সময় পর্যন্ত প্রসব বেদনা হবার পরে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় সন্তান ভূমিষ্ট হবার অল্প সময় পূর্বে জরায়ুর ভিতরে যে থলিতে সন্তান থাকে সেই থলিটা ফেটে যায় এবং থলির ভিতরের তরল পদার্থ যোনীনালী দিয়ে গড়িয়ে বাহিরে আসে। আমাদের দেশে প্রচলিত ভাষায় তাকে পানি ভাঙ্গা বা পানি মুচি ভাঙ্গা বলা হয়। পানি মুচি ভাঙ্গার কারণে গর্ভস্থ সন্তানের মাথা ও গলা জরায়ু হতে যোনীপথে এসে থাকে। এর পরে সন্তানের কাধ দুটি জরায়ুর মুখ দিয়ে যোনী পথে এসে থাকে। শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে সন্তানের বাকী অংশ যোনী পথ দিয়ে বাহির হয়ে পড়ে। সন্তান ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতী এক ধরণের অমিয় প্রশান্তি অনুভব করে থাকে।

সন্তান প্রসবকালে ধাত্রীর কর্তব্য

গর্ভবতীর প্রসব বেদনা শুরু হবার প্রথম দিকেই তাকে আতুড় ঘরে বা প্রসব ঘরে না রেখে বরং খোলা আলো বাতাসে খুব আস্তে ধীরে পায়চারী

করানো ভালো। যখন প্রসব বেদনা তীব্রভাবে অনুভূত হবে তখন তাকে প্রসব গৃহে নরম বিছানার উপরে রাখবে। যে সময় প্রসব বেদনা অত্যাধিক মাত্রায় তীব্রভাবে দেখা দিবে, তখন প্রসূতীকে প্রসব করানোর জন্য প্রস্তুত করবে। সন্তান প্রসবকালে উপযুক্ত অভিজ্ঞ একজন ধাত্রীর ব্যবস্থা করবে এবং তার সাহায্যকারী হিসেবে দুই একজন মহিলা কাছে রাখবে। ধাত্রী ও সাহায্যকারীদের শরীরের পোষাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং তাদের হাতগুলো পরিস্কার রাখতে হবে। হাতে কোনো প্রকার অলঙ্কার থাকলে তা খুলে নিবে এবং বড় নখ থাকলে কেটে ফেলবে। ধাত্রীর অভিজ্ঞতানুসারে প্রয়োজন বোধ করলে প্রসূতী পেটের উপরিভাগ কাপড় দ্বারা বেঁধে নিবে, যাতে পেটের সন্তান উল্টিয়ে না যেতে পারে। বাঁধনটা মধ্যমভাবে দিবে, বেশি টাইট না হয় এবং একেবারে ঢিলাও না হয়।

প্রসূতীর পানি মুচি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু হতে সন্তানের মাথা যোনী পথ দিয়ে বাহির হয়ে আসবে। তখন ধাত্রী তার দুই আঙ্গুলী প্রসূতীর যোনী পথে ঢুকিয়ে দেখবে যে, সন্তানের গলায় কোনো প্রকার নাড়ী পেচিয়ে আছে কি না, যদি থাকে তবে তা গলা হতে ছাড়িয়ে দিবে। এ সময় ধাত্রীকে খুব সাবধান হতে হবে। অকারণে বার বার যোনী পথে হাত ঢুকাবে না এবং প্রসব করাবার জন্য তাড়াহুড়া করবে না বা সন্তানের মাথা ধরে জোরে টানাটানি করবে না। এতে হিতে বেহিত হতে পারে। অনেক সময় জোরে টানাটানি করলে যোনী পথ ফেটে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। যখন মাথা বাহির হয়ে আসবে তখন সন্তানের মাথা ধরে সামান্য টানের উপরে রাখবে এবং প্রসূতীর তলপেটের উপর দিক হতে নীচের দিক সামান্য চাপ দিবে। সন্তানের মাথা যখন সম্পূর্ণ বাহির হয়ে আসবে তখন প্রসূতীর মলদ্বারের নীচে সামান্য চাপ দিয়ে সহজভাবে কৌশলের সাথে সন্তান ভূমিষ্ট করাবে। এই প্রকারে আল্লাহ্ তাআলার অসীম রহমতে ও উপযুক্ত ধাত্রীর চেষ্টায় প্রাকৃতিক নিয়মে অতি অল্প সময়ের ভিতরে প্রসবকার্য সুশৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রসবের পরে প্রসূতীকে কমপক্ষে দশ পনের মিনিট সময় পর্যন্ত নড়াচড়া করতে দিবে না এবং চিৎভাবে শুইয়ে রাখবে। এ সময় ফুল পড়া ও শিশুর নাড়ী কাটার কার্য সম্পন্ন করবে। ফুলপড়া ও নারী কাটা সম্পর্কে সম্মুখে আলোচনা আসছে।

প্রসবের পরে ফুল পড়া

সন্তান প্রসবের পরপরই ফুল পড়ে থাকে। এই ফুল শিশু ভূমিষ্ট হবার পর

জরায়ুর গাত্র হতে খসে বাহির হয়ে থাকে। ফুল বাহির হবার পরে দেখা যায় যে, তার ওজন হতে শিশুর ওজন প্রায় ৭/৮ গুণ বেশী। কিন্তু গর্ভসঞ্চারের সময় ভ্রূণের চেয়ে ফুল অনেক বড় হয়ে থাকে। গর্ভ সঞ্চারের দুই মাস পরে এই ফুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠে। সুতরাং গর্ভের চতুর্থ মাসে ফুল এবং ভ্রূণের ওজন প্রায় সমান হয়ে থাকে। এর পরে ফুল আর বড় হয় না বরং ভ্রূণ দিন দিন বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভ্রূণের ওজন ফুল অপেক্ষা ৭/৮গুণ বেশী হয়ে থাকে।

সন্তান জন্ম হবার পর জরায়ু পুনঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই অবস্থায় প্রসূতীর জরায়ুর ভিতরের ফুলে সংযোগকারী নাড়ীভূড়ী যোনী পথ দিয়ে বাহির হয়ে আসে। যে পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফুলটি বাহির হয়ে না আসে সে পর্যন্ত প্রসূতীকে চিত্‌ভাবে শুইয়ে রাখতে হয়। প্রসবকালীন বেদনার মত ফুল পড়ার সময় প্রসূতী একবার বেদনা অনুভব করে থাকে। সাধারণত সন্তান প্রসবের বিশ মিনিট হতে এক ঘন্টার ভিতরে জরায়ুস্থিত ফুল নাড়ীভুড়ী বাহির হয়ে থাকে।

নাড়ী কাটার নিয়ম

সদ্য ভূমিষ্ট সন্তান জন্মের পর কিছু সময় মায়ের উদরের ফুলের সাথে নাভিতে যুক্ত নাড়ীর সাহায্যে সংযুক্ত থেকে একটি স্পন্দন হয়ে থাকে। ঐ স্পন্দন যতক্ষণ থাকে এবং ভূমিষ্ট সন্তান যে পর্যন্ত না কাঁদে বা শ্বাস প্রশ্বাস শুরু না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়ী কাঁটা উচিৎ হবে না। যেহেতু ঐ নাড়ীর সাহায্যেই মা ও শিশুর ভিতরে রক্ত আদান প্রদান হয়ে থাকে। আর সদ্য ভুমিষ্ঠ সন্তানের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের পূর্বে বেঁচে থাকার জন্য মায়ের দেহের রক্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। এখানে একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সন্তান জন্ম হবার পরে অনেক সময় পর্যন্ত যদি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ না করে বা না কাঁদে তবে ঐ সময় নাড়ী কাটা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

যে সকল সন্তান স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ট হয়ে থাকে, তাদের নাড়ীর স্পন্দন ভূমিষ্ট হবার পাঁচ সাত মিনিটের ভিতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর হুকুমে কেঁদে উঠে ও শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু করে থাকে। অতএব সদ্য ভূমিষ্ট শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু করার পরে নাড়ী কাটার ব্যবস্থা করবে।

সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরক্ষণে সন্তানের মুখস্থিত লাল সতর্কতার সাথে বাহির করে ফেলবে। এরপর সন্তানের দেহগাত্রে যে পিচ্ছিল জাতীয় রসরক্ত

লেগে থাকে তা পরিস্কার করবে। তারপর ধাত্রীর হাত ও চিকন শক্ত সুতা জীবানু নাশক ঔষধ মিশানো পানিতে ধুয়ে সন্তানের নাভী হতে দুই তিন আঙ্গুল উপরে নাড়ীতে একটি বাঁধন দিবে এবং তার দুই আঙ্গুল উপরে আরেকটি বাধন দিবে। তারপর ধারালো কাচি বা ব্লেড জীবাণু নাশক ঔষধ মিশানো পানিতে ধুয়ে নাড়ীর উভয় বাঁধনের মাঝখানটা কেটে ফেলবে। এই প্রকারের নাড়ী কাটার পরেই ফুল হতে শিশু পৃথক হয়ে যাবে।

সন্তানের নাড়ী কাটার পরে বরিক তুলা অথবা পরিষ্কার তুলা দ্বারা নাভী সংলগ্ন নাড়ীটুকু বেঁধে দিবে। তারপর শিশুকে সাবান গোলা ঈষৎ গরম পানি দ্বারা পরিষ্কার করে ধুয়ে পাতলা নরম কাপড় দ্বারা মুছে শিশুর শরীর আবৃত করে শুইয়ে দিবে। লক্ষ রাখতে হবে, যাতে শিশুর শরীরে কোনো প্রকার ঠাণ্ডা লাগতে না পারে। ঠাণ্ডা লাগলে শিশুর সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

প্রসবান্তে শিশু না কাঁদলে বা শ্বাস-প্রশ্বাস না নিলে যা করতে হবে

প্রসবের সময় সন্তানের মাথায় জোরে চাঁপ লাগার কারণে অনেক সময় সদ্য ভূমিষ্ট শিশু কাঁদে না বা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে না। অথবা মায়ের উদরে থাকাবস্থায় শিশুর মুখে ও নাকের ভেতরে ময়লা ও নানা ধরণের রস রক্ত ঢুকে থাকার কারণেও উক্তাবস্থা হতে পারে। যদি ময়লা ও রস রক্তের কারণে শিশু না কাঁদে বা শ্বাস গ্রহণ না করে, তবে তখন আঙ্গুলে পরিস্কার নরম কাপড়ের টুকরা জড়িয়ে নাক ও মুখের রসরক্ত বের করে ফলতে হবে। এরপর সন্তানের পাছার উপরে ডান হাত দ্বারা আস্তে দুই তিনটি থাপ্পড় দিবে। যদি এতে না কাঁদে বা শ্বাস গ্রহণ না করে, তখন অল্প গরম পানির ভিতরে শিশুর গলা পর্যন্ত কিছু সময় ডুবিয়ে রাখবে এবং পুনঃ শিশুর পা দুইটা ধরে মাথা নিচের দিকে রেখে ঝুলিয়ে রাখবে। এ সকল নিয়মে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সন্তানের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসে থাকে।

আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, শিশুকে গরম কাপড় দ্বারা জড়িয়ে কোলের উপরে চিৎভাবে রেখে তার উভয় হাতের কব্জি ধরে কানের পাশ দিয়ে মাথার উপরে তুলবে এবং ঐ প্রকারে হাত দুইটি নামিয়ে এনে উভয় পাঁজরের সাথে লাগিয়ে সামনে একটু চাপ দিবে। এই প্রকারে খুব দ্রুত হাত উঠা নামা করতে থাকবে এবং অন্য একজন সামান্য গরম পানি দিয়ে সন্তানের নাক, মুখ ভিজিয়ে দিবে। আল্লাহ্‌র রহমতে এতে ভালো ফল লাভ হবে।

যা হোক, ধারাবাহিকভাবে এই নিয়মগুলো পালন করলে আল্লাহ্ তাআলার রহমতে সুফল পাওয়া যাবে। যদি কোনো ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া না যায়, তবে দেরী না করে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবে।

আতুর ঘর কেমন হওয়া দরকার

বাড়ি বা ঘরের মধ্যে যে কামরাটা সবচেয়ে ভালো ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, শুকনা ও আলো বাতাস ঢুকতে পারে সেই ঘরটাকে আতুর ঘর হিসেবে নির্বাচিত করবে। যে ঘর অন্ধকারযুক্ত, অপরিস্কার, আলো বাতাসহীন ও নিকৃষ্ট, এমন ঘর বা কামরাকে আতুর ঘর হিসেবে নির্বাচন করবে না। গ্রাম দেশে অবশ্য এই ধরণের ঘরকে আতুর ঘর হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এটা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল ধারণা। এতে অনেক সময় বিপরীত ফল হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলেও অনেক ক্ষেত্রে নোংরা কামড়া বা সিড়ির তলা প্রসবের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এটা অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও নিবুদ্ধিতার পরিচয়। এতে অনেক সময় শিশুর অকাল মৃত্যু হবার সম্ভবনা থাকে এবং প্রসূতি নানা প্রকার দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আতুর ঘর খুব যত্নের সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে খাটের উপরে তোষকের ব্যবস্থা করে খুব নরম বিছানায় প্রসূতি ও সন্তানের থাকার জন্য ব্যবস্থা করবে। ঐ ঘরে যাতে পরিমাণমত আলো বাতাস ঢুকতে পারে তার সুব্যবস্থা করবে। আলো-বাতাসযুক্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখে এবং মন মস্তিষ্ক উৎফুল্ল থাকে।

সদ্যজাত সন্তান ও প্রসূতির থাকার বিছানা চৌকি বা খাটের উপরেই করতে হবে। এর অভাবে ঘরের মেঝেতে রাখতে হলে বিছানাটা খুব পুরু করতে হবে, যাতে শিশু সন্তান ও প্রসূতির শরীরে কোনো প্রকার ঠাণ্ড না লাগে।

যদি এ সময় সন্তান ও প্রসূতির ঠাণ্ডা লাগে তবে সমূহ বিপদের আশংকা থাকে। আতুর ঘরে প্রসূতির একান্ত দরকারী জিনিসপত্র ছাড়া অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখবে না। থাকলে তা সরিয়ে ফেলবে। প্রসূতির প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ও দ্রব্যাদি সুন্দরভাবে ঘরের ভিতরে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখবে। কোনো কোনো এলাকার গ্রাম দেশে আতুর ঘরে শিশু ও প্রসূতিকে গরম রাখার জন্য আগুন জ্বালিয়ে থাকে। ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করে রাখে। আবার কয়লার

আগুনও জ্বালিয়ে রাখে। এ ধরণের কাজের দ্বারা ঘরের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে থাকে। এ প্রকার নানা জাতীয় কার্য নির্বুদ্ধিতার জন্য ঘটে থাকে এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা ও দুরারোগ্য ব্যাধি হয়ে থাকে।

অতএব, উপরে উল্লেখিত কু-কার্যসমূহ পরিহার করে চলতে হবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আতুর ঘর যেন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয় ও আলো-বাতাস ঢুকতে পারে এবং তা শুকনা ও ময়লামুক্ত হতে হবে।

আপনি ছেলে সন্তান কামনা করেন নাকি মেয়ে সন্তান

ছেলে বা মেয়ে সন্তান জন্মানোর কোনো শক্তিই মানুষের নেই। বরং মানুষ ও সমস্ত মাখলুকাত কেবল আল্লাহ্ তাআলার তত্ত্বাবধানে। এসবের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন- আমি যাকে ইচ্ছা ছেলে সন্তান দান করি, যাকে ইচ্ছা মেয়ে সন্তান দান করি আবার যাকে ইচ্ছা কোনো সন্তানই দান করি না বরং বন্ধা বানিয়ে রাখি।

বর্বরতার যুগে কতক লোক কন্যা সন্তান জন্মানোতে স্ত্রীর প্রতি নারাজি প্রকাশ করত। এমনকি তারা অনেক সময় কন্যা সন্তানকে জীবিত অবস্থায় মাটির নিচে দাফন করে দিত। পক্ষান্তরে ছেলে জন্মগ্রহণ করলে সে নিজেও খুশি হতো এবং তার স্ত্রীর প্রতিও সন্তুষ্টি প্রকাশ করত। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হত যে, ছেলে-মেয়ে জন্ম দেয়ার একমাত্র শক্তি মনে হয় তাদের স্ত্রীদের হাতেই। সেজন্য যদি কোনো স্ত্রী, কন্যা সন্তান জন্ম দিত তখন স্বামীসহ পরিবারের সকলে তার প্রতি রাগ-গোস্সা করত।

মানুষের এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে ভুল বরং ছেলে সন্তান আল্লাহ্র নিয়ামত। আর মেয়ে সন্তানও আল্লাহ্র রহমত। আর যেখানে আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, সেখানে অবশ্যই তার নিয়ামতও রয়েছে। সবই আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহ। তারপরও কিছু লোক এমন আছে, যাদের মনে একমাত্র কামনা আল্লাহ্ আমাকে ছেলে সন্তান দান করুক। কিন্তু তার চাওয়া আর পূর্ণ হয় না। বরং আল্লাহ্ তাআলা তাকে মেয়ে সন্তান দান করেন। আবার কিছু লোক এমন আছে যারা কেবল মেয়ে সন্তান পেতেই আগ্রহী। অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাকে ছেলে সন্তান দান করেন। আসলে যা কিছু হচ্ছে ও হবে সব আল্লাহ্র হুকুমেই হচ্ছে। এজন্য আল্লাহ্র কাছে দুআ করা যেন আল্লাহ্ তাআলা তার কামনা বাসনা পুরণ করেন। যে সন্তান তারা কামনা আল্লাহ্ যেন তাকে সে সন্তান দান

করেন। এর সাথে সাথে অছিলা হিসাবে ছেলে-মেয়ে পেতে কিছু পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

ছেলে জন্মের গোপন রহস্য

যেসব মেয়েদের কেবল কন্যা সন্তান জন্ম নিচ্ছে, তারা যদি পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা করে তাহালে তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট দুআ করার সাথে সাথে নিম্নোক্ত পদ্ধতিও অবলম্বন করতে হবে। যথা–

১। স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে স্বামী অথবা অন্য কোনো মহিলা দৈনিক এ গর্ভবতী মহিলার পেটে হাতের আঙ্গুলকে রেখে গোলাকার করবে এবং বৃত্তাকার করবে। বৃত্তাকারের সময় আল্লাহ্ নিরানব্বইটি নামের মধ্যে يَا مُصَوِّرُ "ইয়া মুছাওওয়িরু" নামটি চল্লিশবার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ্ তাকে আল্লাহ্ তাআলা পুত্র সন্তান দান করবেন।

২। উল্লেখিত নিয়মে আল্লাহ্ নিরানব্বইটি নামের মধ্যে يَا مُصَوِّرُ "ইয়া মুছাওওয়িরু" নামের পরিবর্তে يَا مَتِيْنُ "ইয়া মাতীনু" পড়বে।

মুহাম্মদ ও আল্লাহ্ নামের বরকত

মহিলারা যখন গর্ভবতী হবে তখন থেকেই গর্ভস্থ সন্তানের নাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখবে। কতিপয় আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গরা বলেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে মিলিয়ে রাখলে, আল্লাহ্র পবিত্র নামের বরকতে তার পুত্র সন্তান জন্ম নিবে।

পুত্র সন্তান জন্মের পদ্ধতি বিশেষ

স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে সে দিনই সহবাস করে। তাহলে তার এ সহবাস দ্বারা ছেলে সন্তান জন্ম নিবে। ঋতুস্রাব বন্ধের বার দিন পরে সহবাস করলেও সে সহবাসে ছেলে সন্তান জন্ম নিবে।

পুত্র সন্তান জন্মের জন্য বিশেষ খাবার গ্রহণ

আল্লামা ইমাম যাহাবী রহ. অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, গর্ভবতী মহিলা গর্ভসঞ্চয়ের শুরু থেকেই কয়েক মাস খেজুর খেলে তার ছেলে সন্তান হবে।

ছেলে সন্তান জন্মের গোপন রহস্য

স্বামী-স্ত্রী যদি অধিক হাসি-খুশি, আনন্দ, আরামপ্রিয় জীবন কাটায়। তাহলে তাদের কন্যা সন্তান হবে। আর যদি দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে জীবন কাটায়, তাহলে তাদের ছেলে সন্তান হবে।

ছেলে সন্তান জন্মের নতুন পদ্ধতি

সকল পুরুষের দু'টি করে অণ্ডকোষ থাকে। ঐ অণ্ডকোষদ্বয়ের ডান পাশের বীচিতে ছেলে সন্তান জন্ম দেয়ার বীর্য থাকে। আর বাম পাশের বীচিতে মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার বীর্য থাকে। সুতরাং ছেলে সন্তান কামনাকারীকে স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় তার ডান পাশের বীচিকে উপরে তুলে রাখতে হবে। যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন, ডান পাশের বীচিকে উপরে তুলে রাখতে হবে। তদ্রুপভাবে মেয়ে সন্তান কামনাকারী ব্যক্তি সহবাসের সময় বাম পাশের বীচিকে উপরে তুলে রাখতে হবে। যৌনবিষয়ক গবেষকরা ছেলে-মেয়ে সন্তান জন্মের এ কৌশলকে বেশ উপকারী বলে ব্যাক্ত করেছেন। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, প্রথমে তারা এ বিষয়টি বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য প্রথমে একটি ছাগলের বাম পাশের বীচিকে কেটে বকরীদের মাঝে ছেড়ে দেয়। এতে ঐ ছাগল যতগুলো বকরীর সাথে মিলন ঘটিয়েছে, সবগুলো থেকে পুরুষ ছাগল জন্ম হয়েছে। তদ্রুপভাবে ছাগলের ডান পার্শের বীচিকে কেটে বকরীদের মাঝে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ছাগল যতগুলো বকরীর সাথে মিলন ঘটিয়েছে, সবগুলো থেকে বকরীই জন্ম নিয়েছে।

এক পর্যায়ে তারা তাদের এ অভিজ্ঞতা আরো মজবুত করার জন্য উপরের পদ্ধতিটি কুকুর ও বানরের উপর করা হয়, সে ক্ষেত্রেও ফলাফল একই প্রকাশ পেয়েছে। তাদের ধারণামতে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে যে, পুরুষের ডান বীচিতে ছেলে সন্তান জন্মের বীর্য বিদ্যমান। আর বাম পাশের বীচিতে মেয়ে সন্তান জন্মের বীর্য বিদ্যমান রয়েছে।

স্মরণীয় কথা

উপরোক্ত ছেলে বা মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার যেসব আলোচনা করা হল তার সবই ছিল অভিজ্ঞতার আলোচনা। মূলত স্বামী স্ত্রীর সহবাস দ্বারা কোন সন্তান জন্ম নিবে সে বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। তিনি ছাড়া দুনিয়ার

আর কেউ জানে না। ছেলে বা মেয়ে সন্তান নেওয়ার জন্য দুনিয়ার মানুষ যত চেষ্টা ও তদবীর করে থাকে, সবই ওছিলা মাত্র। ছেলে বা মেয়ে সন্তান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আরবীতে একটি প্রবাদবাক্য রয়েছে-

اَلسَّعْىُ مِنَّا وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللّٰهِ "বান্দার পক্ষ থেকে চেষ্টা তদবীর করে যাওয়া। আর চেষ্টা তদবীরের প্রতিফল দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা"।

আপনার কাঙ্খিত সন্তান

সুন্দর সন্তান জন্ম নেয়ার পদ্ধতি

দুনিয়ার সকলেই চায় যে, তার সন্তানটি খুব সুন্দর ও সুশ্রী হক। এ বিষয়ে বিজ্ঞগণ বলেন, যদি কেউ তার সন্তান সুন্দর ও সুশ্রী হওয়ার কামনা করে, তাহলে স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় সুন্দর ও সুশ্রী চেহারা বিশিষ্ট সন্তানের ছবি সহবাসের স্থানে রাখবে, যেন সে মুহূর্তে স্ত্রীর দৃষ্টি সে সুন্দর আকৃতির ছেলের ফটোর দিকে পরে। আর সহবাসকালে তা দেখলে অবশ্যই তার সন্তান সুশ্রী ও সুন্দর হবে।

[এ ক্ষেত্রে একটি মাসআলা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো মহিলার জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম এমন কোনো পুরুষ বা তাদের ছবি দেখা জায়েয নেই। সুতরাং বিশেষ মুহূর্তে যদি কোনো ফটো রাখতে চায়, তাহলে অপ্রাপ্ত বয়সের বালকদের ফটো রাখতে হবে। অন্যথায় উভয়ে গোনাহগার হবে।

–অনুবাদক]

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

জনৈক মহিলা এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল, আমাদের সন্তান কালো হয় কেন? সে লোকটি জবাবে বলল সহবাসের সময় স্বামী তার স্ত্রীর দিকে রাগতস্বরে তাকায় এবং স্ত্রীর স্বামীর দিকে রাগান্বিত হয়ে দৃষ্টিপাত করে। আর যে জীবন জ্বলন্ত অবস্থায় সৃষ্টি হয়, তা কালোই হওয়া স্বাভাবিক।

বাচ্চা সুন্দর ও সুশ্রী হওয়ার পদ্ধতি

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে থাকেন, কোনো মহিলা যদি গর্ভবতী থাকাকালীন

সময়ে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট থেকে দুরে থাকে, তাহলে তার থেকে যে সন্তান জন্ম নিবে, তা সুন্দর ও সুশ্রী হবে।

সুন্দর ও সুশ্রী সন্তান নেয়ার খাবার

১। গর্ভবর্তী মহিলা গর্ভকালীন সময়ে খরবুজাহ জাতীয় ফল বেশি পরিমাণে ভক্ষণ করলে সন্তান সুন্দর ও সুশ্রী হবে। কিন্তু ডাক্তারদের অভিমত হল, গর্ভাবস্থায় টক কমলা, চেরী ফল বেশি খেলে বাচ্চা সুন্দর ও সুশ্রী হবে।

২। গর্ভবতীকালীন সময়ে সাদা পোশাক পরিধান করলে এবং সাদা খাবার বেশি পরিমাণে খেলে, সন্তান সুন্দর ও সুশ্রী হবে।

৩। কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত হলো, গর্ভবতী নারী সকাল-সন্ধ্যা দুধের সাথে জাফরান মিশিয়ে পান করলে হাসিখুশি ও আনন্দফুর্তিবাজ সন্তান জন্ম নেয়।

৪। যদি কোনো গর্ভবর্তী মহিলা গর্ভাশয় অবস্থায় গোলাপের পাপড়ি ভক্ষণ করতে থাকে, তাহলে সন্তান সুশ্রী জন্ম নেয় এবং প্রসব ব্যাথা হ্রাস পায়।

সুন্দর সন্তান জন্ম নেয়ার বরকতময় পদ্ধতি

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার সময় দস্তরখানার পতিত খাবার তুলে পরিস্কার করে খাবে, তার সন্তান সর্বদা ধোঁকা-প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকবে। বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত থাকবে, সুন্দর-সুশ্রী সন্তান জন্ম নেবে।

সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ

১। সাময়িকভাবে গর্ভবতী হওয়া থেকে বিরত থাকতে নিম্নোক্ত ঔষধ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাযুবারিক পিশিয়ে তুলার সাথে পেঁচিয়ে সহবাসের পূর্বে তা জরায়ুর মধ্যে রাখবে। এতে গর্ভবর্তী হওয়ার সম্ভবনা থাকবে না। আর যদি রেড়ির বীচি একবার ভক্ষণ করে, তাহলে এক বৎসর পর্যন্ত গর্ভবতী হওয়ার সম্ভবনা নেই। তদ্রুপভাবে দু'টি বীচি ভক্ষণ করলে দুবছরের মধ্যে গর্ভধারণের সম্ভবনা নেই। মোটকথা যে কয়টি রেড়ির বীচি খাবে, তত বৎসর বাচ্চা হবে না। আর যদি

স্বামী তা ছোবা করে কালিজিরার সাথে মিশিয়ে তৈল তৈরি করে যৌনাঙ্গে লাগিয়ে সহবাস করে, তাহলেও স্ত্রী গর্ভবতী হবে না।

২। ভিজানো চুনের উপরের কিছু পানি তিলের তৈলের সাথে সমান সমানভাবে মিশিয়ে বোতলের মধ্যে রেখে দৈনিক তা ঝাঁকাবে। একসময় যখন মাখনের মতো রূপ ধারণ করবে, তখন সহবাসের সময় যৌনাঙ্গে মালিশ করে সহবাস করবে। এ কাজটি যতদিন চলবে, স্ত্রীও ততদিন গর্ভবতী হবে না।

স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ

নিম্নোক্ত দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মহিলারা আর কখনো গর্ভবতী হবে না। যথা–

১। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, যদি কোনো নারী তার ঋতুস্রাবের প্রথম রক্ত সারা শরীরে মালিশ করে, তাহলে সে নারী সারা জীবন গর্ভবতী হবে না। আর এ পদ্ধতি কেবল বেশ্যা নারীরাই গ্রহণ করে থাকে।

২। নিম্নোক্ত উপাদানগুলো পিষে সাত ভাগ করবে। অতঃপর ঋতুস্রাবের সময় দৈনিক এক ভাগ করে সাত দিন খাবে।

উপাদান	পরিমাণ
কালোজিরা	১ তোলা
যত্রিক	১ তোলা
নার্গিস ফুল	১ তোলা
নরকচুর (হলুদ জাতীয় ঔষধী গাছ	১ তোলা
কাউফল	১ তোলা

৩।

উপাদান	পরিমাণ
গোল মরিচ	পরিমাণ মত
বাইবড়ং (ঔষধী গাছ)	সমপরিমাণ

গোলমরিচ, বাইবড়ং এ দু'টি উপাদানকে একত্র করে পিষে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে দুধের সাথে মিশিয়ে পান করবে।

কালোজিরা, ইমারতের ভিতে দাবান শক্ত গাছ বিশেষের বীচি প্রত্যেকটি এক এক তোলা করে কাটিয়ে পিষে সাত ভাগে ভাগ করবে এবং

প্রত্যেক ঋতুস্রাবে সাত দিন ভক্ষণ করবে। এ ঔষধ তৈরী করতে অবশ্যই হাকীমের পরামর্শ গ্রহণ করবে।

গর্ভবতী না হওয়ার জন্য কে দায়ী?

১। স্বামীর বা স্ত্রী দু'জনের মধ্যে সন্তান না হওয়ার জন্য কে দায়ী। তা জানার উপায় হলো-স্বামী স্ত্রী একে অপরের পেশাব পৃথক পৃথক ভাবে লাউ গাছ অথবা সবজি গাছের গোড়ায় ঢেলে দিবে। অতঃপর উক্ত গাছটি যার পেশাব চোষণ করবে তার দুর্বলতা।

২। গম ও মটরশুটির সাতটি করে দানা নিবে এবং প্রত্যেকটির দু'টি করে দানা পৃথক করে মাটির মধ্যে রোপন করবে। অতঃপর সে দানাগুলোর উপর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে পেশাব করবে, যার পেশাবে বীজ উৎপাদন হবে না, তার দুর্বলতা। আর এ পরীক্ষা মূলত সে সব নারী-পুরুষের জন্য যাদের বীর্যে সন্তান জন্মিবার যোগ্যতা নেই। আসলে তো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বীর্য থেকে বাচ্চা জন্ম নেয়। যেমন কোনো গাছে ফল-ফলাদি উৎপাদন না হলে তাকে বাঁজা বলে। তেমনি যে বাঁজা তা নির্ণয় করে তার চিকিৎসা গ্রহণ করবে। অভিজ্ঞ হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করলে তা দুর হয়ে যায়।

সঙ্গমে দ্রুত বীর্যপাত

বেশ কয়েকটি কারণে সহবাসের সময় দ্রুত বীর্যপাত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো-কিছু কিছু রোগ এমন আছে যে, সহবাস শুরু করতে না করতেই স্ত্রীর জরায়ুতে যৌনাঙ্গ প্রবেশের পূর্বেই স্বামীর বীর্যপাত হয়ে যায়। তাহলে বুঝতে হবে যে, তার দ্রুত বীর্যপাতের রোগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু কেউ যদি নিজের ইচ্ছায় দ্রুত বীর্যপাত ঘটায়, তাকে কিন্তু এ রোগে আক্রান্ত রোগী বলা যাবে না। বীর্যপাত প্রতিরোধ করাকে আরবীতে ইমসাক বলে। এ ইমসাকের নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর জরায়ুতে মিনিট পাঁচের মত চলাচল করলেও তাকে ইমসাক বলে। আবার কারো এর চেয়ে বেশি সময় ধরেও ইমসাক হয়ে থাকে। আর যদি পুরুষাঙ্গ জরায়ুর মাঝে আধা মিনিট চলাচল করে, তাহলে তাকে ওকফিয়া বলে। এর কম সময় জরায়ুতে অবস্থান করলে বা জরায়ুতে প্রবেশের পূর্বেই স্বামীর বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে তাকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। আর দ্রুত বীর্যপাতের কারণও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, সেহেতু এর চিকিৎসাও বিভিন্ন ধরণের।

দ্রুত বীর্যপাতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিশেষ কথা

উক্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ইমসাকের ঔষধ কোথাও দেখলেই কিনে নেয়। অথচ তার দ্বারা কোনো ফলই পায় না। আসলে এ ধরণের রোগের কারণ প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর সে মোতাবেক চিকিৎসা করতে হবে।

দ্রুত বীর্যপাত রোগিদের চিকিৎসা

এক–

উপাদান	পরিমাণ
মৌরী বীজ	১ মাশা
পানের শেকড়	১ মাশা
লবঙ্গ	১ মাশা
জাফরান	১ মাশা
করণ ফল	২ মাশা
ভেজষ (ঔষধ বিশেষ)	২ মাশা

যেভাবে তৈরী করতে হয়ঃ মৌরি বীজ, পানের শেকড়, লবঙ্গ, জাফরান উপাদানসমূহ এক মাশা এবং করণ ফল ও ভেজষ দুই মাশা। এই উপাদানগুলোকে গুঁড়ো করে, একপোয়া দুধের মধ্যে এক চামচ ঔষধ ও এক চামচ চিনি মিশিয়ে সেবন করবে।

দুই–

উপাদান	পরিমাণ
আখরুট	১ মাশা
করণ ফল	১ মাশা
জাফরান	১ রতি
মেশক আফিম	১ রতি
মধু	পরিমাণ মতো

যেভাবে তৈরী করতে হয়ঃ আখরুট ও করণ ফল এক মাশা, জাফরান এক রত্তি, মেশক আফিম এক রতি। এ সবগুলোকে একত্রে করে গুঁড়া করতে

হবে। অতঃপর এগুলোর সাথে মধু মিশাতে হবে এবং ছোলার আকারে গোলাকার বানাতে হবে। যতবার সহবাস করবে সহবাসের পাচ মিনিট পূর্বে সেবন করবে।

বিশেষ কথা

যাদের বীর্য খুব দ্রুত বের হয়ে যায়, স্ত্রী সঙ্গমকালে বেশিক্ষণ অবস্থান করতে না পারে। তাদের জন্য টক অনেক ক্ষতিকর। টক খাওয়ার দ্বারা তাদের বীর্য আরো পাতলা হয়ে যাবে। এজন্য তাদের উচিত, টক জাতীয় খাবার পরিহার করা। টক খেলে কোনো ঔষধ কাজে আসবে না। তাদেরকে আরেকটি কথা খেয়াল রাখতে হবে, তারা কখনো উলঙ্গ, অশ্লীল ছবি দেখবে না। এসব পরিহার করবে।

একটি সত্য ঘটনা

এক প্রিয় বুযুর্গ মুত্তাকী আয়ুর্বেদ বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার বলেন, একজন সুস্থ ব্যক্তি সে যদি নিজেকে কু-চিন্তা, কু-দৃষ্টি, অশ্লীল ছবি দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে, তাহলে সহবাসের সময় সে আধঘন্টা স্থায়ী থাকতে পারবে। দ্রুত বীর্যপাত রোগীদের জন্য বিশেষ একটি জানার বিষয় হল যে, সহবাসের সময় নিজের চিন্তা স্ত্রীর দিকে না রেখে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ভাববে। কেননা দ্রুত বীর্যপাত মস্তিষ্ক থেকে হয়ে থাকে। সহবাসের সময় এ নিয়ে যে পরিমাণ কল্পনা করবে, তত দ্রুত বীর্যপাত হবে।

দ্রুত বীর্যপাত রোধের পদ্ধতি

সহবাসের সময় বীর্যপাত হবে বলে যখনই মনে হবে, তখনই সহবাস থেকে নিজেকে বিরত করে নিবে এবং ভিতর থেকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিবে। এর পর আবার সহবাস শুরু করবে এবং ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে থাকবে। এ পদ্ধতিটি বীর্যপাতের সময় ঘনিয়ে এলে আবারো গ্রহণ করবে। এরূপ করার দ্বারা সহবাসের সময় দীর্ঘায়িত করা যায়।

দ্রুত বীর্যপাত রোগীদের জন্য বিশেষ নিদর্শন

অনেকে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী বিভিন্ন ঔষধ গ্রহণ করে থাকে, যেমন নেশা করে, ইয়াবা টেবলেট খায়। এ জাতীয় আরো অনেক

ঔষধ রয়েছে, যা সেবনের কিছুক্ষণ পরই কার্যকরী হয়ে উঠে। উপরোক্ত রোগীদের জন্য এরূপ ঔষধ খুবই অপকারী। এসব ঔষধ খেলে বৃদ্ধ অবস্থায় এর কুফলটা পুরোপুরিভাবে টের পাবে।

বেশিক্ষণ সময় সহবাসের হালুয়া

এক-

উপাদান	পরিমাণ
যত্রিক ফল	পরিমাণমত
পদ্মফুলের বীজ	সমপরিমাণ
ছিতায়ুব (ঔষধী আঠা)	সমপরিমাণ
সাদা মসলা	সমপরিমাণ
কচু গাছের ফল	সমপরিমাণ
আকির ফল	সমপরিমাণ
রায়হান ফুলের বীজ	সমপরিমাণ
সাদা চিনি	সমপরিমাণ

যেভাবে তৈরী করতে হয়ঃ উপরোক্ত উপাদানগুলো একত্র করে মিশিয়ে গুঁড়ো করবে। হালকা গরম দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করবে।

দুই-

উপাদান	পরিমাণ
তেঁতুলের বীচি	সমপরিমাণ
গড় পাতা	সমপরিমাণ
পলাশ ফুলের বীজ	সমপরিমাণ
সিরাস গাছের বীজ	সমপরিমাণ

যেভাবে তৈরী করতে হয় ঃ তেঁতুলের বীচি চুলায় ভেজে তার উপরের ছাল তুলে ফেলবে। অতঃপর ভালোভাবে গুঁড়া করবে। এর সাথে এক বৎসরের পুরাতন গড়পাতার নির্যাস মিশাবে। এরপর পলাশ ফুলের বীজ, সিরাস গাছের বীজ (এক প্রকার গাছ, যার ফুল মৃদু সুঘ্রাণ ছড়ায়) সবগুলো গুড়ো করে খামির বানাবে। এরপর ছোলা বোটের আকারে বানিয়ে দৈনিক রাতে ঘুমানোর পূর্বে ৩টি করে হালকা গরম দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করবে।

তিন-

উপাদান	পরিমাণ
বাবলা গাছের ফল	সমপরিমাণ
বাবলা গাছের আঠা	সমপরিমাণ
বাবলা গাছের কুঁড়ি	সমপরিমাণ
পলাশ ফুলের আঠা	সমপরিমাণ
গমের আটার ভূষি	সমপরিমাণ
পুরাতন গুড়	সমপরিমাণ

যেভাবে তৈরী করতে হয় ঃ বাবলা গাছের ফল, আঠা, কুঁড়ি ও পলাশ গাছের আঠাকে একত্রে গুঁড়ো করবে। অতঃপর গমের আটার ভূষি ও পুরাতন গুড় মিশিয়ে হালুয়া বানাবে। তবে পলাশ ফুলের আঠা পরিমানে বেশি দিলে ভালো হয়। উপরোক্ত উপাদানে তৈরীকৃত ঔষধটি বেশ ফলদায়ক।

স্ত্রীকে সহবাসের স্বাদে আবদ্ধ করার উপায়

বর্তমানে এ বিষয়টি সচরাচর দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রী আপন স্বামী ছেড়ে পরকীয়া প্রেমে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্বামীর সাথে সহবাস করে যতটুকু আনন্দ পায় তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায় তার গোপনীয় পুরুষ দ্বারা। কারো স্ত্রী যদি তাকে ছাড়া অন্য কারো সাথে সহবাস করে বলে জানা যায় বা বোঝা যায়, তাহলে সে স্বামীকে নিম্নোক্ত কাজটি করতে হবে। কাজটি হল-

স্বীয় স্ত্রীর চিরুনী হতে চুল বের করবে বা অন্য কোনো মহিলার চুল সংগ্রহ করতে হবে। সে চুল আগুনে পুড়ে ছাই বানাতে হবে। অতঃপর সে ছাইকে মাখনের সাথে মিশিয়ে তৈল বানাবে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বক্ষণে স্বীয় লিঙ্গে তা মালিশ করবে। এর পর স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে এ সহবাস দ্বারা সে মহিলা এমন মজা পাবে যে, নিজের স্বামী বাদে অন্য কারো সাথে সহবাস করতেই চাবে না। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তিও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে কিন্তু উভয়ের সহবাসের মজা এক রকমই হবে।

যে তৈল ব্যবহার করলে সহবাসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায়

মানুষের চুল পুড়া ছাই এবং কর্পুর সমপরিমান নিয়ে, দ্বিগুণ পরিমাণ মধুর

সাথে মিশিয়ে তৈল বানিয়ে সহবাসের ঘন্টাখানিক পূর্বে লিঙ্গে মালিশ করে সহবাস করলে স্ত্রী সীমাহীন আনন্দ স্বাদ উপভোগ করবে।

আশ্চর্যজনক তৈল

কালো রঙয়ের গাভীর এক কিলো দুধের সাথে লাল চুন্ট (যা আম গাছে হয়ে থাকে) মিশিয়ে আগুনে জ্বাল দিবে। জ্বাল দিয়ে দিয়ে তা থেকে মাখন বের করবে। সহবাসের পূর্বক্ষণে সে মাখন গরম করে কয়েক ফোটা অণ্ডকোষ বাদ দিয়ে কেবল লিঙ্গে মালিশ করবে। এতে পুরুষাঙ্গ মোটা ও লম্বা হওয়ার পাশাপাশি স্ত্রী সহবাসে কল্পনাতীত স্বাদ অনুভব করবে।

ধাতু দুর্বলতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইচ্ছা, উত্তেজনা, নাড়াচাড়া ছাড়াই পেশাবের আগে বা পরে পুরুষাঙ্গ হতে বীর্য বের হওয়া, অথবা পেশাবের সাথে বা কঠোর মেহনত, বোঝা উত্তোলন অথবা উত্তেজনা আসার দ্বারা কিংবা মহিলাকে স্পর্শ করার দ্বারা বীর্যপাত হয়। আবার অনেক সময় জোর খাটানোর সময় বীর্যপাত হয়ে যায়। তদ্রুপভাবে ঘুম গেলে বীর্যপাত হয়। ধাতু বা বীর্য যেহেতু শরীরের রূহ বলা হয়ে থাকে, সেহেতু বীর্যপাত হওয়ার দ্বারা শরীরে অলসতা ও দুর্বলতা দেখা দেয়। এমনকি কোমরে ব্যথাও অনুভব হয়। সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো মাথার ব্রেণে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। চেহারা শুকিয়ে যায়। শারীরিক দুর্বলতাও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। কোনো কাজই ভালো লাগে না। সব কাজেই বিরক্তি বিরক্তি ভাব দেখা দেয়। সব সময় মনে চায় যদি শুয়ে থাকতে পারতাম। মহিলাদের প্রতি যৌন আকর্ষণ হ্রাস পেতে পেতে এক সময় তাদের প্রতি কোনো চাহিদাই জাগে না। কারো সাথে মেলা-মেশা, কথাবার্তা বলতেও ভালো লাগে না। নীরব ও অন্ধকার লাগে। একাকী ও নির্জনতা পছন্দ হয়। কারো কারো অবস্থা এমন করুণ হয়ে দাঁড়ায়, যার কারণে আত্মহত্যার জন্যও প্রস্তুতি নেয়। এসব কিছুই কেবল ধাতু দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে।

ধাতু দুর্বলতা রোগের কারণ

ধাতু দুর্বলতার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলো বেশিরভাগ লোকদের মাঝে পাওয়া যায়।

১। উত্তেজনার বশিভূত হয়ে হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত ঘটানো।
২। সমকামিতার মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো।
৩। সব সময় পেটের অসুখ লেগে থাকার কারণে।
৪। কতক সময় অধিক গরম ও বিলম্বে হজম হয় এমন খাদ্য খাওয়ার দ্বারা।
৫। ভরপেটে সহবাস করার দ্বারা।
৬। অশ্লীল, যৌন উদ্দীপক ছবি দেখার দ্বারা বীর্যপাত হয়ে থাকে। আর এসব কারণেই বেশিরভাগ ধাতু দুর্বলতা রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

স্তন শক্তিশালী করার উপায়

ঢিলা, শুকিয়ে যাওয়া স্তন তাজা ও শক্তিশালী করতে এক কিলো আঙ্গুরের ছোলা এবং চার কিলো পানির মধ্যে দিয়ে পানি আধা কিলো হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আগুনে জ্বাল দিবে। অতঃপর তার সাথে আধা কিলো তিলের তেল মিশিয়ে আবারো জ্বাল দিবে, যাতে সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়। সবশেষে কাপড়ে ছেকে শিশির মধ্যে হেফাজত করে রাখবে এবং লাগাতার কয়েকদিন শুকনো ও ঢিলা স্তনে ব্যবহার করবে। এতে তার স্তনটি অবশ্যই শক্তিশালী হবে।

স্বপ্নদোষ বিষয়ক আলোচনা

চার কারণে স্বপ্নদোষ হয়

১। অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা, কু-চিন্তা ফিকির, অশ্লীল স্বপ্ন দেখার কারণে।
২। বদ হজম ও পেট খারাবের কারণে।
৩। মূত্রথলির দুর্বলতার কারণে।
৪। বীর্যথলি ভরপুর হওয়ার কারণে। যখন বীর্যথলি ভরপুর হয়ে যায় এবং নতুন করে বীর্য তৈরী হয়, তখন অতিরিক্ত বীর্য বের হয়ে আসে। চতুর্থ প্রকারটি ধাতু দুর্বলতার কারণে নয় বরং বীর্য অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে। বাকি তিনটি হয়ে থাকে বীর্যপাতলা বা ধাতু দুর্বলতার কারণে। ধাতু দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকলে, তার চিকিৎসা আবশ্যক।

স্বপ্নদোষের বিশেষ চিকিৎসা

এক—

উপাদান	পরিমাণ
সনবল ঘাসের ফল	পরিমাণমত
পোস্তর দানা	চারটি
এলাচি	পরিমাণমত
উষ্ণ দুধ	পরিমাণমত
সাদা চিনি	পরিমাণমত

যেভাবে তৈরী করতে হয় ঃ যে সব লোকের মেজাজ গরম, সাধারণত তাদের বীর্য তরল বা পাতলা হয়ে থাকে। এসব লোকদের শরীর শুকিয়ে যায় এবং স্বপ্নদোষ তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে। এদের চিকিৎসা হল, সুগন্ধিযুক্ত সনবল ঘাসের ফলকে ভেঙ্গে তা পরিস্কার করে সাদা চিনির মধ্যে খামিরা বানাবে। অতঃপর চারটি পোস্তদানা এবং পরিমানমত এলাচি মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় এক তোলা উষ্ণ দুধের সাথে মিশিয়ে পান করবে। আট দিনের মধ্যে উপকার পেতে শুরু করবে ইনশাআল্লাহ্।

দুই—

উপাদান	পরিমাণ
পাকা কলা	১ জোড়া
কলমি শুরা	৩ রত্তি

যেভাবে তৈরী করতে হয় ঃ দু'টি পাকা কলা, তিন রত্তি কলমি শুরার মধ্যে ভরিয়ে ছোলাকে ফেরিয়ে দিবে। অতঃপর একটি থলিতে নিয়ে রাতে ঘরের ছাদে দিবে, যেন রাতের শিশির বিন্দু তাতে পড়ে। যদি শিশির না থাকে, তবুও ছাদের উপর রাখবে এবং সে কলাদু'টি থেকে একটিকে সকালে খাবে। আবার সন্ধায় আরেকটি খাবে। এভাবে লাগাতার আট থেকে দশ দিন আমল করবে। আসলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে হেকিমদের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত। কেননা, তারা রোগ চিনে ঔষধ দিয়ে থাকেন।

কি কি কারণে যৌনশক্তি হ্রাস পায়

১। আহারের পরে যৌনমিলন করলে যৌনশক্তি হ্রাস পায়।

২। খোলা আকাশের নিচে যৌনমিলন করলে।

৩। নেশা জাতীয় খাদ্য খেয়ে মাতাল অবস্থায় যৌনমিলন করলে।

৪। ফলবান বৃক্ষের নিচে বসে যৌনমিলন করলে।

৫। শোক বা শারীরিক অসুস্থ অবস্থায় যৌনমিলন করলে।

৬। পুরুষে পুরুষে মৈথুন করলে অর্থাৎ সমমৈথুন করলে আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হয়।

৭। গুপ্তস্থানের লোম ৪০ দিনের মধ্যে পরিস্কার না করলে।

৮। যৌনমিলনের পর গুপ্তস্থান ধৌত না করলে।

৯। মলমূত্র চেপে রেখে যৌনমিলন করলে।

১০। রাত দ্বিপ্রহরের পূর্বে যৌনমিলন করলে।

১১। যখন তখন যৌনমিলন করলে বা অতিরিক্ত যৌনমিলন করলে।

১২। হস্তমৈথুন করলে যৌনশক্তি হ্রাস পায়।

ধাতু দুর্বল রোগ ও তার প্রতিকার

১। কৃষ্ণতিলা ও আমলকী সমপরিমাণ চূর্ণ করে ভালোভাবে ছেকে নিবে, প্রতিদিন ঘুমানোর সময় ১ তোলা পরিমাণ চূর্ণ মুখে দিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করবে। এভাবে ২১ দিন নিয়মিত পান করলে ইনশাআল্লাহ্‌ পাতলা ধাতু গাঢ় হয়ে যাবে।

২। চারা শিমূল গাছের মূল শুকিয়ে চূর্ণ করে রাখবে। দৈনিক এ চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণ নিয়ে আধাপোয়া পরিমাণ বকরীর দুধের সাথে মিলিয়ে সেবন করবে। এভাবে ২১ দিন পর্যন্ত সেবন করলে ধাতু দুর্বলতা সেরে যাবে।

৩। বিকালবেলা ৩ তোলা পরিমাণ ছোলাবুট ভিজিয়ে রাখবে। সকালে খালি পেটে তা খাবে। একাধারে অন্ততঃ এক মাস খাবে। এতেও পাতলা ধাতু গাঢ় হয় এবং ধাতু দুর্বলতা কমে যায়।

৪। আম, জাম ও তেঁতুলের বীজ সমপরিমাণ নিয়ে ভালোভাবে চূর্ণ করবে। প্রতি রাতে শয়নকালে ১ তোলা পরিমাণ সেবন করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করবে। এভাবে ২১ দিন পর্যন্ত সেবন করবে।

৫। কাঁচা আম অর্থাৎ যে আমে এখনো বীচি হয় নি। সে আম ছোট ছোট

করে কেটে রোদে শুকিয়ে গুঁড়া করবে। ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করে সমপরিমাণ আখের গুড়ের সাথে মিলিয়ে সাত দিন সেবন করলে ইন্দ্রিয়ের দোষ ভালো হয়। এমনকি ধ্বজভঙ্গ রোগ থাকলেও তা ভালো হয়ে যাবে।

৬। অনেকের পেশাবের সাথে শরীরের অনেক উপাদান বের হয়ে যায়। এভাবে দিনের পর দিন বের হতে থাকলে যৌবনে শীতলতা নেমে আসে ফলে মাথায় ব্যাথা অনুভব হয়, মাথা ঘুরায়, চোখে মাঝে মাঝে তারার মত দেখা যায়। শরীরের অসাঢ়তা নেমে আসে। বিভিন্ন জায়গায় বাতে আক্রমণ করে, মানুষ দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। যদি এরূপ ভাব দেখা যায়, তাহলে কালবিলম্ব না করে ওলোট কম্বলের পাতা কুচি কুচি করে কেটে একটি গ্লাসে ভিজিয়ে রাখবে। সকাল বেলা পাতাগুলো ছেকে নিবে। ১ তোলা পরিমাণ আখের গুড় দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে একাধারে ১৫ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত সেবন করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে দুপুরে একটি কচি ডাবের পানি পান করবে। অর্থাৎ যে ডাবে নারকেলের শর পর্যন্তও পড়ে নি। মোটকথা ডাবের পানিটা কষ কষ হতে হবে। এতে ক্ষয়রোগ চিরতরে ভালো হয়ে যাবে।

৭। তিন তোলা পরিমাণ ছুলাবোট রাতে ধৌত করে ভিজিয়ে রাখবে এবং সকাল বেলা খালি পেটে চিবিয়ে খাবে। এভাবে অন্ততঃ ১ মাস করলে ধাতু দুর্বলতা রোগ ভালো হয়ে যাবে।

৮। রাতে শোবার পূর্বে এবং সকালে ঘুম হতে উঠে খালি পেটে আধা সের পরিমাণ ঠাণ্ডা পানি পান করলে এবং সকালে নিয়মিত গোসল করবে এতেও ধাতু দুর্বলতা রোগ ভালো হয়ে যাবে।

৯। প্রতি রাতে আধা ছটাক পরিমাণ ইছবগুলের ভূষি ভিজিয়ে রাখবে। পরের দিন সকাল বেলা খালি পেটে একপোয়া পরিমাণ ছাগলের দুধও সামান্য চিনি মিশিয়ে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সেবন করলে ধাতু দুর্বলতার রোগ হতে মুক্তি পাবে।

১০। যাদের বীর্য পাতলা ও তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়, তাদের জন্য এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এক তোলা পরিমাণে ইছবগুলের ভূষির সাথে আধা সের পরিমাণ গাভীর দুধ মিশায়ে খাবার মত অর্থাৎ পরিমাণ মত মিছরী মিশিয়ে অল্প অল্প করে আগুনে জাল দিয়ে গাঢ় করে নামায়ে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে এভাবে একুশ দিন পর্যন্ত সেবন করলে খুব দ্রুত পাতলা বীর্য গাঢ় হয়ে যাবে।

রতিশক্তি বৃদ্ধির উপায়

১। প্রতিরাতে শয়ন করার পূর্বে এক কোয়া বিশিষ্ট একটি পেঁয়াজ দশটি কালীজিরার সাথে চিবায়ে খেলে আশি বছর পর্যন্ত মর্দামী শক্তি পূর্ণ বহাল থাকবে। তবে নিয়মিত সেবন করতে হবে।

২। কয়েক ফোটা মধু নিয়মিত লিঙ্গে মালিশ করলে আশিবছর পর্যন্ত লিঙ্গ মোটা, লম্বা ও লৌহদণ্ডের মত মজবুত থাকবে।

৩। শিমুল মূলের রসে সামান্য চিনি মিশিয়ে প্রত্যেহ ভোরে সেবন করলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪। দুই তোলা পরিমাণ তেলাকুচার মূল অল্প পানি দিয়ে বেটে নিয়মিত সেবন করলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৫। নিয়মিত কিছুদিন চড়ুই পাখির মাংস ভুনা করে খেলেও রতি শক্তি মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়।

৬। শিমুল গাছের মূল দুই আনা পরিমাণ, আমলকি চূর্ণ দুই আনা, জায়ফল চার রতি ও পরিমাণ মত মাখন এবং মিছরী চূর্ণ করে একত্রে মিশিয়ে নিয়মিত সকালে ও রাতে ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করলে অতি তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।

৭। হযরত লোকমান হাকীমের জহুরা পানি দুধ কিংবা মধুর সাথে মিশিয়ে সাত দিন খেলে রতি শক্তি ঠিক থাকবে।

কামশক্তি বৃদ্ধির উপায়

আমাদের দেশে দুই জাতের ডুমুর পাওয়া যায়। বড় জাতের যক্ষ ডুমুর। সেই ডুমরিের রস আধা তোলা পরিমাণ নিবে এবং আধা তোলা পরিমাণ বেল পাতার রস মিশিয়ে সহবাসের সময় সেবন করলে দুই ঘন্টারও অধিক সহবাস করা যায়। তবে এ নিয়মে সপ্তাহে একবারের বেশি সহবাস করা উচিত হবে না।

অনেকের ধারণা যে, বেল পাতায় রস হয় না, তবে নিয়ম জানা থাকলে রস বের করা যায়। যেমন- কলাগাছের মোচা কাটলে যে কস বের হয় সে কস কচি বেল পাতার সাথে মাখিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে রগড়ালে বের পাথার রস বের হয়ে যাবে।

অনেকে জানতে চায় যে, কোন জিনিস ব্যবহার করলে স্ত্রী সহবাসের জন্য

স্বামী ব্যাকুল হয়ে যায় এবং কোন জিনিস ব্যবহার করে স্ত্রী সহবাস করলে স্ত্রী গর্ভধারণের আশঙ্কা নেই?

আমরা বলে থাকি, জিনিসটি হল শুঁঠ। শুঁঠ চূর্ণ করে সিকি পরিমাণ ও সমপরিমাণ আকর করা চূর্ণ একত্রে পরিমাণমত মধু নিয়ে ভালোভাবে চটকায়ে নিতে হবে এবং সহবাসের পূর্বে লিঙ্গে লাগিয়ে যৌন সহবাস করলে ঐ সহবাসে গর্ভধারণের কোনো সম্ভবনা নেই।

হারানো যৌবন ফিরে পাওয়ার উপায়

প্রথমে একটি মুরগির ডিমের কুসুম নিতে হবে। যে পরিমাণ কুসুম নিবে ঠিক সে পরিমাণ খাঁটি মধু ও খাঁটি ঘি নিতে হবে। পরে সমপরিমাণ ছোট পেঁয়াজের রসের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে অল্প আগুনের তাপে জ্বাল দিয়ে হালুয়ার ন্যায় তৈরি করবে। এই সবটুকু হালুয়া সকালে খালি পেটে সেবন করতে হবে। নিয়মিত চল্লিশ দিন খেলে যাদের যৌবন একেবারে নেই তারাও নবযৌবন লাভ করবে এবং শক্তিশালী যুবকে পরিণত হবে।

মর্দামী শক্তি বাড়াবার উপায়

শারীরিক শক্তি ও মর্দামী শক্তি বৃদ্ধি করার হালুয়া ঃ দিয়ে মছলী, ছফিদ মদুলি, আকর করা, কাবাব চিনি, কলু ও শুন্টি প্রত্যেকটি নয় মাশা, এলাচি, মরিচ কাঙ্গল প্রত্যেকটি এক তোলা, জাতিফল ১০ তোলা, অশ্বগন্ধা আড়াই তোলা, বাবুলগুণ এক সের পরিমাণ এবং মিছরি, চিনি, ঘি এক সের নিতে হবে। তারপর বাবুলগুণকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে রোদ্রে শুকাতে হবে। এবার বাবুলগুণকে অল্প অল্প ঘি দিয়ে ভুনে খৈ করে পিষতে হবে। একটা লোহার কড়াইতে চিনি ও মিশ্রি পানির সঙ্গে মিলিয়ে আগুনে জাল দিয়ে ঘন করে নিবে। এমনভাবে জাল দিবে যেন লাসাযুক্ত হয়। এখন পিষা বাবুল কড়াইতে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিবে। যখন ভালোভাবে মিশে ঘন হয়ে যাবে, তখন নামায়ো মসল্লার গুঁড়া ঘৃতে ভিজানো কড়াইতে ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিবে। দৈনিক সকালে খালি পেটে গরুর দুধের সাথে দুই থেকে আড়াই তোলা পরিমাণ সেবন করলে মর্দামী শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

সহবাসে যাদের ধাতু দ্রুত বের হয়

আধাসের পরিমাণ শুকনা তেঁতুলের বিচি হামান দিস্তায় কুটিয়ে বিচির খোষা ফেলে দিয়ে পুনরায় শাঁসটা আবার গুঁড়া করে নিবে যাতে ময়দার মতো হয়। উক্ত গুঁড়া এক তোলা পরিমাণ নিয়ে দেড় ছটাক পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে কিছুদিন চিনি অথবা গুড় দিয়ে সকালে খালি পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাবে, ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই ধাতু গাঢ় হবে এবং তাড়াতাড়ি ধাতু নির্গত হওয়া বন্ধ হবে। ফলে যৌন মিলনেও তৃপ্তি আসবে।

উত্তেজনা শক্তি বৃদ্ধির উপায়

১। বিদায়ী চন্দচূর্ণ ঃ ১৪ গ্রাম, গুলঞ্চের রস-১২ গ্রাম, গরুর ঘৃত- ১ চামচ ও গরম দুধ- ২৫০ গ্রাম নিতে হবে। এবার সবগুলো একত্রে মিশিয়ে প্রত্যেহ সকালে সেবন করতে হবে। এভাবে ২১ দিন সেবন করলে নপুংশকতা আরোগ্য হবে এবং বলবীর্য বৃদ্ধি করে শুক্রতারল্যতা দুর করবে।

২। কৃষ্ণতিলার মূল- ৩ গ্রাম ও গোক্ষুর চূর্ণ- ৩ গ্রাম নিবে। এবার এক পোয়া পরিমাণ বকরীর দুধের সাথে মিশিয়ে ভালোভাবে জাল দিয়ে ঘর করতে হবে এবং দৈনিক সকালে খেতে হবে। এভাবে ২১ দিন পর্যন্ত খেতে পারলে অচিরেই শরীরের বলশক্তি ফিরে আসবে।

৩। টগ্গন বীচ ২৮ গ্রাম, কুঞ্জ বীজ ৪২ গ্রাম ও গোক্ষুর বীজ ৫২ গ্রাম নিতে হবে। এবার সবগুলো ভালোভাবে চূর্ণ করে কাপড়ে ছেকে নিতে হবে। এবার রাতে শোবার পূর্বে ৬ গ্রাম পরিমাণ চূর্ণ ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করে এক পোয়া পরিমাণ হালকা গরম গরুর দুধের সাথে পরিমাণমত মিছরি নিয়মিত একমাস সেবন করলে অবশ্যই পুরুষত্ব শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৪। শুকনো আমলকী ৫০ গ্রাম ভালোভাবে চূর্ণ করে পরিস্কার কাপড়ে ছেকে নিতে হবে এবং কিছু পরিমাণ আমলকি পিষে রস বের করতে হবে। ঐ রসের সাথে আমলকি গুঁড়া ভালোভাবে মিশিয়ে অল্প আঁচে শুকিয়ে পুনরায় রৌদ্রে শুকিয়ে শুষ্ক করে নিতে হবে। এবার ঐ চূর্ণের সাথে মিছরি গুঁড়া করে পরিমাণমত মধু নিয়ে প্রত্যেহ সকালে সেবন করলে নপুংশকতা নাশ হয়।

যৌন ক্ষমতা যাদের নেই তাদের জন্য জরুরী চিকিৎসা

যৌবনের সূচনাতেই যারা রতিক্রিয়ার একেবারে অক্ষম, কিংবা বয়স

বৃদ্ধির কারণে যদি রতিক্রিয়ায় অক্ষম। যৌবনে অতিরিক্ত অত্যাচারজনিত কারণে যদি কারো নপুংশকতা দেখা দেয়, তাহলে কালবিলম্ব না করে নিজে নিজে এ ঔষধ তৈরি করে সেবন করবে। এর নাম মদন মঘউরী বটিকা।

যেভাবে বানাতে হয় ঃ শুট ১০০ গ্রাম, গোল মরিচ ১০০ গ্রাম, পির্পুল ১০০ গ্রাম, পারদ ২ গ্রাম, পত্রজ ১০০ গ্রাম, নাগকেশর ১০০ গ্রাম, ছোট এলাচ ১০০ গ্রাম, জয়ফল ৫০ গ্রাম, লবঙ্গ ৫০ গ্রাম ও জয়ত্রী ২৫ গ্রাম। এসব সম্পূর্ণ চূর্ণ করে পরিস্কার কাপড়ে ছেকে নিতে হবে। তারপর ২৫০ গ্রাম গরুর ঘি ৬৫০ গ্রাম মধু একত্রে মিশিয়ে ১৫ গ্রাম পরিমাণ বড়ি বানাবে। উক্ত বড়ি প্রতিরাতে একত্রে মিশিয়ে ১৫ গ্রাম পরিমাণ বড়ি বানাবে। উক্ত বড়ি প্রতি রাতে পানিসহ সেবন করে মিশ্রি বা চিনি মিশানো এক গ্লাস পরিমাণ দুধ পান করবে। দুই মাস পর্যন্ত এ ঔষধ সেবন করলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও ২৪ বছরের যুবকের মত শক্তি অনুভব করবে। বৃদ্ধ ও যুবক উভয়েই এ ঔষধ সেবন করতে পারবে।

২। হস্ত মৈথুন, মাদকদ্রব্য সেবন, অধিক পরিশ্রম, অধিক চিন্তা-ভাবনা ও দুর্বলতার কারণে যদি কারে রতি ক্ষমতা হারিয়ে যায় অথবা যদি শীঘ্র পতন হয়ে যায়, তাহলে নিচের ঔষধগুলো তৈরি করে ব্যবহার করবে।

পোস্ত ৩০০ গ্রাম ও নাজুফল ৪০০ গ্রাম, ১০ কিলোগ্রাম পানিতে ভালোভাবে ফুটাতে হবে। যখন দেখবে যে এক কিলোর কিছু কম আছে, তখন জয়ফল ৫ গ্রাম, লবঙ্গ ৫ গ্রাম, বিদারী কন্দ ১০ গ্রাম, শিমুল বীজ ১০০ গ্রাম, নাগকেশর ৫ গ্রাম, শুঁঠ ১০০ গ্রাম, পুরাতন ইক্ষুর গুড় ৫০০ গ্রাম পরিমাণ নিয়ে যা চূর্ণ করা যায় সেগুলো চূর্ণ করে নিবে। তারপর পানিতে মিশিয়ে ৫ কিলোগ্রাম গরুর দুধের সাথে মিশিয়ে আগুনে ফুটাবে। যখন ৫০০ গ্রাম পরিমাণ থাকবে, তখন পুরাতন গুড় ঢেলে দিয়ে আবার অল্প আঁচে নাড়তে থাকে। যখন শক্ত শক্ত ভাব হয়ে উটেছে, তখন একটি আমলকী পরিমাণ বড়ি তৈরি করবে। এবার সকাল-সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা পানিসহ একটি করে বড়ি সেবন করবে। এভাবে ২১ দিন বড়ি সেবন করলে যে কোনো ধরণের পুরুষত্বহীনতা দুর হয়ে যাবে। এট একটি বাজীকরণ ঔষধও বটে।

৩। ২৫০ গ্রাম কুঁজ বীজ, একপোয়া পরিমাণ গরুর দুধে সিদ্ধ করে নিতে হবে। দুধ যখন শুকিয়ে যাবে তখন বীজগুলো তুলে নিয়ে চূর্ণ করে একটি শিশিতে ভরে রাখবে। তাতে সামান্য মধু ও এক চামচ গরুর ঘি মিশিয়ে

সকালে ও রাতে চার গ্রাম করে দুই মাস পর্যন্ত সেবন করবে। ঠিক মতো সেবন করলে যে কোনো কারণেই নপুংশকতা হোক না কেন তা ইনশাআল্লাহ্ আরোগ্য হবেই।

৪। রতি ক্ষমতাহীনতা, নপুংসকতা ও দুর্বলতা যদি দেখা দেয়, তাহলে এই ঔষধ সেবন করবে। অশ্বগন্ধা ১০০ গ্রাম, জয়ত্রী ১০০ গ্রাম, জায়বর্শ ৫০ গ্রাম, লবঙ্গ ৪০ গ্রাম, দ্বারচিনি ৫০ গ্রাম ও কৃষ্ণ তিল ৫০০ গ্রাম নিতে হবে। কৃষ্ণ তিল খোসা ছড়িয়ে ভালোভাবে চূর্ণ করে সাদা কাপড়ে ছেকে নিতে হবে। এরপর পরিমাণ মতো মধু নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে সমানভাগে ৪২টি বড়ি তৈরি করবে। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় ১টি করে বড়ি ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করবে। পান করার পর চিনি মিশ্রিত হালকা গরম দুধ এক পোয়া পরিমাণ পান করলে যে কোনো ধরণের নপুংশকতা দুর হয়ে যাবে। দৈহিক দুর্বলতাও কেটে যাবে এবং শরীরে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় হবে।।

৫। তাল মাখনার বীজ ৩ গ্রাম, মিছরী ১২ গ্রাম ও কুঁচবীজ ৩ গ্রাম। উপরের ঔষধগুলো চূর্ণ করে কাপড়ে ছেকে নিতে হবে। তারপর একপোয়া পরিমাণ দুধে মিশিয়ে দৈনিক সন্ধ্যায় সেবন করবে। এ পদ্ধতিতে হালুয়া বানিয়ে এক মাস সেবন করলে যে কোনো ধরণের নপুংশকতা দুর হবে।

৬। হস্তমৈথুন বা মলদ্বার মৈথুনের জন্য অতিরিক্ত বীর্যপাত হওয়ার দরুণ নপুংশকতা দেখা দিলে নিচের ঔষুধ ব্যবহার করতে হবে।

কৃষ্ণ তিল চুর্ণ ৩ গ্রাম ও গোক্ষুর চূর্ণ ৩ গ্রাম। চূর্ণ করে ভালোভাবে ছেকে নিবে। তারপর একপোয়া ছাগলের দুধের সাথে মিশিয়ে রাতে সেবন করবে। নিয়মিত একমাস সেবন করলে নপুংশকতা থাকলে অবশ্যই দুর হয়ে যাবে।

পুরুষত্ব বৃদ্ধির হালুয়া

১। **মুরগীর ডিমের হালুয়া ঃ** মুরগীর ডিমের কুসুম ২০টি, চিনি ৫০০ গ্রাম, গরুর ঘি ৫০০ গ্রাম। উপরোক্ত দ্রব্যগুলো একসাথে ভালোভাবে ফুটিয়ে অল্প আঁচে ফোটাতে হবে। যখন গাঢ় হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে প্রতিদিন সকালে ২০ গ্রাম পরিমাণ ২১ দিন সেবন করলে বল বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরুষত্বও বৃদ্ধি পাবে।

২। **ডিমের হালুয়া ঃ** মুরগির ডিম ২০টি, চিনি ৭৫০ গ্রাম, গরুর ঘি ৫০০ গ্রাম, গরুর দুধ ১ কেজি। ডিমগুলো ভেঙ্গে কুসুমগুলো নিতে হবে তার সাথে

গরুর ঘি ও গরুর দুধ দিয়ে ভালোভাবে ফোটাতে হবে। তারপর অল্প আঁচ দিয়ে ফোটাতে হবে। এভাবে ফোটাতে ফোটাতে যখন গাঢ় ও ঘন হয়ে আসবে তখন সাদা মুসলি ২০ গ্রাম, সালেম মিছরি ৪০ গ্রাম, কাঁচা বাদাম ১০০ গ্রাম, পেস্তা বাদাম অল্প আঁচে ফোটাবে। যখন ঘন হয়ে যাবে তখন নামিয়ে ঠাণ্ডা করবে। প্রতিদিন সকাল বেলা খালি পেটে ২০ গ্রাম পরিমাণ এ হালুয়া খেলে এক দিনে একাধিক নারী সম্ভোগের শক্তি জন্মিবে এবং ৮০ বছরের বৃদ্ধও ১৮ বছরের যুবকের ন্যায় শক্তি সঞ্চয় করতে পাবে।

সাবধান ঃ ডিমের হালুয়া কেবল শীতকালেই ব্যবহার করবে। গরমকালে কখনই ব্যবহার করবে না।

বীর্য গাঢ় ও বৃদ্ধি করার তদবীর

১। বাবলার কচি পাতা এক পোয়া, কাশির চিনি এক পোয়া, সাদা ধুনা এক পোয়া, লাল ধুনা এক পোয়া। এসব দ্রব্য পিষে মিশ্রিত করবে। দৈনিক সকাল বেলা এক তোলা পরিমাণ নিয়ে গরম দুধের সাথে পান করবে এবং একটি বাতাসা ছিদ্র করে তার মধ্যে সাত ফোঁটা বকরীর দুধ দিয়ে সেবন করবে। কিন্তু শাক, অম্ল, ডাল খাবে না। আর স্ত্রীসহবাস হতে পৃথক থাকবে। পরে শরীরে বল পেলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হলে সহ্যমত স্ত্রীসহবাস করতে কোনো ক্ষতি নেই। পুরুষের সহ্যগুণ না থাকলে এরূপ দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

২। ডুমুরের শিকড়ের ছাল পাঁচ তোলা, ছোট গোক্ষুর পাঁচ তোলা, তালমাখনা পাঁচ তোলা, কামাক গোটার শ্বাস (মগজ) পাঁচ তোলা, ভূফলি এক তোলা, তোখমা ছুরয়ানি এক তোলা, বিজবন্ধ এক তোলা, চিনাগন্দ এক তোলা। এসব দ্রব্য কুটে কাপড়ে চেলে ফাঁকি করে রাখবে। প্রাতঃকালে এক তোলা পরিমাণ কাঁচা গরুর দুধের সাথে সেবন করবে। সর্দি বেশি হলে গরম দুধের সাথে সেবন করবে।

পুরুষাঙ্গ চিকন ও বক্রতার তদবীর

পুরুষের লিঙ্গ চিকন বা বক্র হলে স্ত্রী সহবাসের উপায় থাকে না। কিংবা এর দ্বারা সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। সর্বদাই চিন্তা, ভয়-ভাবনায় আহার পর্যন্ত করতে ইচ্ছে হয় না। তজ্জন্য ইউনানী হাকিমগণ নিম্নোক্ত তদবীর বলেছেন–

১। গোলে আরমনি, বজরুলবঞ্জ। এ দু'টি বস্তু এক সঙ্গে কুটে বিশুদ্ধ

ছেরকার সাথে মিশিয়ে অল্প গরম করে লিঙ্গে প্রলেপ দিবে।

২। কচ্ছপের ডিম এক তোলা, আরগুেরগিরি এক তোলা, মেহেদির ফুল এক তোলা, বাবলার কুঁড়ি এক তোলা, গেঁটে হলুদা এক তোলা। এসবগুলোকে কুটে পানিতে ছেনে অল্প গরম করে চার পাঁচ দিন প্রলেপ দিবে।

৩। মহানিমের কুঁড়ি, পোস্তের আরক, কালজিরা, গোলমরিচ, বেলাইগন্দ, কুচলে, ভোজপাতা প্রত্যেক বস্তু সমান অংশ নিয়ে পানিতে পিষে অল্প গরম করে তিন দিন বা সাত দিন লাগাবে।

৪। কালজিরা, আরগুেরগিরি সোডার পানিতে পিষে অল্প অগ্নিতাপে গরম করে প্রলেপ দিবে।

পুরুষাঙ্গ স্থূল ও কঠিন করার হেকমত

১। মাইন ফল, গোলাপের পাতা, মাছুর আনারের কলি। এ তিন বস্তু একসঙ্গে পিষে তিন দিন নতুবা সাতদিন প্রলেপ দিতে হবে।

২। একটা জোঁক ঝুনা নারকেলের ভিতর পুরে কিছুদিন রোদে ফেলে রাখবে। যখন নারকেলের জল শুষ্ক হয় জোঁক মরিয়া যাবে, ঐ শুষ্ক জোঁককে পিষে লিঙ্গতে মালিশ করলে, লিঙ্গ স্থূল ও বৃহৎ হয়। এর তুল্য উত্তম তদবীর এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় নেই।

যৌবন স্থায়ী পোষ্টাই হালুয়া

প্রসিদ্ধ হাকীম জালিনুস এর মতানুসারে খোশা ছাড়া রসুন চৌদ্দ তোলা, আদা চৌদ্দ তোলা, কাবুল বাদামের শাঁস সাত তোলা, দন্ত উৎপলের গাছের মূলের রস সাড়ে তিন তোলা, মুরগির ডিম আটটি, গরুর ঘি চৌদ্দ তোলা, কাশির চিনি চৌদ্দ তোলা। এসব দ্রব্য এক সঙ্গে পাক করে হালুয়া তৈরি করে ভাগমত চব্বিশ দিন খাবে। হালুয়া খাওয়ার পরে এক পোয়া গরম গরুর দুধ পান করবে। চল্লিশ দিন অম্ল, পঁচা মাছ, বাসি ব্যঞ্জন খাবে না, স্ত্রী সহবাস করবে না। এরূপ নিয়ম মেনে চলতে পারলে সাধু, ফকির, হাকিমগণ বলেন, শরীরে চল্লিশজন পুরুষের বলে বলিয়ান হবে এবং তার যৌবন আশি বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এর মত যৌবন সুখ সম্ভোগ করা দাওয়া পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

কুওতেবাহ রতিশক্তি বৃদ্ধির উপায়

১। সাধু ফকিরগণ বলেছেন, যারা স্ত্রী সহবাস-প্রিয় এরা রতিশক্তি বৃদ্ধি না করলে ক্রমেই দুর্বল হয়ে শয্যাগত হবে। তাদের উচিত এ তদবীর গ্রহণ করা। যথা– বাবলার ছাল এক ছটাক, বাবলার আঠা এক ছটাক, বাবলার পাতা এক ছটাক, বাবলার ফুল এক ছটাক। এসবগুলো ছায়াতে শুকিয়ে গুঁড়া করে এর সাতগুণ মিছরীর সাথে মিশ্রিত করে দৈনিক একতোলা পরিমাণ নিয়ে গরম গো-দুগ্ধের সাথে একুশ দিন খাবে, শরীরে যথেষ্ট ক্ষমতা ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হবে।

২। শিমূল মূল আর গাব। এদু'টিকে ছুরিতে পাতলা চাকা চাকা করে তুসায় গেঁথে ছায়াতে শুকাবে। রীতিমত শুষ্ক হলে এটা কুটে ছেকে কাশি চিনি মিশ্রিত করে এক তোলা পরিমাণ চল্লিশ দিন খাবে। ঔষধ সেবনের পর আধাসের নতুবা এক পোয়া গরম বকরীর দুধ কিংবা গরুর দুধ পান করবে। এতে শাহওয়াত বেশি ও রতিশক্তি বলবতী হয়।

ফল বীর্য বর্ধক হালুয়া

মেথী ৩০০ গ্রাম, শুঠ ৭৫ গ্রাম, শতাবরী ৭৫ গ্রাম, মরিচ ২০ গ্রাম, গরুর ঘি ২০০ গ্রাম, চিনি ১ কিলোগ্রাম, দুধ ২ কিলোগ্রাম নিতে হবে। তারপর শুঠ, শতাবরী ও মরিচ ভালোভাবে চূর্ণ করে পরিস্কার কাপড়ে ছেকে নিবে। তারপর উনুনে পাত্র চাপিয়ে দুধ ঢেলে দিতে হবে। উক্ত দুধ ঘন হয়ে উঠলে তাতে উক্ত চূর্ণগুলো ঢেলে দিয়ে এমনভাবে নাড়তে হবে যাতে বসে না যায়। যখন এক কিলো থাকবে, তখন তাতে চিনি ঢেলে দিয়ে ফোটাবে। আধা কিলো হলে তাতে ঘি ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকবে। নাড়তে নাড়তে যখন একদম গাঢ় হয়ে যাবে, তখন নামায়ে ১০-১২ গ্রাম করে এক একটা বড়ি বানাবে। অতঃপর প্রতিদিন দুপুরে একটি করে বড়ি সপ্তাহ তিনেক সেবন করলে স্বপ্নদোষ, শীঘ্রই পতন, বয়স বৃদ্ধির কারণে রতিহীনতা, কোমরের বাতবেদনা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, অগ্নিমন্দা, বদহজম, মাথা যন্ত্রণা প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। নারী-পুরুষ সকলেই সেবন করতে পারবে।

সাবধান ঃ ডিমের হালুয়া কেবল শীতকালেই ব্যবহার করবে। গরমকালে কখনই ব্যবহার করবে না।

শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ ঔষধ

যদি কোনো যুবক বা বৃদ্ধের শুক্র ক্ষয়জনিত কারণে ইন্দ্রিয় দুর্বল হয়ে যায় বা বিভিন্ন বদ অভ্যাসের কারণে নপুংশকতা নেমে আসে, সেসব অবস্থায় নিম্নোক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করলে আশাতীত ফল পাবে।

যেভাবে বানাতে হবে ঃ কালো মরিচ ১ গ্রাম, দ্বারচিনি আধা গ্রাম, চিনি ২০০ গ্রাম, ছোট এলাচ ১ গ্রাম, নাগেশ্বর ১ গ্রাম, শুঠ ১ গ্রাম, পিপুটুল ১ গ্রাম, গরুর ঘি ১ গ্রাম, মিষ্টি দধি ২০০ গ্রাম ও মধু ১৫ গ্রাম নিবে।

উপরোক্ত ঔষধগুলো ভালোভাবে গুঁড়া করে ছেকে নিতে হবে। তারপর চিনি, মধু, দধির সাথে মিশিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। তারপর এই ঔষধ ৫০ গ্রাম পরিমাণ গরম ভাতের সাথে মিশিয়ে খেলে সহসা বীর্যপাত হবে না। কবিরাজী মতে একে একটি শ্রেষ্ঠ বাজিকরণ ঔষধ বলা হয়েছে।

মোরগের হালুয়া

জোয়ান ও ডাগর একটি মোরগ জবেহ করে সিদ্ধ করার পর তার মাংস পাটায় পিষবে। তারপর এক সের মিছরীর শিরার মধ্যে আধা পোয়া পরিমাণ মধু, এক পোয়া পরিমাণ ভালো ঘি গোশতের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে জাল দিবে এবং নাড়তে থাকবে। পাক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে গোল মরিচ ৮০টি, তোলাছোলা আধা তোলা, এলাচি আধা তোলা, যাত্রিক আধা তোলা ও জাতিফল চার তোলা গুঁড়া করে গোশতের মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে মিশাবে। প্রতিদিন সকালে এক ছটাক পরিমাণ খাবে। অল্প দিনের মধ্যেই বলশক্তি ও মর্দামী শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

শক্তিহীন ব্যক্তির জন্য ফুরাতে নওজোয়ান হালুয়া

যেভাবে বানাতে হয় ঃ তাল মাখনা, তিলের শাঁস, তিশির শাঁস, তুলা গাছের মূল। এসব গুঁড়া করবে। তবে প্রত্যেকটির পরিমাণ এক পোয়া করে হতে হবে। কাঙ্গল প্রত্যেকটি দুই তোলা করে, দ্বারচিনি, কাবাব চিনি, জাতি ফল ও আকর করা এক তোলা, ভালো ঘি আধা সের, চিনি এক সের, লং এলাচি, যাত্রিক, বহু, প্রতিটি এক তোলা। মিছরি এক সের ও দুধ আড়াই সের পরিমাণ নিতে হবে।

যেভাবে তৈরি করবেন ঃ

তিষির শাঁস ও তিলের শাঁস বের করে বাটবে। বাদাম বিনা পানিতে বাটবে। তার পর তাল মাখনা কুটে মিহিন করে গুঁড়া করবে। এর পর তুলার মূল গুঁড়া করে ছালেম মিশ্রি দুধের মধ্যে ভিজাবে। এবার উক্ত ছয় পদ তিষি, তিল, তাল মাখনা, ছালেম মিশ্রি, বাদাম, তুলার মূল আড়াই সের গরুর দুধের সাথে চিনি মিশ্রি দিয়ে সিরা বানাবে। এমনভাবে সিরা বানাবে যাতে লাসাযুক্ত হয়। যখন তা পরিপূর্ণ লাসাযুক্ত হবে, তখন তিলের শাঁস ও তিষির শাঁস তার পর বাদাম ও ছালেম মিশ্রি, তুলার মূল, তাল মাখনা দিয়ে ভালোভাবে মিশাবে। সবগুলো দেয়ার সময় ভালোভাবে নাড়বে এবং ভালোভাবে মিশাবে। মনে রাখতে হবে যে, যখন হালুয়া জালে চড়াবে তখন মসল্লার গুঁড়া ঘি-এর মধ্যে ভিজিয়ে রাখবে এবং দুই হতে আড়াই তোলা পরিমাণ দৈনিক সকালে খালি পেটে খাবে। দেখতে পাবে যে, অল্প দিনের মধ্যে শারীরিক শক্তি ও মর্দামী শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা

ধ্বজভঙ্গ রোগ ভয়ানক কঠিন পীড়া; যে পুরুষের ধ্বজভঙ্গ হয়েছে, তার মনে সর্বদাই চিন্তা। ধ্বজভঙ্গ হলে সংসার তার পক্ষে অসার হয়ে পড়ে, স্ত্রী সহবাসেও পুত্রের মুখ দর্শনে বঞ্চিত হতে হয়। সে ভাবনা চিন্তায় ক্রমে নিরাশার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। পুরুষের পক্ষে ধ্বজভঙ্গ কি কঠিন ভয়ঙ্কর রোগ যে তা বর্ণনা করা অসম্ভব। ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ-ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, পুরুষত্বহীন, স্ত্রী গমনে অক্ষমতা, শরীরের দুর্বলতা পরিদৃশ্য হয়। এজন্য এ রোগের তদবীর শুরুতে করতে হয়। রোগ পুরাতন হয়ে পেকে গেলে বহুদিন তদবীর করলে তবে হয় তো ভালো হয়। নতুবা সকল তদবীর নিস্ফল হয়ে যায়। এজন্য ইউনানী হাকিমগণ ধ্বজভঙ্গ রোগের তদবীর শীঘ্র শীঘ্র করতে বলেন। অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, হস্ত মৈথুন ও বেশ্যাগমনে এসব রোগ হয়ে থাকে।

ধ্বজভঙ্গের তদবীর

১। জিরাকেরমানী, সোওয়াবাকেলা, চিনি এগুলো পিষে জৈএন তৈল আর বাবুনার তেলে মিশ্রিত করে মলম তৈরি করবে। এরপর ঐ মলম অল্প আগুনে

গরম করে প্রলেপ দিয়ে পট্টি বেঁধে রাখবে।

২। আনারের পাতা এক তোলা, মেহদির পাতা এক তোলা, নিম পাতা এক তোলা, সোডা এক তোলা, এক সঙ্গে মিশ্রিত করে ফাকি করে খাবে।

৩। মাকাল ফলের শাস সাতবার পানিতে ধৌত করে আধা পোয়া আটার সাথে দুই ছটাক চিনি দিয়ে হালুয়া প্রস্তুত করে দৈনিক সকালে এক তোলা পরিমাণ সেবন করবে।

৪। প্রথমে পরিমাণমত একটা পান নিবে। উক্ত পানে খাঁটি ঘি মাখিয়ে আগুনে গরম দিব। পান গরম গরম অবস্থায় লিঙ্গে পেচিয়ে বেঁধে রাখবে এবং সকালে খুলে ফেলবে। কমপক্ষে এভাবে ২১ দিন বাঁধবে এবং সকাল বেলা খুলে ফেলবে। এতে অবশ্যই লিঙ্গের উত্তেজনা শক্তি ফিরে আসবে। এ সময় সকাল বেলার ভিজানো ছোলাবুট ও মাখন এবং পুষ্টিকর খাবার নিয়মিত খাবে।

৫। যে সব আমে বীজ হয়েছে কিন্তু আটি হয় নি, এরকম আম ছোট ছোট করে কেটে রোদে শুকিয়ে গুঁড়া করে ভালোভাবে ছাকবে। উক্ত গুঁড়া এক তোলা পরিমাণ সমপরিমাণ আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে এক সপ্তাহ সকালে খালি পেটে সেবন করলে যাবতীয় ইন্দ্রীয় দোষ ভালো হয়ে যাবে।

৬। শতমূলী দুই তোলা, দুধ ষোল তোলা ও পানি চোষট্টি তোলা একত্রে আগুনে জাল দিয়ে ষোল তোলা থাকতেই নামাবে। এক তোলা পরিমাণ ঔষধ নিয়ে দুই থেকে তিন চামচ চিনি মিশিয়ে সেবন করবে। এ ঔষধ বছরে একবার ব্যবহার করা চলে। এ ঔষধ সেবন করলে কোনো ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হতে পারে।

৭। যারা যৌন ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন, পুরুষাঙ্গ দুর্বল বা নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাদের জন্য একটি চমকপ্রদ ঔষধ হলো, একটি পাকা বেল ভাঙ্গার পর ভিতরে কতগুলো লম্বা লম্বা আঠাল কোষ পাওয়া যাবে। আমরা তাকে বিচি বলে জানি। উক্ত বিচি মূল আঠার সাথে সমপরিমাণ পাকা সবরি কলা নিয়ে ভালোভাবে চটকায়ে পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে একটি পান দিয়ে লিঙ্গ পেচিয়ে দৈনিক দুই ঘন্টা বেঁধে রাখবে। এভাবে তিন থেকে চার সপ্তাহ ব্যবহার করলে দুর্বল পুরুষাঙ্গ অতি তাড়াতাড়ি সতেজ ও সবল হয়ে উঠবে।

৮। চল্লিশটি খোরমা ফল দানা ফেলে আধা সের পরিমাণ ঘি-এ ভেজে আধা সের মধুতে ভিজিয়ে একটি কাঁচের বৈয়ামে রাখবে। দৈনিক সকালে ১টা

করে ঐ খোরমা খেলে ধ্বংভঙ্গ রোগ আরোগ্য হবে।

৯। আফুলা শিমুল গাছের মূলের ছাল বাতাসে শুকিয়ে চূর্ণ করে ১ ছটাক পরিমাণ মধুর সাথে মেখে সমপরিমাণ ১৭টি বটিকা বানাবে। দৈনিক সকালে ১টি করে বটিকা ঠাণ্ডা পানির সাথে সেবন করলে ধ্বংভঙ্গ রোগ আরোগ্য হবে।

১০। দৈনিক একটি করে কবুতরের বাচ্চা, লঙ্কা ছাড়া সামান্য গরম মস্‌লা ও লবন মেখে ঘি-এ ভেজে রাতে শয়নকালে ভক্ষণ করবে। ২ থেকে ৩ সপ্তাহ নিয়মিত তা ভক্ষণ করলে ধ্বজভঙ্গ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হবে।

স্বপ্নদোষ হতে মুক্তির উপায়

ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে শুক্রপাত হলে তাকে স্বপ্নদোষ বলে। এ পীড়া যৌবনাবস্থায় হয়ে থাকে। হয়ত কারো দিন বা রাতের মধ্যে দু'তিনবার স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। এতে অধিকাংশ শুক্রপাত হয়ে শরীরকে দুর্বল করে ফেলে। সেজন্য ঐ রোগের শীঘ্র তদবীর করা আবশ্যক। শরীরে এরূপ রোগ থাকলে পুরুষ কখনই সংসারে পত্নী নিয়ে সুখ-সম্ভোগ করতে পারে না।

১। কাবাবচিনি ও মকরধজ একসাথে মিশিয়ে চিনি সহযোগে সাতদিন ব্যবহার করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

২। দৈনিক সকালে কবুতরের গম সমান পরিমাণ ইছবগুলের ভূষি সেবন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

৩। সকাল বেলা এক ছটাক পরিমাণ ধনিয়া ভালোভাবে কচলিয়ে এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রাখবে। রাতে শয়নকালে উক্ত পানি ছেকে ২ চামচ চিনি দিয়ে শরবতের মত বানিয়ে পান করবে। এতেও স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৪। আধা তোলা ধনিয়ার গুঁড়া, ২ চামচ মধুসহ সকালে নিয়মিত সেবন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৫। রাতে শয়নকালে লিঙ্গে ওলিভয়েল তৈল মালিশ করে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

৬। চার আনা পরিমাণ অশ্বগন্ধা চূর্ণ করে রাতে ঘুম যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে কাঁচা দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করে ঘুম গেলে ইনশাআল্লাহ্ আর কোনোদিন স্বপ্নদোষ হবে না।

৭। শনিবার অথবা মঙ্গলবার রাত্রি বেলা শশ্মানঘাটের ধুতরা গাছের মূল

অর্থাৎ শিকড়, কোমরে বেঁধে রাখলে আর কোনোদিন স্বপ্নদোষ হবে না।

৮। রাতে শোয়ার সময় ভালোভাবে মুখমণ্ডল কান পর্যন্ত, হাত বগল পর্যন্ত এবং পা হাটু পর্যন্ত এমনকি গলাও উত্তমরূপে ধৌত করে ঘুমাবে।

৯। মাত্রাতিরিক্ত চা ও সিগারেট সেবন না করা।

১০। রাতে বেশী পরিমাণ খানা খাওয়া উচিত নয়। অধিক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নিয়মিত আহার ও নিদ্রা যাওয়া উচিত।

১১। জৈএনের তেল পুরুষাঙ্গ মালিশ করে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ হয় না। একখণ্ড শিশা পুরুষাঙ্গের মূলদেশে বেঁধে রাখলেও শুক্রপাত হয় না।

স্বপ্নদোষ হতে মুক্তির তদবীর

দুই তোলা চিনি ভালোভাবে গুঁড়া করবে। তারপর সিকি তোলা পরিমাণ আফিম ভালোভাবে মিশিয়ে দুই রত্তি পরিমাণ অর্থাৎ প্রতি তোলায় ৪৮টি করে বড়ি তৈরি করবে। অতঃপর প্রতি রাতে শয়নকালে একটি করে বড়ি এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করবে। আল্লাহ্ চাহে তো অচিরেই স্বপ্নদোষ হতে রক্ষা পাবে।

১। প্রত্যেক দিন ভোর বেলা কৈতরগম কিংবা ইছবগুলের ভূষি এক গ্লাস সরবত বানিয়ে নিয়মিত সেবন করলে স্বপ্নদোষ রোগ ভালো হয়ে যাবে।

২। রাতে শয়ন করার কিছু পূর্বে দুই রতি পরিমাণ কর্পুর সোয়া আনা পরিমাণ চিনির গুঁড়া এবং আধা রতি পরিমাণ আফিম একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়মিত সেবন করলেও স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

অধিক স্বপ্নদোষের কারণে ধাতু পাতলা হলে

অধিক স্বপ্নদোষের কারণে কারো ধাতু বা বীর্য পাতলা হয়ে গেলে নিম্নোক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করবে।

সালাম মিছরী ২০০ গ্রমা, শ্বেত মুসরী ১০০ গ্রাম, সকাকুল মিছরী ২০০ গ্রাম, কালো মুসরী ১০০ গ্রাম, সিংঘাড়ের আঠা ৫০ গ্রাম ও চিরিডাল চূর্ণ ৫০ গ্রাম। এগুলো চূর্ণ করে পরিস্কার কাপড়ে ছেকে নিতে হবে। তারপর ঐ চূর্ণগুলো ৩ কিলো গরুর দুধে মিশিয়ে অল্প আঁচে ফুটিয়ে গাঢ় করতে হবে। তারপর ৫০০ গ্রাম গরুর ঘি ও ৭৫০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে আরো কিছুক্ষণ আগুনে ফুটাতে হবে। অতঃপর যখন খুব ঘন বা একটু শক্ত হবে, তখন একটি

কাঁচের পাত্রে রেখে দিতে হবে।

প্রতিদিন সকালে ও রাতে ১০ গ্রাম করে সেবন করতে হবে। খাওয়ার পরে কম করে হলেও ২৫ গ্রাম পরিমাণ হালকা গরম মিছরী মিশানো দুধ পান করতে হবে। এভাবে নিয়মিত খেতে পারলে নপুংশকতা তাড়াতাড়ি দুর হয়ে যাবে।

ছিবলিস রোগ

ছিবলিস এটি বিষাক্ত সংক্রামক রোগ বিশেষ। এ রোগ সাধারণত বেশ্যা রমনীদের সাথে সহবাস করলে হয়ে থাকে।

এ রোগের লক্ষণ ও তার চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় পুরুষাঙ্গের মাথায় ক্ষুদ্র বীচির মত দেখা যায়। কয়েকদিনের মধ্যে বীচিগুলো বড় হয়ে ফেটে যায় এবং ক্ষতে পরিণত হয়। এই ক্ষত হতে রস নির্গত হতে থাকে এবং এ রস এতই বিষাক্ত, যেখানে লাগবে, সেখানেই ক্ষতের সৃষ্টি হতে থাকে। এ রোগ হলে জনন্দ্রিয়ে খুব যন্ত্রণা হয়। তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে পুরুষাঙ্গ পচে গলে যেতে পারে। ভাগ্য ভালো হলে দুই থেকে তিন সপ্তাহ চিকিৎসার দ্বারা ভালো হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা ঃ প্রথমে নিমপাতা সিদ্ধ করে ঐ পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ভালোভাবে পরিস্কার করবে। তারপর নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করবে।

যেভাবে ঔষধ বানাতে হবে ঃ কলিমা, পাপড়ি, খয়ের, কর্পুর, ৩-৪ বছরের পুরাতন শুপারী, তুতিয়া, পাড়া, ছোট এলাচি খোসাসহ ও মোর্দ্ধার সিং। এগুলো সমপরিমাণ নিয়ে গুঁড়া করে নিতে হবে। পরে ভালোভাবে ছেকে নিয়ে গুরুর দধি মিশিয়ে কাসার পাত্রে হাতল দ্বারা নাড়াচাড়া করবে। যখন বড়ি বানানোর উপযুক্ত হবে তখন একটি ছোলা বুটের পরিমাণ বড়ি বানাবে। উক্ত বড়ি একটি করে সকালে এবং রাতে শয়নকালে সেবন করবে এবং অল্প পানিতে গুলিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাবে। তাতে আতশ রোগ ও মেহ রোগ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ছিবলিস রোগের ঘায়ের মলম

কমিলা ৮ মাশা, হিঙ্গুলে ২ মাশা, গেলে আরমনি ২ মাশা, পোড়াতুতিয়া ২

মাশা, পাপড়ি খয়ের আধা মাশা, শ্বেতধূপ ৬ মাশা, গরুর ঘি ২ তোলা, খাঁটি মোম ৬ মাশা। এগুলোকে মিশিয়ে ভালোভাবে চূর্ণ করতে হবে। সাদা কাপড়ে ভালোভাবে ছেঁকে নিবে। তারপর একটি পাত্রে ঘি দিয়ে আগুনে চড়ায় দিয়ে পরিমাণ মতো মোম দিয়ে জাল দিতে হবে। যখন মোম আর ঘি গলে এক হয়ে যাবে, তখন অন্যান্য ঔষধগুলো মিশিয়ে ভালোভাবে মলম বানাবে। এর পর যে কোনো পাত্রে রেখে দিবে। দৈনিক কমপক্ষে দু'বার ক্ষতস্থানে ব্যবহার করতে থাকলে আস্তে আস্তে ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাবে। সকলকে যৌনমিলনে বেশ্যা নারী গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বাঁচানো অতিব জরুরী।

মূত্র নালীতে ক্ষত হলে করণীয়

মিঠা ইন্দ্রজব, জিরারেয়ন্দ চিনি, বড় এলাচির দানা প্রতিটি পদ চার আনা পরিমাণ ও আধা তোলা সোনাপাতা, কাশির চিনির চার তোলা একত্রে চূর্ণ করে ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া নিয়ে নিতগুণ পানি মিশ্রিত দুধ মিশিয়ে সেবন করলে ইনশাআল্লাহ্ ধীরে ধীরে ক্ষত ভালো হয়ে যাবে।

বহুমূত্র রোগ ও তার প্রতিকার

যদি কারো বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়, তাহলে নিম্নোক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ্ রোগ দুর হয়ে যাবে।

১। সোয়া তোলা পরিমাণ পুরাতন জামের বীচি খোসা ছাড়িয়ে পিষবে। ঠাণ্ডা পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন সকাল বেলা পান করলে। এভাবে নিয়মিত পান করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ্ তার রোগটি ভালো হয়ে যাবে।

২। যজ্ঞডুমুর এক তোলা পরিমাণ ও এক চামচ খাঁটি মধুসহ দৈনিক সকাল ও রাতে নিয়মিত সেবন করলে বহুমূত্র রোগ ভালো হয়ে যাবে।

৩। খাঁটি মধু দুই চামচ ও গুলঞ্চের গুঁড়া এক চামচ উত্তমরূপে মিশিয়ে সকালে এবং রাতে সেবন করবে। এভাবে নিয়মিত সেবন করলে বহুমূত্র রোগ ভালো হয়ে যাবে।

৪। প্রত্যেকদিন রাতে শয়নকালের কিছু পূর্বে আধা ছটাক পরিমাণ চুনের পানি সেবন করলে ঘোলা পেশাব পরিস্কার হয়ে যাবে।

৫। খাবারে পর আধা গ্লাস পরিমাণ পানি নিয়ে তাতে একটি কাগজী লেবুর রস ও তিন আঙ্গুলের এক চিমটি খাবার সোডা মিশিয়ে পান করলে,

বহুমূত্র রোগ আরোগ্য হয়। ঘোলা ও হলদে পেশাব হলেও তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। নিয়মিত সেবন করলে মেহ প্রমেহ রোগ থাকলেও তা ভালো হয়ে যায়।

৬। দৈনিক সকাল-বিকাল ২টি করে সাগর কলা অথবা কাঠালী কলা নিয়মিত খেলেও বহুমূত্র রোগ ভালো হয়ে যায়।

৭। কাঁচা আমলকীর রস, আধা ছটাক হরিদ্র চূর্ণ আধা তোলা ও দুই তোলা মধুসহ ভালোভাবে মর্দন করে প্রতিদিন সকালে সেবন করলে মেহ প্রমেহ রোগ ভালো হয়ে যায়। এভাবে ২১ দিন সেবন করবে।

৮। প্রবহ এক তোলা, এক পোয়া দুধের সাথে মিশিয়ে আগুনে জ্বাল দিবে। দুধ যখন শুকিয়ে যাবে। তখন পরিমাণ মতো মধু দিয়ে ভালোভাবে চটকিয়ে ৭টি বড়ি বানাবে। প্রতিদিন সকাল বেলা খালি পেটে একটি করে সাত দিন ৭টি সেবন করলে মেহ প্রমেহ রোগ হতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে।

৯। বড় ডুমুরের বীজ এক তোলা, সামান্য পানিসহ দৈনিক সকাল বেলা খাইলে বহুমূত্র রোগ ভালো হয়ে যাবে।

১০। গাঁদা ফুলের পাতার রস এক তোলা, অড়হড় পাতার রস দুই তোলা সকালে খালি পেটে সেবন করবে। এভাবে কিছুদিন নিয়মিতভাবে সেবন করলে বহুমূত্র রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

অণ্ডকোষ বড় হলে করণীয়

পুরুষের অণ্ডকোষের প্রদাহও এক প্রকার জটিল ও কঠিন রোগ। এ রোগ যাকে পেয়েছে সেই কেবল বুঝতে পারে এর যন্ত্রণা কি। তবে হ্যাঁ আপনাকে আর ভাবতে হবে না, যদি জানা থাকে এ রোগের চিকিৎসা। এ রোগটি কেন হয়, সেটি আগে জানতে হবে। সাথে এটাও জানতে হবে যে, এ রোগকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

পুরুষের অণ্ডকোষের উপর একটি পর্দার মতো ঝিল্লি থাকে, এটি হঠাৎ কড়া হয়ে কুঁচকে যায়। যার উপর দিয়ে অণ্ডকোষের রক্তবাহি শিরাগুলো নালিকাগুলোর ভিতর এসে পড়ে। ফলে অণ্ডকোষে বেদনা দেখা দেয়। আবার হঠাৎ করে বেদনা কমেও যায়। এর কিছু দিনের মধ্যে ঝিল্লিতে পানি নামতে শুরু করে। একেই বলে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি।

এ রোগটি হওয়ার কারণ ঃ যদি হঠাৎ অণ্ডকোষে আঘাত লাগে, আবার

যদি অত্যাধিক পরিমাণে সাইকেল চালায়। আবার গোদ রোগের জীবাণু প্রবেশ করলেও এ রোগ দেখা দিতে পারে।

এ রোগ থেকে মুক্তির দিশা

১। খোরা সানী বচ ৩০ গ্রাম, শুঠ ২০ গ্রাম ও সালেম মিছরী ৮ গ্রাম। উক্ত ঔষধগুলো গরুর দুধ দিয়ে ভালোভাবে বাটবে এবং সে বাটা ঔষধ তিন সপ্তাহ অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে ইনশাআল্লাহ্ উপকার হবে।

২। চিরতা ১ গ্রাম, ধনিয়া ১ গ্রাম, লবণ আধা গ্রাম ও সোনা মছলী ৪ গ্রাম। উক্ত ঔষধগুলো সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করে ভালোভাবে ছাকবে। তারপর ১০ গ্রাম মিছরী গুঁড়া করে একত্রে ৫ গ্রাম চুনের সাথে ৫ গ্রাম মধু মিশিয়ে দৈনিক একবার চেটে খেতে হবে। এতে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি রোগে মারাত্মক উপকার পাওয়া যাবে।

৩। রক্ত চন্দন ১০ গ্রাম, মহুয়া পল ১০ গ্রাম, কমলা সট্টা ১০ গ্রাম, খস ১০ গ্রাম ও পদ্মের গেড় ১০ গ্রাম।

উক্ত ঔষধগুলো গরুর দুধের সাথে ভালোভাবে পিষে অণ্ডকোষে একমাস প্রলেপ দিলে ইনশাআল্লাহ্ অণ্ডকোষ রোগ হতে মুক্তি পাবে।

একশিরা রোগের ঔষধ

১। আফুলা চালিতা গাছের দক্ষিণ দিকের শিকড় তলে মাদুলির মধ্যে ভরে কোমরে ধারণ করলে একশিরা রোগ আরোগ্য হয়।

২। আফুলা শিশুল গাছের একটি বড় কাঁটা তুলে তার মুখ কেটে ছিদ্র করে কোমরে ধারণ করলে একশিরা রোগ আরোগ্য হয়।

৩। মুসব্বর পানিতে ফুটায়ে আঠা হলে তা অণ্ডকোষে প্রলেপ দিবে। সাত থেকে আট দিন এরূপ প্রলেপ দিলে একশিরা রোগ আরোগ্য হয়।

কয়েকটি মেয়েলী রোগের ঔষধ

মেয়েলোকের সাধারণত যে সব রোগ ব্যাধি অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে, তন্মধ্যে প্রদর, রক্ত প্রদর, সুতিকা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব প্রভৃতি। নিম্নোক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ্ মুক্তি পাবে।

১। আমলকির বীচি পাঁচ থেকে সাতটি ভালোভাবে বেটে এক চামচ

মধুসহ এক সপ্তাহকাল সেবন করলে শ্বেতপ্রদর ভালো হয়।

২। আমকুসির গুঁড়া ও পাকা চাপা কলা এবং পরিমাণমতো দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করলে প্রদর রোগ ভালো হয়।

৩। বাসক পাতার রস তিন চামচ পরিমাণ ও সমপরিমাণ চিনি মিশিয়ে ২১ দিন পর্যন্ত সেবন করলে রক্ত প্রদর হলে তা ভালো হয়ে যাবে।

৪। জবা ফুলের কুড়িসহ ৫ বা ৭টি, চাপানটের শিকড় বেটে ৭ কিংবা ১৪ দিন সেবন করলে রক্ত প্রদর ভালো হয়।

৫। আখের মূল ও কার্পাসের মূল গুঁড়া করে ৭দিন সেবন করলে সুতিকা রোগ ভালো হয়।

৬। বেনমূল, ক্ষেতপাপা, ঘুলঞ্চ, পলতা, ধরে, যইন, হরিদ্র ও রক্ত চন্দন সমপরিমাণ নিয়ে রাতে ভিজিয়ে রাখবে এবং সকালে খালি পেটে নিয়মিত সেবন করলে সুতিকা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৭। পুরাতন পুদিনা গাছের মূল পিশে নিয়মিত একুশ দিন সেবন করলেও সুতিকা রোগ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

যে কোনো প্রদর রোগ হলে নিম্নোক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করুন

খরোটি ৩৫ গ্রাম, কুঁচ বীজ ২৫ গ্রাম, পিপুল চূর্ণ ১০ গ্রাম, তালমাখনা ৫ গ্রাম, মিছরী চূর্ণ ৩৫ গ্রাম ও কিসমিস চূর্ণ ৩৫ গ্রাম। উক্ত উপদানগুলো একদিন পানিতে ভিজিয়ে রাখবে। এরপর ১০ কিলোগ্রাম পানিতে সিদ্ধ করে পানি শুকিয়ে ৩ কিলো থাকতে নামিয়ে ছাঁকবে। অতঃপর এ পানির সাথে খাঁটি গরুর ঘি ৫০০ গ্রাম দিয়ে পুণরায় ফোটাতে হবে।

পানি শুকিয়ে যখন কেবল ঘি থাকবে, তখন নামিয়ে তাতে ১০ গ্রাম বংশলোচন চূর্ণ এবং ৫ গ্রাম শিলাজুত চূর্ণ মিশিয়ে একটা শিশিতে ভরে রাখবে। এবার ঐ ঔষধ সেবনের পর ৫ গ্রাম করে খেতে হবে। নিয়মিত ভাবে ২১ দিন পর্যন্ত খেতে হবে। পুরুষের সর্ব প্রকার রোগের উপকার হয়। মেয়েদের সর্বপ্রকার রোগের উপকারী হয়ে। এমনকি যাদের সন্তানাদি হয় না তারাও পুত্র সন্তান লাভ করবে।

সুতিকা রোগের চিকিৎসা

১। কচি বেল, ডালিম গাছের ছাল, ডালিমের খোসা ও কুটরাজের চাল

প্রতিটি এক ছটাক পরিমাণ নিয়ে এক সের পানিতে সিদ্ধ করে এক পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেকে নিবে। তা আধা ছটাক মাত্রায় প্রত্যেহ তিনবার সেবন করলে, সর্বপ্রকার সুতিকা রোগ আরোগ্য হয়।

২। গুলঞ্চ পিপুল ক্ষেপাপড়া, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর ও আদ্য প্রত্যেকটা এক ছটাক হিসেবে দুই সের পানিতে সিদ্ধ করে আধা সের থাকতে নামিয়ে এক কাচ্চা মাত্রায় দৈনিক তিনবার সেবন করলে, সুতিকা রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

৩। ধনে, বড় মূলা, ক্ষেতপাপড়ি-এগুলি একত্র করে সিদ্ধ করার পর কাথ সেবন করবে।

৪। বৃহতী, গোক্ষুর, কণ্টিকারী, আদা একত্রে চূর্ণ করে এদের কাথ মধুসহ সেবন করবে।

৫। পিপুল চূর্ণসহ ঝিন্টির কাথ সেবনীয়।

৬। গুলঞ্চ আদার সিদ্ধ কাথ মধু বা চিনি দিয়ে সেবন করবে।

সহজে প্রসব করান

১। **প্রসবের অন্তত ঃ** এক মাস আগে হতে নিয়মিতভাবে গর্ভবতীকে দুধ পান করাবে।

২। পুঁই শাকের শিকড়ের রস নিয়ে তিলের তেল সহ মিশ্রিত করে যোনীতে দিলে সহজে প্রসব হতে পারে।

৩। বাসকের শিকড় কটিদেশে যদি বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে সহজে প্রসব হবে।

৪। বট ও পিপুল-এর শিকড় পানিসহ পেষণ পূর্বক পেটে প্রলেপ দিবে।

৫। কসজর সাথে গৃহঝুল পিষে খাওয়াবে।

অতি তাড়াতাড়ি প্রসব হওয়ার তদবীর

দুই পাতাওয়ালা তেঁতুল চারা শিকড়সহ তুলে যদি প্রসূতির মাথার চুলে বেঁধে রাখে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব হবে। কিন্তু সাবধান! সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ঔষধটি ফেলে দিতে হবে। নতুবা অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

গর্ভরক্ষার প্রথম তদবীর

যে গর্ভবতী নারীর চার, পাঁচ ও ছয় মাসের গর্ভপাত হয়ে সন্তান নষ্ট হয়, তা রক্ষা না করলে স্ত্রীলোককে কঠিন মর্ম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। গর্ভের সন্তান রক্ষার জন্য নারীরা কালো সুতায় এগারো বার সুরা মুয্যাম্মেল পড়ে এগারটি গিরা দিবে এবং সে সুতা কোমরে রাখলে কখনই গর্ভপাত হয়ে সন্তান নষ্ট হবে না। এটা পরীক্ষিত আমল।

গর্ভরক্ষার দ্বিতীয় তদবীর

যেসব নারীর গর্ভের সন্তান পড়ে, গর্ভের সন্তান অকালে নষ্ট হয়ে যায়, তজ্জন্য শনিবার কি মঙ্গলবার রাতে একটা রক্তবর্ণ বিছা (বৃশ্চিক) মেরে শূন্যে তিন দিবারাত লটকিয়ে রাখবে। আবার শনিবার কিংবা মঙ্গলবার উক্ত বিছার তিনটি পা একটি তামার মাদুলিতে ভরে কোমরে রাখলে আর গর্ভপাত হবে না; কিন্তু সন্তান প্রসবের পর তা খুলে রাখবে।

বন্ধ্যা নারী চেনার উপায়

বন্ধা মহিলা চিনার যতগুলো উপায় রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো- রসুনের এক চতুর্থাংশকে এক টুকরো তুলার সাথে পেঁচিয়ে জরায়ুর মধ্যে সাত-আট ঘন্টা রাখবে। অতঃপর যদি তার মুখ থেকে রসুনের গন্ধ আসে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এ মহিলা সন্তান জন্ম দেয়ার সম্ভবনা আছে। আর যদি তার মুখ থেকে রসুনের গন্ধ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে তার দ্বারা সন্তান হওয়ার সম্ভবনা নেই।

বন্ধ্যা বা বাঁজা নারীর সন্তান লাভের ঔষধ

১। ঋতুস্রাব হতে পাক-পবিত্র হওয়ার পরদিন হতে পরপর তিনদিন সকালে গোসল করে পুনরায় ঋতুস্রাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এক তোলা আদার রস, এক তোলা মধু ও সাতটি গোল মরিচ চূর্ণ করে একত্রে মিশিয়ে সেবন করলে ইনশাআল্লাহ্ বাঁজা নারীও সন্তান লাভ করবে।

২। শিমুল গাছের আঠা এক তোলা, বড় এলাচ এক তোলা, রুমি মুস্তকি এক তোলা, তেঁতুল দুই তোলা ও দারচিনি পাঁচ তোলা। এগুলো একত্রে পিষে

দৈনিক সকালে স্বামী এক তোলা ও স্ত্রী এক তোলা পরিমাণ নিয়মিতভাবে ৪০ দিন পর্যন্ত সেবন করলে ইনশাআল্লাহ্ বাঁজা নারীও সন্তান লাভ করবে।

গর্ভ পরীক্ষা

হাকিম মহাত্মা জালিনুস নিজের 'হেকমত' কিতাবে লেখেন–যদি কোনো নারী তার পেটে গর্ভ আছে কিনা তা জানতে চায়, তাহলে তাকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম হেকমত ঃ রাতে ঘুমানোর পর ভোর সকালে সর্বপ্রথম যে পেশাব করবে, সে পেশাব পরীক্ষা করে দেখবে। এরজন্য একটি পরিস্কার পাত্রে পেশাব করবে। সে পেশাবে যদি সরু সরু সুতার ন্যায় কোনো পদার্থ দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে তার পেটে সন্তান এসেছে। আর যদি কোনো পদার্থ দেখা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে গর্ভবতী নয়। এর আরেকটি পদ্ধতি হল, সে পেশাব একটি পাত্রে রেখে আগুনে জ্বাল দিবে। যদি পেশাব হতে দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে গর্ভবতী। আর যদি দুর্গন্ধ বের না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার শরীরে প্রমেহ বা জিরিয়ান রোগ আছে।

দ্বিতীয় হেকমত ঃ ইউনানী হাকিমগণ ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন– গর্ভ পরীক্ষার দ্বিতীয় হেকমত হচ্ছে– জেরাওন্দ তবিল মূলসহ গাছপাতা কুটে নির্মল করে মধুর সাথে মিশ্রিত করে নীল কাপড়ে ঔষধ মিশিয়ে ঐ বস্ত্র স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে তিন প্রহরকাল রেখে দিবে। এ সময়ের মধ্যে কিছুই খাবে না অথবা কোনো বস্তুও মুখে রাখবে না। তিন প্রহর পরে মুখে যদি সুস্বাদু বোধ হয়; তাহলে সে গর্ভবতী বলে সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি মুখ বেশি মিষ্ট বোধ হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার পেটে ছেলে সন্তান এসেছে, আর যদি মুখে তিক্ততা বোধ হয়, তবে গর্ভে মেয়ে এসেছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। বাকী আল্লাহ্ মা'লুম।

গর্ভবতী নারীর গর্ভের সন্তান পরীক্ষা করার হেকমত

প্রসিদ্ধ হাকিমগণ স্ত্রীলোকের গর্ভের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– পেটে মেয়ে সন্তান থাকলে সে নারীর চেহারা পরিস্কার হয়, স্তনদ্বয় স্থুল হয়, স্তনের ডান বামে লাল রেখা দেখা দেয়। স্তনের বোঁটার রং কালো বর্ণের হয়।

বেশি বেশি ভালো খাবার খেতে ইচ্ছা জাগে। চলার সময় ডানদিকের পা আগে ফেলে। বসার সময় ডান হাতে ঠেস দিয়ে বসে। প্রথমে বাম চোখের পলক দেয়। চার মাস পড়েই সন্তান পেটে নড়াচড়া করতে থাকে।

আর যদি গর্ভে ছেলে সন্তান থাকে, তাহলে অবস্থা এর বিপরীত হবে। ভালো খাবার খেতে ইচ্ছা করে না। শরীর দুর্বল ও অবশ হয়ে আসে। মনে কোনো প্রকার আনন্দ ফুর্তি থাকে না। ভালোভাবে সাংসারিক কাজকর্ম করতে পারে না। ক্রমেই চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। স্তনের বোটার রং লাল বর্ণ ধারণ করে। পাঁচ মাস থেকেই গর্ভের সন্তান নড়াচড়া করতে থাকে। এটা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত তদবীর।

টোটকা চিকিৎসা

উঁকুন মারার ঔষধ

১। নারিকেল তেলের সাথে কর্পূর মিশিয়ে দৈনিক সেই তেল ব্যবহার করলে মাথার উঁকুন মরে যায়।

২। চাপা ফুলের পাতার রস মাথায় মেখে রোদ্রে শুকাবে। তারপর মাথা ধুয়ে ফেললে উঁকুন মরে যায়।

৩। পানের রস মাথায় রাখলে উঁকুন মরে যায়।

৪। নোনা ফল গাছের পাতা বেটে মাথায় মেখে এক ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেললে উঁকুন মরে যায়। একদিন মরে না গেলে উপর্যুপরি ৪দিন লাগাতে হবে।

৫। বিরঙ্গ, সৈন্ধব লবণ গরুর চোনা সরিষার তেলের সাথে মিশিয়ে অগ্নিতে গরম করবে। উক্ত তেল ২-৩ দিন ব্যবহার করলে মাথার উঁকুন ও খুস্কী দুর হয়।

একজিমা (বিখাউজ)

১। এক তোলা মুদ্রাশঙ্খ বেটে একটু ঘিসহ প্রলেপ দিলে ৩-৪ দিনে একজিমা রোগ আরোগ্য হবে।

২। আফুলা আপাঙ্গা গাছের পাতা এক তোলা ও কুলিচুন এক আনা একটু মুখের লালসহ বেটে লাগালে একজিমা নির্দোষরূপে সেরে যায়।

৩। শৃগালের রক্ত একজিমার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৪। পাথরের বাসনে একটু গরুর চোনাসহ একটি হরীতকী ঘষে ক্বাথ লাগালে একজিমা আরোগ্য হয়।

কোষ্ঠ রোগ আরোগ্যের ঔষধ

১। দৈনিক সকালবেলা সিকি তোলা পরিমাণ সোমরাজ কিঞ্চিৎ লবন ও ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করবে। দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে তা সেবন করলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হবে।

২। মোনছাল হরিতাল, গোলমরিচ, সরিষার তেল ও আকন্দের আঠা সমভাবে মিশিয়ে প্রতিদিন ২-৩ বার করে প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়।

৩। একটি লোহার পাত্রে সামান্য পানিসহ হরীতকী ঘষে তার ক্বাথ কিছুদিন ক্ষতস্থানে লাগালে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

গেঁটে বাত আরোগ্যের ঔষধ

১। ধুতরার পাতার রসে সোরা মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে গেটে বাত আরোগ্য হয়।

২। ধুতরার শিকড় বেটে কিঞ্চিৎ তার্পিন ও সরিষার তেল মিশিয়ে গরম করে মালিশ করলে গেঁটে বাত আরোগ্য হয়।

৩। কর্পূর লবণ আকন্দের আঠা সরিষার তেলের সাথে মর্দন করে সামান্য গরম করে মালিশ করলে গেঁটে বাত আরোগ্য হয়।

চুলকানী রোগের ঔষধ

১। সাদা চন্দন পাথরের সাথে ঘষে সামান্য কর্পূর মিশিয়ে গরম করে চুলকানীতে লাগালে চুলকানী আরোগ্য হয়।

২। এক ছটাক সরিষার তেল গরম করে তাতে সিকিতোলা মুদ্রা সংখ্যা চূর্ণ, সিকিতোলা মোনছাল চূর্ণ ও একতোলা গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করবে। তারপর তাতে ৩০ ফোটা কার্বলিক এসিড মিশিয়ে চুলকানীতে লাগালে ৩ দিনের মধ্যে চুলকানী আরোগ্য হবে।

৩। এক ছটাক সরিষার তেল ৪-৫টি করমচা ফল দিয়ে আগুনে ফুটাবে। সে তেল চুলকানীতে লাগালে চুলকানী আরোগ্য হয়।

৪। সাদা চন্দন পানিসহ পাথরে ঘষে সে ক্বাথ ১ ছটাকের সাথে ১ তোলা কর্পূর মিশিয়ে চুলকানীতে লাগালে চুলকানী আরোগ্য হয়।

৫। এক ছটাক নারিকেল তেলে ১ তোলা গাঁজা ও ১ তোলা চালকুমড়ার শাস দিয়ে অগ্নিতে ফুটিয়ে গরম গরম চুলকানীতে লাগালে চুলকানী আরোগ্য হয়।

পাঁচড়ার ঔষধ

১। গন্ধক ভালোভাবে চূর্ণ করে মাখনের সাথে মিশ্রিত করে পাঁচড়ায় লাগালে ৩-৪ দিনে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

২। সোহাগা খোলায় ভেজে চূর্ণ করে লুচি ভাজা ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে পাঁচড়ায় লাগালে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

৩। এক ছটাক সরিষার তেল গরম করে তাতে ১০ ফোটা কার্বলিক এসিড মিশিয়ে লাগালে ৩-৪দিনে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

৪। পেঁপের আঠা ও হলুদের গুঁড়া সমপরিমাণে মিশিয়ে পাঁচড়ায় লাগালে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

ফোঁড়া পাকাবার নিয়ম

১। আতাফলের পাতা দুধের ননীসহ বেটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পেঁকে যায়।

২। কচি পুঁই পাতার সম্মুখের পৃষ্ঠে গাওয়া ঘি মাখিয়ে গরম করে ফোঁড়ার উপর বসায়ে দিবে। ১ ঘন্টা পর সেটি বদলায়ে আরেকটি লাগিয়ে দিবে। এরূপ ৮-১০বার লাগালে সত্বর ফোঁড়া পেঁকে আপনা আপনি পুঁজ বের হয়ে যাবে।

৩। তোকমা ভিজিয়ে রেখে বেশ ফুলে উঠলে তা ফোঁড়ার উপর পুরু করে লাগালে অতি সত্বর ফোঁড়া ফেটে যায়।

৪। সমপরিমাণ ধুতরার পাতার ও ঘি মিশিয়ে সামান্য গরম করে ফোঁড়ায় লাগালে সত্বর ফোঁড়া পেঁকে যায়।

৫। পুঁইশাকের মত কাঁচা দুধের সাথে বেটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফেটে যায়।

৬। পাকা ফোঁড়া সহজে না ফাটলে ফোড়ার মুখ ভিন্ন চতুর্দিকে চিংড়ি মাছ

বেটে প্রলেপ দিলে সহজে ফেটে পুঁজ বের হয়ে যায়।

৭। জবা ফুলের পাতা বেটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পেঁকে ফেটে যায়।

৮। ফোঁড়া উঠার সময় কালো কচুর আঠা ঘসে দিলে ফোঁড়া বসে যায়।

৯। শিমুলের কাঁটা বেটে সামান্য গরম করে ফোঁড়ার মুখ বাদে চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পেঁকে ফেটে যাবে।

১০। কবুতরের বিষ্ঠা ত্যাগ করা মাত্র গরম বিষ্ঠা ফোঁড়ার মুখ বাদে চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া সহজে ফেটে যায়।

১১। কাপড় কাঁচা সাবান ঘন করে গুলিয়ে পুরু করে লাগিয়ে তার উপরে একটু ন্যাকড়া বসিয়ে দিয়ে সর্বদা ভিজিয়ে রাখলে সত্বর ফোঁড়া ফেটে যায়।

ব্রণ হতে আরোগ্যের উপায়

১। পুরাতন ঘিয়ে কর্পূর মিশিয়ে সামান্য গরম করে ব্রণের উপর লাগালে ব্রণ ভালো হয়।

২। গোলমরিচ পানিসহ উত্তমরূপে বেটে ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ ভালো হয়।

৩। চিনি ও বাঙরা সাবান (কাপড় কাচা সাবান) সমভাবে নিয়ে সামান্য পানিসহ ভালোভাবে মর্দন করে ন্যাকড়ার পট্টি ব্রণের উপর লাগালে ব্রণ আরোগ্য হয়।

টাক পড়া মাথায় চুল গজাবার ঔষধ

১। রসুন বেটে প্রলেট দিলে টাক পড়া রোগ আরোগ্য হয়ে নতুন চুল গজায়।

২। গাভী দোহনকালে দুধের যে ফেনা হয়, সে ফেনার সাথে একটু চিটি মিশিয়ে টাকে মালিশ করবে। মাসাধিককাল এরূপ করলে টাক পড়া রোগ আরোগ্য হয়।

৩। ৪-৫টি সুপারী কুচি কুচি করে কেটে এক সের পানিতে ভালোভাবে সিদ্ধ করে সে পানি দ্বারা বেশ করে মাথা ধৌত করে মাথায় পেঁয়াজের রস মেখে দিলে টাক পড়া রোগ আরোগ্য হয়।

৪। পুরাতন সাজিনা গাছের ছালের রস মাথায় মালিশ করলে মাথার টাক রোগ আরোগ্য হয়।

৫। কালো গাভীর চনার সাথে জবা ফুল বেটে মাথায় মালিশ করলে টাক আরোগ্য হয়।

ছুলি (মেসতা) রোগ আরোগ্যের ঔষধ

১। পাথরের বাসনে একটি পাতি লেবু ঘষে সে ক্বাথ ছুলিতে লাগালে ছুলি আরোগ্য হয়।

২। সোহাগার খৈ চূর্ণ ১ তোলা ও পাতি লেবুর রস ১ তোলা একসাথে মিশিয়ে ছুলিতে লাগালে আরোগ্য হয়।

৩। পাতি লেবুর রস দিয়ে একখণ্ড হরিতাল পাথরে ঘষে যে ক্বাথ হয় সে ক্বাথ ছুলিতে লাগালে ছুলি আরোগ্য হয়। মসুরের ডাল ঘিয়ে ভেজে দুধের সাথে বেটে প্রলেপ দিলে ছুলি রোগ আরোগ্য হয়।

নখের কুনি আরোগ্যের ঔষধ

তুঁতিয়া চূর্ণ করে নখের উপর লাগিয়ে দিবে। তারপর তার উপর ২-৩ ফোটা গরম পানি দিলে তুঁতিয়া গলে নখের নিম্নে প্রবেশ করবে। ৫-৭ দিন এরূপ করলে কুনি আরোগ্য হবে।

২। তুঁতিয়া ও সোহাগা খোলায় ভেজে চূর্ণ করে কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে লাগালে কুনি রোগ আরোগ্য হয়। এটি কুনির সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্তনের ফোঁড়া আরোগ্যের ঔষধ

গোলমরিচ, ঘৃতকুমারী ও হলুদ পোড়ান ছাই প্রতিটি এক তোলা পরিমাণ নিয়ে কিঞ্চিত ছাগলের দুধসহ বেটে প্রলেপ দিলে স্তনের ফোঁড়া (ঠুনকো) আরোগ্য হয়।

স্তনের ক্ষত আরোগ্যের ঔষধ

এক তোলা বাবলা গাছের ছাল এক সের পানিতে সিদ্ধ করে আধা সের থাকতে নামিয়ে ছেকে তার সাথে এক তোলা ফিটকারী চূর্ণ মিশিয়ে ঐ পানিতে দৈনিক ২-৩ বার করে ক্ষতস্থান ধৌত করলে স্তনের ক্ষত আরোগ্য হয়।

স্তন শক্ত ও উন্নত করার ঔষধ

এক ছটাক পরিমাণ ডালিমের কচি ফুল ও এক ছটাক বচ একত্রে বেটে আধা পোয়া সরিষার তেলের সাথে জ্বাল দিয়ে ঐ তেল প্রতিদিন ভোরে ও রাতে স্তনে মর্দন করলে স্তন উন্নত, শক্ত ও সুশ্রী হয়।

স্তনের দুধ বৃদ্ধির ঔষধ

১। ভুঁই কুমড়ার মূল বেটে একটু দুধের সাথে দৈনিক ভোর সকালে পান করলে স্তনে প্রচুর দুধ হয়।

২। কুমড়ার কচি কচি ডগা রান্না করে ঝোলসহ খেলে স্তনে দুধ বাড়বে।

৩। প্রতিদিন তরকারীর সাথে বা পৃথকভবে শিং মাছ, মাগুর মাছ রান্না করে খেলে স্তনে দুধ বাড়ে।

৪। আধপোয়া দুধ চারটি ভুঁইকুমড়া বা ভূমি কুষ্মাণ্ড (চূর্ণ করে) একত্রে মিশিয়ে সেবন করলেও দুধ বৃদ্ধি পায়।

হস্তমৈথুন ও সমকামিতা

হস্তমৈথুন অর্থাৎ হাত দ্বারা যৌনাঙ্গ হতে বীর্যপাত ঘটানো, যাকে জ্বলক বলা হয়। এর অপর নাম নেকাহে বালীদ অর্থাৎ হাতের মাধ্যমে বিবাহ করা। হস্তমৈথুন এটি খুবই বদ অভ্যাস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হস্তমৈথুর করে বীর্যপাত করানো হারাম। এটা মাত্রাতিরিক্ত সহবাসের চেয়ে ক্ষতিকর। হস্তমৈথুনের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে বিস্তার করে। সাথে সাথে ক্ষতিকারক অনেক রোগও দেখা দেয়। বিশেষ করে, অন্তর, মস্তিষ্ক, যৌনাঙ্গ একেবারে বিকল হয়ে যায়। যে ব্যক্তির এ বিশেষ অঙ্গটি দুর্বল ও বাদ পড়ে যাবে, বুঝাই যায় যে, তার জীবনের কত বড় ক্ষতি হয়। এমন ক্ষতি, শত আফসোস করেও তা আর পূর্বাবস্থায় আনা যায় না। এ খারাপ অভ্যাসটি সব বয়সেই হতে পারে। আর যে ব্যক্তি এ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা এটি করা ছাড়া থাকতে পারে না।

একটি সত্য ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট তার নিজের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলতে লাগল, জনাব! আমি হস্তমৈথুন বদ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়েছি। যখনই পেশাব

বা পায়খানায় যাই, তখনই হস্তমৈথুন না করে আসতে পারি না। আবার অনেক সময় কেবল এ কাজ করার জন্যই একাধিকবার পায়খানায় যাই। শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, এখন অনেক সময় পেশাবের সাথে সাথে রক্ত আসে। আবার অনেক সময় শুধু রক্ত আসে। রক্ত দেখে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, আমি কত বড় পাপে লিপ্ত হয়েছি। আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, কেউ যদি আমার জন্য কবর খনন করে, তাহলে সেখায় গিয়ে মৃত্যুবরণ করি।

এ বদঅভ্যাসের ক্ষতিকর দিক

এ বদঅভ্যাসে লিপ্ত ব্যক্তির চেহারার উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়। তার চেহারায় হালত এমন হয় যে, আয়নায় নিজের চেহারা দেখতেও ভয় পায়। তাকে দেখলে মনে হয়, না জানি সে কত গভীর চিন্তায় বিভোর। মস্তিষ্কের শক্তি চলে যাওয়ার সাথে সাথে শরীরও দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে যায়।

হস্তমৈথুনকারী ব্যক্তিকে চেনার আলামত

এ বদঅভ্যাসে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকাংশ সময় মাথা ব্যাথা, মস্তিষ্কের ব্যাথা, কোমরে ব্যাথা, পায়ের ব্যাথা করে। মাথা চক্কর মারে। এমনকি যে কোনো বিষয়ে সে সন্দিহান হয়ে যায়। শরীর এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, হাটুর উপর ভর দেয়া ব্যতীত দাঁড়াতে পারে না। কোমরের ব্যাথায় বসতে পারে না। শুতে গেলে পাঁজর ব্যাথা করে। অনেক সময় চলাফেরা করার সময় অনিচ্ছায় পেশাব বের হয়ে যায়। মাঝে মাঝে উঠা-বসা করতেও বীর্যপাত হয়ে যায়। দিন-রাতে স্বপ্নদোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তার বীর্য এত পাতলা হয়ে যায় যে, কখন তার বীর্যপাত হলো সে সময়টিও তার জানা থাকে না। এছাড়াও বীর্য হয়ে যায় পেশাব বা পানির মত। বীর্যের কীট শেষ হয়ে যায়। যে কারণে ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। যৌনাঙ্গের রগ হালকা হয়ে যায়। এজন্যই হাকীমগণ বলে থাকেন যে, হস্তমৈথুন করার দ্বারা যিনা ব্যভিচার করার চেয়েও অধিক ক্ষতিকারক। কারো মাঝে এ রোগটি দেখা দিলে যতদ্রুত সম্ভব আরোগ্যের ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক পিতা-মাতা তার ছেলের এ ব্যাপারে বে-খেয়াল থাকে। তাদেরকেও এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

হস্তমৈথুন রোগীর আলোচনা

ইতিপূর্বে আমরা এ বদঅভ্যাসের বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি। আসলে এ বদ অভ্যাসটি মানুষের ফিতরত তথা নিজস্বতার বিপরীত কাজ। আসলে আল্লাহ্ তাআলা মানুষদেরকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নি। অধিকাংশ সময় এ বদ অভ্যাসটি হাতের দ্বারাই হয়ে থাকে। এছাড়া অন্য ভাবেও করা যায়। এ বদ অভ্যাসটি অনেক পূর্বে থেকেই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। যা এখন পর্যন্তও প্রচলিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

বর্তমান যুগের মানুষ সব দিকেই সচেতন হওয়া সত্যেও অনেকেই এ ধ্বংসাত্মক বদ অভ্যাসে লিপ্ত। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ লোক হচ্ছে, যারা এখনো বিবাহ করে নি বা একাকিত্ব জীবন যাপন করছে কিংবা কু-সংস্পর্শের সাথে লিপ্ত। বেশিরভাগ সময় তারাই এ হীন কাজে লিপ্ত। সামান্য তৃপ্তির জন্য তাদের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আবার কিছু কিছু লোকের যৌনাঙ্গে চুলকানি জাতীয় রোগ থাকে। সময়ে সময়ে চুলকাতে চুলকাতে এ বদ অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ নবযৌবনের তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে অথবা অশ্লীল সিনেমা দেখে বা অশ্লীল বই পড়ে নিজের যৌন উত্তেজনাকে সঠিক স্থানে ব্যবহার করতে না পের হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়।

হস্তমৈথুনের ক্ষতিকর দিক

হস্তমৈথুন অভ্যাসটি খুবই খারাপ অভ্যাস। এ অভ্যাসে লিপ্ত ব্যক্তি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। হস্তমৈথুনের সময় যৌনাঙ্গে হাতের ঘর্ষণ বা ডলাডলির কারণে যৌনাঙ্গের শিরা শিথিল হয়ে যায়। অনেক সময় এর কারণেই যৌনাঙ্গ বাঁকা এবং শিথিল হয়ে যায়। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যৌনাঙ্গ উত্তেজনার সময় খুব শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অনেক সময় এ বদ অভ্যাসের কারণে লিঙ্গের আগা বা গোড়া চিকন কিংবা মোটা হয়ে যায় এবং লম্বায় ছোট হয়ে যায়। পেশাবের সময় পেশাবও সোজা না গিয়ে ডানে বামে যে কোনো একদিকে যেতে থাকে। আগা কিংবা গোড়া চিকন মোটা যাই হক, উভয়টিই তার জন্য খুবই ক্ষতিকর। যৌনাঙ্গে ঘর্ষণ কিংবা ডলাডলির কারণে তার শিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যৌন উত্তেজনা অতি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। পেশাবের সময় জ্বলন অনুভব হয়।

বেশি বেশি স্বপ্নদোষ হয়। ক্রমান্বয়ে যৌনশক্তি কমতে থাকে। দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদি এ রোগের চিকিৎসা করা না হয় এবং সবসময় এ অভ্যাসটি চালিয়ে যেতে থাকে। তাহলে তার অন্তর, দেমাগ, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, পার্শ্ব অর্থাৎ পাঁজর, হৃৎপিণ্ড সব তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে যাবে। সব সময় মেজাজ থাকবে গরম। কোনো কিছুই তার কাছে ভালো লাগবে না। ভালো রক্ত তৈরী হবে না। চর্বি গলে পেশাবের সাথে বের হয়ে যাবে। শরীরের সকল অঙ্গে অস্বাভাবিক দুর্বলতা অনুভব হতে থাকবে।

হস্তমৈথুন রোগীর বিশেষ আলামত

হস্তমৈথুন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সহজে যেভাবে চেনা যাবে- তাদের চেহারা এবং নখের নিচে রক্ত থাকবে না বরং সাদা হয়ে যাবে। তাদের চোখের পুতলি স্বাভাবিক না থেকে তুলনামুলক ফুলা বা বড় বড় থাকবে। হস্তমৈথুনকারী ব্যক্তি কথা বলার সময় কারো চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে না। তার দৃষ্টি থাকবে ঐ ব্যক্তির পায়ের দিকে। কথা বলার আওয়াজ ক্ষীন থাকবে। উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে পারবে না। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যাবে। তার চেহারা আকার আকৃতি ভয়ানক হয়ে যাবে।

হস্তমৈথুনকারী ব্যক্তির পরিণতি

এ ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কখনো কখনো মৃগী রোগ বা কাঁপুনী রোগে আক্রান্ত হয়। আবার কখনো কখনো টিবি রোগসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

সমমৈথুন, পুং মৈথুনের আলোচনা

হস্তমৈথুন, পুং মৈথুন অর্থাৎ হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত না ঘটিয়ে নিজের প্রিয় কোনো ছেলের সাথে স্বীয় যৌনচাহিদা পুরণ করাকে সমমৈথুন, সমকামিতা ইত্যাদি বলে। সে সাথে অভিশাপের পোশাক নিজের গায়ে পরিধান করে নেয়। এ বদ অভ্যাসটি বড়ই অপমানজনক কাজ, ঘৃণিত ও হীনমান্য কাজ। এর চেয়ে বড় ক্ষতিকর আর কোনো বদ অভ্যাস হতে পারে না। সমকামিতা এমনই মারাত্মক ঘৃণিত বদ অভ্যাস যা অন্যান্য ঘৃণিত অভ্যাস

যেমন, যিনা, হস্তমৈথুন ইত্যাদি মারাত্মক গোনাহ থেকেও ভয়াবহ গোনাহের কাজ। যৌনাঙ্গে এ কাজের প্রতিক্রিয়া খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে। যৌনাঙ্গের শিরা একেবারেই ঢিলে হয়ে যায়। এমনকি এ জঘন্য কাজ করার সময় অনেক সময় সে রগটি ছিড়ে যায়। এরূপ ঘটনা কারো জীবনে ঘটলে সে আর কখনো বিবাহ করে স্ত্রীকে যৌনস্বাদ দিতে পারবে না। বরং তার নিকট মহিলাদের আলাপ-আলোচনাও বিরক্তিকর মনে হবে। তার সামনে মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা করলে মনে হবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

সত্য ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট পুরুষদের দীর্ঘ একটি নামের তালিকা দিয়ে বললেন, জনাব! এ নামগুলো মেহেরবানী করে পাঠ করুন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এগুলি কি ও কেন? জবাবে সে বলল, আমি এই আটানব্বইজন ছেলের সাথে পুংমৈথুন করেছি। যার ফলে বর্তমানে আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমার চোখ থেকে পানি বের হয় না, বরং রক্ত বের হয়। রাতে সামান্য সময়ের জন্যও ঘুমাতে পারি না। সারারাত নির্ঘুম থাকি। আমার বয়সের বন্ধু-বান্ধবদের সংসারে দু'তিনটি করে সন্তান। কিন্তু আমার এখনো বিবাহই হলো না। আমি এ পর্যন্ত চৌদ্দজন ডাক্তার ও হাকীম দেখিয়েছি। ভুড়ি ভুড়ি টাকাও খরচ করেছি। কিন্তু কোনো উপকৃত হতে পারি নি। এখন যদি আপনার পরামর্শও বৃথা যায়, তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনো রাস্তা থাকবে না। এ জীবন নিয়ে জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাও অনেক শ্রেয়।

পুরুষ যদি নারীদের সাথে যিনা বা সহবাস করে, তাহলে গোনাহগার হবে। কিন্তু খালেছ মনে লজ্জিত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ্ তাআলা রহমানুর রাহিম ও গাফফারুর রাহীম নামের অছিলায় তাকে মাফ করে দিবেন। স্বীয় পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে পুরুষে পুরুষে যিনা করলে যৌনাঙ্গ একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে, যা তওবা করার দ্বারা পূর্বাবস্থায় ফিরে আনা অসম্ভব। এ ঘৃণিত অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত বদ অভ্যাসের ক্ষতিকর দিকগুলি আমার কলম দ্বারা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। এ বদ অভ্যাসেরও চিকিৎসা রয়েছে। তবে অনেক কষ্টকর, অনেক অভিজ্ঞ হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে।

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্তাকারে হস্তমৈথুন ও সমকামিতার চিকিৎসা

যখন হস্তমৈথুন ও সমকামিতা নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে এ জঘন্য অভ্যাসে জীবন গড়ে উঠবে। সে মুহূর্তে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলে, ডাক্তার ও রোগীর প্রয়োজন হল, তার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনা করা এবং তাকে এ সব বদ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার পরার্শ দেওয়া। ডাক্তারের উচিত মুত্তাকী, খোদাভীরু, আল্লাহ্ওয়ালা ও সৎ লোকদের জীবনী ও কাহিনী শুনাবে। তাদের লেখা কিতাবাদী পড়তে বলবে। অশ্লীল ফিল্ম, উপন্যাস, কিতাবাদি পড়তে বারণ করবে। যেন রোগী পুণরায় এসব কাজ না করে, সেদিকে ডাক্তারকে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। রোগীরও উপরোক্ত বিষয়গুলো জানতে হবে এবং সে অনুপাতে ভবিষ্যত জীবন পরিচালনা করতে হবে। ডাক্তার সাহেব চিকিৎসার প্রথম অবস্থাতেই যৌন উত্তেজক উপায় উপকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। প্রথমেই যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী কোনো ঔষধ না দিয়ে প্রথমে তার যৌনাঙ্গে ক্ষত, চুলকানি বিশেষ সৃষ্টিকারী ঔষধ দিবে। যেন সে উক্ত বদ অভ্যাস থেকে বিরত থাকে। যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী খাবারও গ্রহণ করবে না। যেমন- গোশত, ডিম, মাছ, মোরগ ইত্যাদি খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। অতিরিক্ত মসলাও খাবে না। বরং সাদা-সিদা খাবার খাবে। মরিচ থেকেও বিরত থাকবে। শাক-সবজি খাবে। নিজের ইচ্ছা ও মনোবাসনা পুরণ করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। সেই সাথে হৃৎপিণ্ড শক্তিশালীকারী খাদ্য খাবে। যৌনাঙ্গে মালিশযোগ্য ঔষধ হাকীম সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী মালিশ করবে। প্রবল উত্তেজনা দেখা দিলে যৌনাঙ্গে মালিশ কমিয়ে দিবে।

যৌনস্পৃহা কমানোর ঔষধ

আজওয়া ইন খারামানি	১ মাশা
খেরফার বীচি	১ মাশা
কাহুর বীচি	৩ মাশা
শশার বীচি	২ মাশা
পোস্তের বীচি	২ মাশা
নিলোফর	১ তোলা
লেবুর খোসা	১মাশা

যেভাবে বানাতে হবে ঃ

ইতিপূর্বে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও ঔষধের আলোচনা করা হয়েছে। এখন যৌনস্পৃহা কমানোর ঔষধ দেওয়া হল।

উপাদান	পরিমাণ
আজওয়া ইন খুরাসানি (উগ্রগন্ধী লতা বিশেষের বীজ)	১ মাশা
খেরফার বীচি (শরীরে ঠাণ্ডা দেয় ঔষধ বিশেষ)	১ মাশা
তুখম (এক প্রকার শাকের দানা)	৩ মাশা
শশার বীচি	২ মাশা
পোস্তের বীচি	২ মাশা

যেভাবে বানাতে হবে ঃ এসবগুলো একত্র করে পিষে রস বের করবে। অতঃপর নিলোফর (নীল ফুলের নাম বিশেষ যা পানীতে জন্মে) এক তোলা লেবুর খোসা, এক মাশা মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খালি পেটে পান করবে।

হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী করার ঔষধসমূহ

উপাদান	পরিমাণ
আনারের দানা	৮ তোলা
শুকনা আদা	১ তোলা
সাদা তুরবুত (গুল্মজাত শিকড় বিশেষ)	১ তোলা
ডেউয়া (তেঁতু ফল বিশেষ)	১ তোলা
পোস্তবীজ	২ তোলা
লবন	১ তোলা
মৌরী বীচের রস	৮ থেকে ৯ তোলা
লাহোরী লবণ	১ তোলা

যেভাবে বানাতে হবে ঃ এসবগুলো কেটে পিষে ছয় থেকে নয় মাশা পর্যন্ত বানানোর পর মৌরী বীজের রসের সাথে কিংবা শুধু পানির সাথে মিশিয়ে পান করবে।

সহবাসের পর গোসল করা জরুরী

স্ত্রী সহবাসের পর সকলকে গোসল করতে হবে। এটি খুবই জরুরী কাজ। গোসলের সময় সারা শরীরে পানি ঢালবে। সামান্য স্থানও যেন শুকনা না থাকে। কেননা, সহবাসের সময় যে বীর্যপাত হয়ে থাকে, তা সমস্ত শরীর থেকেই হয়ে থাকে। বীর্য শরীরের মূল উপকরণ যা সমস্ত শরীর হতে নিসৃত হয়ে কোমরের পথ দিয়ে এসে যৌনাঙ্গ দিয়ে বের হয়। এ বীর্য বের হওয়ার দ্বারা শরীর অনেক দুর্বল হয়ে যায়। আর শরীরের এ দুর্বলতা কমানোর জন্য গোসল আবশ্যক। আর বীর্য যেহেতু শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে এসে থাকে, সেহেতু গোসলের সময় সমস্ত শরীর পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। সামান্য স্থান শুকনো থাকলেও পূর্ণাঙ্গ গোসল হবে না। আর পূর্ণাঙ্গ গোসল না হলে, সে পবিত্রও হবে না।

সহবাসের পর গোসলের দ্বিতীয় রহস্য

সহবাসের দ্বারা শরীরে দুর্বলতা, ক্লান্তি, অলসতার ভাব দেখা দেয়। আর গোসলের দ্বারা এসব দুর হয়ে যায়। সে সাথে অন্তরে শক্তি, প্রফুল্লতা, আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। হযরত আবু যর গিফারী রা. বলেন- সহবাসের পর গোসল করলে মনের হালত এমন, যেন মাথা হতে পাহারসম ভার দুর হয়ে গেল।

সহবাসের পর গোসলের তৃতীয় রহস্য

সহবাসের পর মানুষের অন্তরে একপ্রকার অস্থিরতা ও নিজেকে সংকীর্ণ মনে হতে থাকে। আর এটা কেবল গোসলের দ্বারাই দুর হয়ে থাকে। বিনা গোসলে খাওয়া-দাওয়া করা ও অধিক সময় অবস্থান করার দ্বারা দারিদ্রতা দেখা দেয়।

সহবাসের পর গোসলের চতুর্থ রহস্য

অভিজ্ঞ হাকীমগণ বলেন, সহবাসের পর গোসল করলে সহবাসের ক্ষয়কৃত শক্তি ও উদ্দীপনা পুনরায় ফিরে আসে এবং দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। সহবাসের পর গোসল করা শরীর ও আত্মার জন্য খুবই উপকারী। পক্ষান্তরে

সহবাসের পর গোসল না করে অপবিত্র অবস্থায় থাকার কারণে শরীর ও আত্মার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।

সহবাসের পর গোসলের পঞ্চম রহস্য

সহবাসের দ্বারা বীর্যপাত হলে শরীরের সমস্ত ছিদ্র খুলে যায়। এতে সে ছিদ্র দিয়ে ঘাম বের হওয়ার সাথে সাথে শরীরের দুর্গন্ধযুক্ত সারাংশও বের হতে থাকে। আর সে দুর্গন্ধযুক্ত সারাংশ লোক ও ছিদ্রের মুখে এসে থেমে যায়। সুতরাং গোসলের মাধ্যমে সমস্ত শরীর পরিস্কার করা না হলে কঠিন রোগ হওয়ার সম্ভবনা থাকে। সেহেতু সহবাসের পর গোসল করা সকলের জন্যই আবশ্যক। আর তা সহবাসে হোক, স্বপ্নদোষে হোক কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বীর্যপাত হয়ে থাকুক।

গর্ভাশয় অবস্থায় গর্ভবতীকে সব বিষয়ে যত্নবান হতে হবে

গর্ভবতী অবস্থায় অধিক গরম বৃদ্ধিকারী বা পাতলা পায়খানা সৃষ্টিকারী কোনো খাবার খাবে না। যেমন আমের আঁটি, যা অনেক সময় গর্ভপাত পর্যন্ত করে দেয়। তদ্রুপভাবে অধিক খাবার খেলেও অনেক সময় পাতলা পায়খানা দেখা দেয়। মহিলাদের দু' অবস্থায় আমের আঁটি খাওয়া নিষেধ।

এক. গর্ভবতী অবস্থায়।

দুই. ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে। কেননা, এ দু'সময়ে ঐটি খাওয়ার দ্বারা অনেক সময় গর্ভপাত হয়ে যায় আবার ঋতুস্রাবের সময় খেলে অনেক ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের রক্তের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়।

গর্ভবতী অবস্থায় ফুল ইত্যাদির সুগন্ধি গ্রহণ করবে না। রেডির তেল ব্যবহার করবে না। চিনা গাজর, গোল মরিচ, মুলা, বেশি টক অথবা এমন সহবাস থেকে বেঁচে থাকতে হবে, যেভাবে সহবাস করলে শরীরে বেশি হরকত বা নড়াচড়া হয়। বেশি নড়াচড়ার দ্বারা অনেক সময় গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভাশয়ের প্রথম চার মাস এবং সাত মাসের পর যথাসম্ভব সহবাস করা থেকে বিরত থাকবে। ভারী বস্তু উঠাবে না। হীল জুতা পরে হাটবে না। হীল জুতা পরিধান করে হাটার দ্বারা পেট সামনে বের হয়ে যায়। চলাচলের সময় উঁচু নিচুর বিশেষ খেয়াল রেখে চলবে। গর্ভাশয়ে তাদের পেশাবের হাজত বেশি দেখা দেয়। এর কারণ হলো গর্ভের বাচ্চা পেটে নড়াচড়া করার দ্বারা

মুত্রথলিতে চাপ পড়ে। পেশাবের সাথে সাথে পেটে ব্যাথা অনুভব হলে জরুরী ভিত্তিতে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবে। অনেক সময় এর কারণে পেশাবের নালীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবানু সৃষ্টি হয়ে থাকে। গর্ভশয় অবস্থায় মহিলারা হাসি-খুশি ও প্রফুল্ল মনে সময় কাটাবে। এ সময়ে রাগান্বিত থাকলে এর প্রভাব বাচ্চার উপরও পড়ে থাকে।

সহজ উপায়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঔষধ

গর্ভবতী মহিলা নিম্নোক্ত ঔষধ সন্তান ভূমিষ্ঠের এক মাস পূর্বে ভক্ষণ করলে এক মাসের মধ্যে সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। এটি এমন পরীক্ষাকৃত ঔষধ যা খেলে সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে, এমনকি অনেক সময় ধাত্রী ছাড়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। আর সেটি হলো **'জিলছিমিম'** যা জার্মান ও আমেরিকার নারীরা ব্যবহার করে থাকে।

যেভাবে ব্যবহার করবে ঃ প্রতিদিন সকাল দুপুর ও রাতে সামান্য পানিতে তিন ফোঁটা উক্ত ঔষধ মিশিয়ে সেবন করবে। অথবা শুধু ঔষধ সেবন করবে।

বক্ষমান কিতাবখাটির পরিসমাপ্তি টানছি এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কাকুতি-মিনতির সাথে প্রার্থনা করছি যে, হে রাব্বুল আলামীন তুমি আমার এ মেহনতকে কবুল কর। সাথে সাথে এ কিতাবখানার পাঠকদেরকেও সীমাহিন লাভবান হওয়া ও যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান কর। পরিশেষে রহমত বর্ষণ কর সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তোমার রহমান ও রাহীম নামের উছিলায় তার পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর রহমত বর্ষন কর। আমীন।

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
একান্ত নির্জনেঃ
গোপন আলাপ
বা
তানহায়ী কি
সবক
মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহী

একান্ত নির্জনেঃ

গোপন আলাপ

বা

تنہائی کے سبق

একান্ত নির্জনেঃ
গোপন আলাপ

বা

تنہائی کے سبق

মূল
মুফতী আল্লামা হাকীম আশরাফ আমরহী

অনুবাদ ও সংযোজনায়
মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক
উচ্চতর আরবী ভাষা ও সাহিত্য
জামেয়া ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস জামেয়া ইসলামিয়া সোনারং
টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ।

প্রকাশনায়
রংধনু পাবলিকেশন্স

[সূচীপত্র](#)

একান্ত নির্জনেঃ
গোপন আলাপ

মূল — মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহী

অনুবাদ ও সংযোজনায় — মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ — এপ্রিল ২০১৩

দশম মুদ্রণ — অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশক — রংধনু পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

পরিবেশক — রংধনু পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৯৭৭-৩০২২৩৩

মূল্য : ১৮০.০০ (একশত আশি টাকা মাত্র)

EKANTO NIRJONE : GOPON ALAP
by Mufti Ashraf Amrohi, Transleted by Mawlana Abubakar Siddiqwe.
Published & Marketed by : Rangdhonu Publication. Price. Tk. 180.00. US $ 10.00 only.

ISBN 978-984-33-3775-7

এ বই পড়ার আগে

পুরুষ ঃ কথায় প্রবল কাজে দুর্বল

মহিলা ঃ বুক ফাটে মুখ ফাটে না

এ বই পড়ার পরে

পুরুষ ঃ কথায় যেমন কাজেও তেমন

মহিলা ঃ মুখ ফাটে বুক আর ফাটে না

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী। সেই সাথে অগণিত ও বেহিসাব দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবীব খাতামুন্ নাবিইয়ীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারকের উপর এবং এ ধারা চিরকাল প্রবাহমান থাকুক।

হামদ ও সালাতের পর নাকার মোহাম্মাদ আশরাফ আমরহীর কিছু কথা, বক্ষমান কিতাবটির আলোচনাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জানার বিষয়। এজন্য উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করছি। জীবনের তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। কখন জানি বিদায়ের সুর বেজে উঠে। তখন নিজের ইলম, জ্ঞান-সাধনা নিজের সাথে যাবে কি না জানা নেই। সর্বোত্তম ইলম হল সেই ইলম, যার দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যরাও উপকৃত হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমার তৃতীয় এই কিতাবখানি রচনার প্রয়াস। এ কিতাবে 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবের চেয়েও দামী ও দুস্প্রাপ্য বিশেষ বিশেষ কথা সংকলন করা হয়েছে, যা শোনানোর মতো নয়, বরং নির্জনে পাঠ করে নিজের জীবন গড়া এবং সংসার জীবনের যাবতীয় সমস্যা নির্জনে সমাধান করা যাবে। আমি এ কিতাবের নাম 'একান্ত নির্জনেঃ গোপন আলাপ' রাখলাম। যেহেতু জনসম্মুখে পাঠ করার বিষয় নয়, সেহেতু আপনি নির্জনে একাকী পাঠ করে কিতাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করুন।

আজ মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, আমার জন্য খুবই খুশির সংবাদ হল, ইতিপূর্বে আমার লেখা 'একান্ত গোপনীয় কথা' নামক কিতাবটি তিনি কবুল করেছেন। আমি আশাবাদী যে আমার 'একান্ত নির্জনেঃ গোপন আলাপ' কিতাবটিও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি পাঠকদের মধ্যে কারো সামান্যতম উপকারে আসে, তাহলে নিজের কষ্টকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ তাআলা আমার এ খেদমতকে কবূল করুন। পাঠকদের প্রতি আমার আরয, যদি আপনারা এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হন, তাহলে আল্লাহ্র দরবারে আমার গোনাহ মাফির জন্য দোয়া করবেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আশরাফ আমরহী

২য় খন্ড
একান্ত নির্জনেঃ
গোপন আলাপ
বা
তানহায়ী কি
সবক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বালেগ হওয়ার আলামত

ইতিপূর্বে আমি 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে উল্লেখ করেছি যে, সকল ব্যক্তির জন্যই প্রাপ্তবয়সে পৌছে বিবাহ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। বালেগ বা প্রাপ্তবয়সে পৌছার আলামত নিম্নরূপ—

১। জাগ্রত বা ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্নদোষ বা বীর্যপাত হওয়া।

২। উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হওয়া।

৩। গুপ্তাঙ্গে পশম গজানো। যেমন- বগলের নীচে, নাভীর নীচে, নাকের মাঝে। তদ্রূপভাবে দাড়ি, গোফ গজানো অথবা ছেলেদের বয়স পনের বয়সে পৌছা। তেমনিভাবে মেয়েদের জন্য ঋতুস্রাব দেখা দেয়া। বর্তমানে বার/তের বছরের ছেলেদের মাঝেও জৈবিক চাহিদা প্রকাশ পাচ্ছে। মেয়েরাও এদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই, ছোট ছোট মেয়েরাও গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে।

বিবাহের গুরুত্ব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পালনে অনাগ্রহী হবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' অর্থাৎ সে আমার তরীকার উপর নেই। তিনি আরও বলেন 'বিবাহ হল ঈমানের অর্ধেক'। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল, বিবাহের পূর্বে কৃত আমলের গুরুত্ব শরীয়তে অর্ধেক। আর বিবাহের পর কৃত আমল স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বিষয়ে আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি মহিলার অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তির আশায় বিবাহ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে নিঃস্ব বানিয়ে রাখবেন।' অর্থাৎ স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ দ্বারা তাকে উপকৃত হতে দিবেন না। আর যে মেয়ের অভিজাত বংশের খেয়াল করে বিবাহ করবে, দিন দিন তার অসভ্যতা বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। আর যে যিনা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে, নিজের মান-সম্মান বহাল রাখতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিবাহে বরকত দান করবেন।

বিবাহের উপকারিতা

বুযর্গ ব্যক্তিগণ বলেন, বিবাহের পাঁচটি উপকারিতা রয়েছে। যথা–

❖ জৈবিক চাহিদা নিজ ইচ্ছাধীন থাকে।

❖ ঘর-বাড়ী সাজানো-গুছানো থাকে।

❖ সন্তানাদি জন্ম নেয়।

❖ সন্তানাদি ও স্ত্রীর খবরা-খবর নেয়ার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল এর দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পালন করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ করেন- 'তোমরা এমন মহিলাদেরকে বিবাহ করবে, যাদের থেকে সন্তানাদি বেশি হয়। আমি যেন কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সংখ্যাগরিষ্টতায় গর্ব করতে পারি।'

ইলমের শ্রেণী বিন্যাস ও তার গুরুত্ব

ইল্‌ম এর অর্থ হচ্ছে- জানা, জ্ঞাত হওয়া। ইলম এমন একটি প্রদীপ বা বাতি, যার দ্বারা ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম জানা যায়। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ইলমে দীন শিক্ষা করা ফরয।' আর স্ত্রী সহবাস বিষয়ক ইলমও এমন একটি ইলম, যার জ্ঞান রাখা সকল মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য আবশ্যক। কোনো পুরুষ বা মহিলা এ জ্ঞান শিক্ষা করা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনকারীকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা হয়। অথচ দীন-দুনিয়া উভয়টির ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা অনেক জরুরি। যদি কোনো ব্যক্তি সঠিক পথে থাকে এবং নিজে সঠিকভাবে চলে, তাহলে সে কখনো এ ইলম শিক্ষা করাকে দোষণীয় মনে করতে পারে না। কেননা সকল শ্রেণীর মানুষ, চাই সে সাধারণ হোক বা সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হোক না কেন; স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করবেই। দুনিয়ার জীবনে বিবাহ করার গুরুত্ব অনুভব করবে। যে মহিলা আল্লাহ্ তাআলাকে রাজী-খুশি করার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, আল্লাহর নিকট সে অনেক বড় সাওয়াব প্রাপ্তির অংশীদার হয়ে যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম বা তার সাথে সদাচরণ করে।'

স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করতে হলেও এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি।

আমার উস্তাদ, শায়খ বা পীর আল্লামা ডাক্তার মুহাম্মাদ যাহেদ আমরহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কোনো এক মজলিসে বলেন, ইলম দু-ধরনের-

(১) علم الابدان (ইলমুল আবদান) বা শরীর বিষয়ক ইলম। (২) علم الاديان (ইলমুল আদইয়ান) বা ধর্ম বিষয়ক ইলম। তিনি বলেন, শরীর ও ধর্ম বিষয়ক ইলমই হল আসল ইলম। বাকি সব প্রযুক্তি বা কৌশল। শরীর বিষয়ক ইলম, ধর্ম বিষয়ক ইলমের তুলনায় অগ্রগণ্য। কেননা শরীর সুস্থ থাকলে দীনের উপর চলা ও হুকুম-আহকাম মানা অতি সহজ। পক্ষান্তরে শরীর অসুস্থ থাকলে, দীনের উপর চলা ও হুকুম-আহকাম মানা বড় কঠিন। শরীর সুস্থ থাকলে নামায পড়া, রোযা রাখা সহজ হয়ে যায়। তদ্রূপভাবে হজ্জ আদায় করা যায়। এমনকি স্ত্রী ও বাবা-মায়ের হকও আদায় করা সম্ভব হয়। আর যদি শরীর সুস্থ না থাকে, তাহলে দীন-দুনিয়ার কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না।

সহবাস বিষয়ে জ্ঞান থাকা ও নীতিমালা অনুসরণ করা

ইলম অর্জন ও নীতিমালা অনুসরণ করে সহবাস করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যেমন–

১) মধ্যমপন্থায় সহবাস করলে মনে শক্তি আসে।

২) আত্মা আনন্দিত হয়।

৩) পুরুষাঙ্গ পুনরায় কাজ শুরু করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় খাবার বা প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়।

৪) অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র হয়।

৫) স্বামী স্ত্রীর প্রতি রাগ-গোস্সা কম করে।

৬) ক্রমান্বয়ে স্বামীর জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭) সহবাসের স্বাদ উপভোগ করার দ্বারা আত্মা শান্তি পায়।

দীর্ঘদিন সহবাস না করার ক্ষতি

দীর্ঘদিন সহবাস করা থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়। কেননা এর কারণে অনেক রোগ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

১) মাথা ভারি ভারি অনুভব হয়, মাথা ঝিম ধরে।

২) মাথা চক্কর দেয়।

৩) ঘাড় ও মাথা ব্যাথা করে।
৪) মাতলামি ভাব দেখা দিতে পারে।
৫) সময়ে সময়ে পাগল হয়ে যায়।
৬) মন-মেজাজ থাকে উগ্র।
৭) শরীরে এক প্রকার অসহ্য জ্বালা অনুভব হয়।

সহবাস করার দ্বারা উপরোক্ত সাময়িক রোগ বাদ হয়ে যায়। অর্থাৎ সহবাস ছেড়ে দেওয়াতেও অনেক ক্ষতি রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি সহবাস ত্যাগ করলে ক্ষুদামন্দা রোগে এমনভাবে আক্রান্ত হয় যে, খাবারের প্রতি তার কোনো রুচিই নেই। জীবন ধারণের জন্য কিছু খাবার গ্রহণ করলেও তা পেটে হজম হয় না। সুস্বাদু ও মজাদার খাবার খেলে এবং মাত্রায় কিছুটা বেশি হলে, পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বমি হয়। এভাবে সে দীর্ঘদিন এ রোগে আক্রান্ত থেকে এক সময় পাগল হয়ে যায়। দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার কি অপরিসীম কুদরত যে, সহবাসের মাধ্যমে বীর্য ও উত্তাপ বের হয়ে যাওয়ায় মানুষ বিনা চিকিৎসায় সুস্থ ও সবল থাকে।

হাকীম জালিনুস বলেন, জনৈক মহিলা 'ইহতেনাকুর রেহেম' বা জরায়ূ থেকে সর্বদা রক্ত নির্গত হওয়ার রোগে আক্রান্ত ছিল। অনেক বড় বড় ডাক্তার, হেকিম ও কবিরাজ দেখিয়েও কোনো ফায়দা পায় নি। পরিশেষে তিনি ঐ মহিলাকে সহবাস করার চিকিৎসা দিলেন। কিছুদিন পরই সে ঐ রোগ থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে মুক্তি পেয়ে যায়। সুতরাং সহবাস দ্বারা কেবল আনন্দ উপভোগ করাই উদ্দেশ্য নয়, স্ত্রীর সুস্থতাও উদ্দেশ্য। সহবাস শরীরে শক্তি জোগায়, শরীর পাতলা পাতলা অনুভব হয়। আবার অনেক জ্বর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এর দ্বারা রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে।

সহবাসের নীতিমালা

আল্লাহ তাআলা বলেন- 'মহিলারা তোমাদের পোশাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পরিধেয় স্বরূপ।'

স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বুঝতে হবে যে, অধিক মাত্রায় খাবার খেলে যেমন পেট খারাপ হয়, অধিক মাত্রায় সহবাস করলেও শরীর দুর্বল ও সুস্থতায় বিঘ্ন ঘটে। অধিক সহবাসে পুরুষদের যে ক্ষতি হয়, মহিলাদেরও তেমন ক্ষতি হয়।

সহবাসের ইচ্ছা করলে এই দুআ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আমাদের জন্য নির্ধারিত বস্তু হতে শয়তানকে ফিরিয়ে রাখুন।

উপরোক্ত দুআ সহবাসের সময় পড়লে আল্লাহ তাআলা বিতাড়িত শয়তান থেকে তাদেরকে হেফাজত করেন। সহবাসের সময় ঐ দুআ না পড়লে, তাদের কাজে শয়তানও শরীক হয়।

সহবাসের সময় পশ্চিমমুখি না হওয়া। কেননা কেবলা ও কা'বা শরীফের সম্মান সকল মুসলমানের অন্তরে থাকা আবশ্যক।

সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রী নিজেদের উপর বড় আকারের কাপড় টেনে দিবে। একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সহবাস করা যদিও জায়েয, তবে তাতে সন্তান জন্ম নিলে অধিকাংশ সময় ঐ সন্তান নির্লজ্জ ও বেহায়া হয়ে থাকে।

সহবাসের সময়ে অধিক কথা না বলা। কেননা এতে সন্তান বোবা বা তোতলা হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। সহবাসের সময় কুরআন কারীমকে ঢেকে রাখা। যেন তার সম্মানে কোনো কমতি না আসে।

স্বপ্নদোষে অপবিত্র অবস্থায়, সূর্য উদয় ও অস্তের সময় স্ত্রী সহবাস না করা। কেননা এসব অবস্থায় বা সময়ে সহবাসের দ্বারা যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তারা অধিকাংশই পাগল বা উন্মাদ হয়ে থাকে! দীর্ঘদিন সহবাস না করলে অনেক সময় মহিলারা বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগেন। এজন্য এ বাক্যটি খুব স্মরণীয়–

الجِمَاعُ لِلنِّسَاءِ كَالمَرهَمِ لِلجَرْحِ

অর্থ– মহিলাদের জন্য সহবাস এমন, ক্ষতস্থানের জন্য মলম যেমন।

সহবাসের পর পেশাব করা খুবই জরুরি। মাটি বা হালকা গরম পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে হবে।

একবার সহবাস করার পর দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইলে অযু করা। এতে মনে এক প্রকার তৃপ্তি পাওয়া যায়। স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখা মাকরূহ। লজ্জাস্থান দেখে সহবাসকারীর সন্তান অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময় সহবাস করা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিক দিয়েই ক্ষতিকর। এ সময় সহবাস করলে শরীরে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। আবার তা হারামও। বিস্তারিত জানার জন্য 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইটি পড়া যেতে পারে। সহবাসের পূর্ব মুহূর্তে আতর-খুশবু ব্যবহার করা জায়েয। খুশবু ব্যবহারে সহবাসে অধিক মজা ও আনন্দ পাওয়া যায়।

যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয। এর জন্য হালুয়া খাওয়া জায়েয আছে। উদ্দেশ্য হল কেবল স্ত্রীর হক আদায়ে যেন কোনো প্রকার কমতি না আসে। গুপ্তস্থানের পশম বেশি বেশি পরিস্কার রাখা। গুপ্তস্থানের পশম উপড়ান উত্তম। সম্ভব না হলে কোনোভাবে পরিস্কার রাখা।

মাসের প্রথম রাত, আমাবশ্যার রাত ও মাসের শেষ রাতে সহবাস না করাই উত্তম। কেননা এ তিন রাতে শয়তানের বিস্তার বেশি হয়ে থাকে। ঈদের রাতে, ফলদার বৃক্ষের নীচে এবং দাঁড়িয়ে সহবাস করলে আগত সন্তান অধিকাংশ নির্ভীক, বদ ও দাঙ্গাবাজ হয়ে থাকে। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের রাতে, রাতের অন্ধকার নেমে আসার সময়, রাতের প্রথমাংশ যখন খাবারে পেট ভরপুর থাকে, এসব সময়ের সহবাসে সন্তান হলে অধিকাংশ সন্তান বে-আকল ও নির্বোধ হয়ে থাকে।

কক্ষে সন্তান বা আরেক সতীন নিদ্রায় থাকাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে সন্তান হলে অধিকাংশ সন্তান ব্যভিচারের খাছলত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে অযুবিহীন হালতে সহবাস না করা। এতে আগত সন্তান কৃপণ ও কঞ্জুস স্বভাব নিয়ে জন্ম নেয়।

সহবাসের পর পরই ঠাণ্ডা পানি বা ঠাণ্ডা কোনো জিনিস ব্যবহার না করা। কেননা সে সময় সম্পূর্ণ শরীর গরম থাকে, ঠাণ্ডা কিছু পেলে সে খুব দ্রুত গ্রহণ করে। ফলে মুখ ঝলসানো, কাঁপুনি, দুর্বলতা ও ফুলা রোগ হয়ে থাকে।

সহবাসের পর উভয়ের গুপ্তস্থান ভিন্ন ভিন্ন নেকড়া দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। এক কাপড় দ্বারা পরিস্কার না করা। এতে পরস্পরের মাঝে অমিল ও দুশমনী সৃষ্টি হতে পারে। অপবিত্র অবস্থায় কোনো কিছু খাওয়া ও পান করা উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা অভাব-অনটন দেখা দিতে পারে। উত্তম হল সহবাসের পর গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করা। গোসল সম্ভব না হলে কমপক্ষে অবশ্যই অযু করা উচিত।

ভরপেটের সহবাসে সুগারের রোগ দেখা দিতে পারে। এজন্য রাতের শেষ প্রহরে সহবাস উত্তম। আদাবুস সালেহীন কিতাবে রাতের প্রথম দিকে সহবাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কোনো দিন সহবাস করতে পারবে। এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে যৌনবিদ ও বুযুর্গগণ যেসব দিনে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন সেসব দিনে সহবাস না করাই উত্তম।

জুমার রাতে সহবাস করা সর্বোত্তম। নবীগণ, আওলিয়াগণ, উলামায়ে কেরাম, হেকিমগণ এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞ ডাক্তাররা জুমআর রাতে সহবাস করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

জুমআর রাতে সহবাস করার দ্বারা যে সন্তান জন্ম নেয়, অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তারা সাধারণত সৎ, নেককার, আবেদ, পরহেযগার হয়ে থাকে।

ঋতুস্রাব ও নেফাস চলাকালিন স্ত্রী সহবাস করা মারাত্মক গোনাহ। ঘটনাক্রমে যদি সহবাস হয়ে যায়, তাহলে খাছ দিলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সম্ভব হলে কিছু দান সদকা করা উচিত।

যার স্ত্রী অধিক সুন্দরী ও রূপসী, তার সহবাস করার মজাটাই ভিন্ন। এর দ্বারা যদিও বীর্য তুলনামুলক বেশি নির্গত হয়, তবুও তার প্রতি আসক্তির কারণে আত্মার মাঝে এক ধরণের শান্তি অনুভব হয়। আত্মার এ প্রশান্তির দ্বারা বীর্যও বেশি বেশি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যার স্ত্রী নাবালেগ বা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পন করেছে, এমন স্ত্রীর সাথে সহবাস না করা। তদ্রুপভাবে স্ত্রীর মন মেযায ভালো না থাকলে বা যেসব স্ত্রীর মুখে দুর্গন্ধ রয়েছে, তাদের সাথেও সহবাস না করা উচিত। স্ত্রী যদি একেবারে হালকা পাতলা ও দুর্বল হয় এবং সহবাসের প্রতি তার কোনো আগ্রহ না থাকে, তাহলে তার সাথে সহবাস করবে না। যেসব অবস্থায় সহবাস করা নিষেধ নিম্নে তা উল্লেখ করা হল–

যেসব অবস্থায় সহবাস করা অনুচিত

❖ মহিলাদের মাসিক বা ঋতুস্রাব অবস্থায়।

❖ নিফাস (অর্থাৎ মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের পর চল্লিশ দিন বা এর কমে যে কয়দিনে রক্ত আসা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়) অবস্থায়।

❖ কাজের ব্যস্ততা বেশি থাকলে সে সময়।

❖ চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী ও বিচলিত অবস্থায়।

❖ দুর্বল ও ক্লান্ত অবস্থায়।

❖ মাতাল অবস্থায়।

❖ পেশাব-পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায়।

❖ একেবারে খালি পেটে অথবা ভরপেটেও সহবাস না করা।

❖ যাদের গনোরিয়া রোগ রয়েছে, তাদের জন্যও অনুচিত।

❖ প্লেগরোগ, অসুস্থ অবস্থা ও জীবাণুযুক্ত বাতাস প্রবাহের সময়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো এই বইয়ে সংক্ষিপ্তাকারে এবং 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হল–

❖ দেখতে অসুন্দর, যার সাথে মনের মিল হবে না বা যার প্রতি মনের কোনো প্রকার চাহিদা নেই, এমন মেয়েকে বিবাহ না করা। এজন্যই বিবাহের পূর্বে মেয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। যে স্ত্রীর প্রতি মনের কোনো প্রকার চাহিদা জাগে না, তার সাথে সহবাস করলে পুরুষের শরীরে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। হযরত লোকমান হাকীম তার ছেলে আরজমন্দ কে নছীহত করেছিলেন যে, বদছুরত মহিলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা, সে নিজে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে।

❖ অসুস্থ স্ত্রীর সাথে এজন্য সহবাস করবে না যে, তার মন মানসিকতা আপাতত সহবাসের প্রতি আগ্রহী নয়। এ ছাড়াও তার রোগে স্বামীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

❖ বৃদ্ধা মহিলার সাথেও সহবাস না করা। কেননা, তার সাথে সহবাসের দ্বারা পুরুষের লিঙ্গে দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। বৃদ্ধার লজ্জাস্থান শুকনো ও ঢিলে হওয়ার কারণে সহবাসে পুরুষরা তেমন একটা মজা অনুভব করে না। আর মজা কম অনুভব করার দ্বারা পুরুষদের সহবাসের আগ্রহে বিঘ্ন ঘটে। যা তাকে ধিরে ধিরে সহবাসে দুর্বলমনা বানিয়ে দেয়। বৃদ্ধাদের লজ্জাস্থানের ভিতরে সবসময় ঠাণ্ডা থাকে যা পুরুষাঙ্গের জন্য ক্ষতিকর। কেননা সহবাসের পর ঠাণ্ডা পানি বা ঠাণ্ডা কিছু ব্যবহার করাই নিষেধ। সুতরাং সে স্থানে সহবাসে পুরুষরা অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখিন হবে। আরেক ক্ষতির দিক হল, মহিলা বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার কারণে তার জরায়ু পুরুষের বীর্যকে খুব চুষে থাকে, ফলে পুরুষের চেহারায় ঔজ্জল্যতা হ্রাস পাওয়ার আশংকা রয়েছে এবং দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তবে বৃদ্ধা মহিলা যদি দেখতে অপরূপা ও সুন্দরী হয়, যাকে দেখলে এখনও সহবাসের ইচ্ছা জাগে, তার সাথে সহবাসে ক্ষতির সম্ভবনা কম।

বি.দ্র. মহিলাদের বয়স যখন পঞ্চাশের উর্ধে চলে যায়, তখনই তারা বৃদ্ধের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

❖ নর্তকী, বাজারী বা বেশ্যা নারীর সাথে সহবাসে এইডস নামক মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে। অনেক মানুষের বীর্য এসব নারীদের

লজ্জাস্থানে নির্গত হয় এবং এর প্রভাবে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ সৃষ্টি হয়, যার প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি সন্তানাদির উপরও পড়ে।

❖ হামেলা বা গর্ভধারীনি নারীর সাথেও সহবাস না করা। বিশেষ করে গর্ভবতী হওয়ার প্রথম থেকে তৃতীয় মাস পর্যন্ত এবং অষ্টম থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সহবাস না করা উচিত। এ সময়ে বাচ্চাদানিতে নাড়াচাড়া মাত্রাতিরিক্ত হলে অনেক সময় গর্ভপাত হয়ে যায়। বিশেষ করে যে পুরুষদের লিঙ্গ বেশ লম্বা তারা যদি গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন, তবে অধিকাংশ মহিলার গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে। কেননা গর্ভাবস্থায় মহিলাদের লজ্জাস্থানে গরমের ভাব তুলনামুলক বেশি থাকে। এর সাথে যদি সহবাসের গরম যোগ হয়, তাহলে অতি সহজেই গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

❖ যেসব মহিলাদের মুখে দুর্গন্ধজাতীয় রোগ রয়েছে, তাদের সাথেও সহবাস না করা উচিত। কারণ ক্ষুধা ও পিপাসার সময় মুখের দুর্গন্ধ আরো বৃদ্ধি পায়। আর মুখের এ দুর্গন্ধ স্বামীর মনে সহবাসের সুপ্ত খাহেশ হ্রাস পেতে থাকে এবং তার পুরুষত্বে দুর্বলতা দেখা দিয়ে থাকে।

❖ যে স্ত্রী অধিক সময় স্বামীকে নিজের কাছে রেখে তাকে চুম্বন করে, জড়িয়ে ধরে যৌন আকর্ষণে লিপ্ত রাখে, কিন্তু সহজে সহবাস করতে দেয় না। বরং স্বামী সহবাস ব্যতিত বাকী সব আনন্দ দিয়ে মাতোয়ারা করুক এবং শেষ পর্যায়ে সহবাস করুক। স্বামীকে এমন যৌনকাজে লিপ্ত রাখলে, অনেক সময় স্বামীর বীর্যপাত হয়ে যায়। আর এমন হলে স্বামীর মনে দ্রুত বীর্যপাতের ভয় ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা পুরুষের সব সময়ই যৌন চাহিদা জেগে থাকে এবং পুরুষাঙ্গের রগসমূহ স্ফীত হয়ে যায়। সহবাসের পূর্বেই স্বামীর বীর্যপাত হলে মানসিক চিন্তা বেড়ে যায় এবং লজ্জিত হয়ে নিজেকে দুর্বল পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে থাকে। স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে তার এ বিষয়টির স্মরণে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। মানসিকভাবে দুর্বল পুরুষের বীর্যপাত খুব দ্রুত হয়ে যাবে।

যাদের জন্য সহবাস করা ঠিক নয়

❖ যাদের পুরুষাঙ্গ দুর্বল, তাদের স্ত্রী সহবাস করা ঠিক নয়।

❖ কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সহবাস করা অনুচিত।

❖ দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, গোস্‌সা কিংবা শারীরিক মেহনতের কারণে ক্লান্ত থাকাবস্থায় সহবাস করা অনুচিত।

- ❖ যাদের যৌন চাহিদা একেবারেই কম।
- ❖ যাদের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কম।
- ❖ যাদের হজমশক্তি খুবই দুর্বল।
- ❖ যাদের বীর্য পানির ন্যায় তরল।
- ❖ যাদের বক্ষ একেবারে অপ্রশস্ত।

উপরোক্ত ব্যক্তিরা বেশি বেশি সহবাস করলে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার অধিক সম্ভবনা রয়েছে।

যেসব অবস্থায় সহবাস করা ঠিক নয়

❖ ভরপেটে সহবাস করা অনুচিত। এ সময় শরীর খাদ্য হজমে ব্যস্ত থাকে। যদি এ অবস্থায় সহবাস করা হয়, তবে হজমে ত্রুটি হবে। ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হবে। যৌনবিদদের অভিমত হল, রাতের প্রথমাংশে সহবাস না করা উত্তম। কেননা এ সময় পাকস্থলী খাদ্যে ভরপুর থাকে।

❖ খালি পেটেও সহবাস না করা। কেননা অণ্ডকোষদ্বয় বীর্য মূত্রথলী থেকে সন্ধান করে। আর মূত্রথলী তার খাদ্য কলিজা থেকে সংগ্রহ করে। আর কলিজা পাকস্থলী থেকে সংগ্রহ করে। সহবাসের সময় যদি পাকস্থলী খালি থাকে, তবে সহবাসের দ্বারা শরীর একেবারেই দুর্বল হয়ে যাবে। শরীরের দুর্বলতা যৌনচাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। ধীরে ধীরে শরীরের শক্তি হ্রাস পায়। মনের ধুকধুকানী রোগ সৃষ্টি হয়। খালি পেটে সহবাস করা ভরপেটে সহবাস করার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর।

নিম্নোক্ত অবস্থাতেও সহবাস করা অনুচিত

পেটে বদ হজম হলে সহবাস উচিত নয়। দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, চিন্তা, লজ্জা-শরমের অবস্থাতেও সহবাস উচিত নয়। অধিক মেহনতের পর, অধিক গরমের সময়ও সহবাস অনুচিত। কেননা, এসব অবস্থায় সহবাস করলে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরত রাখতে হয়। অন্যথায় শরীর একেবারে ক্লান্ত হয় এজন্য মন তখন আরাম চায়, কোনো প্রকার কষ্ট বা মেহনত করার প্রতি আগ্রহ থাকে না। যেহেতু শরীরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং পেরেশানী বৃদ্ধি পায়, যা মনের চাহিদার বিপরীত। তাই এ অবস্থায় সহবাস না করাই উত্তম।

ঘুম ঘুম ভাব অবস্থায় সহবাস উচিত নয়। বিভিন্ন চিন্তায় ঘুম না আসলে সহবাসের মাধ্যমে নিজেকে দুর্বল বানিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করা অনুচিত। কেননা, ঘুম এমন বিষয় যা শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি দুর করে। কিন্তু সহবাস ক্লান্তি তৈরি করে। দেমাগ ও শরীর যখন আরাম চায়, তখন সহবাস করে নিজেকে ক্লান্ত বানানো ঠিক নয়।

বমির পর, দাস্ত বা পাতলা পায়খানার পর, অম্ল বা তিক্ত ফল খাওয়ার পর এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরপরই সহবাস অনুচিত।

শরীর খুব ঠাণ্ডা অবস্থায় সহবাস না করা। এ সময়ের সহবাসে বেশিক্ষণ অবস্থান করা যায় না এবং মরদামী শক্তি কমতে থাকে।

স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত বা অসম্মতিতে তার সাথে সহবাস অনুচিত। মাঠে, চাঁদনী রাতে, অন্ধকারে, মাসের পনের ও শেষ তারিখ এবং সহবাসের পরই আবার সহবাস অনুচিত। যতক্ষণ না নতুন যৌনশক্তি সৃষ্টি হয়।

মাতাল ও নেশার শেষাবস্থায় সহবাস না করা। এ সময় মানুষের চিন্তা ফিকির ও জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে কিছুই থাকে না। এ অবস্থার সহবাসে যেসব সন্তান জন্ম নিবে তারা বেউকুফ ও নির্বোধ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

যেখান থেকে সূর্য সরাসরি দেখা যায় বা তার কিরণ সহবাসের স্থানে এসে পৌছে সহবাস অনুচিত। এতে যেসব সন্তান জন্ম নিবে, তারা সর্বদা চিন্তা ও অস্থিরতায় ভুগবে।

ফলদার গাছের নিচের সহবাসে সন্তান সর্বদা জালেম বা অত্যাচারি হয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহবাসের দ্বারা সন্তানের চরিত্র খারাপ হয়ে থাকে।

সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় সহবাসের দ্বারা যেসব সন্তান জন্ম নেয়, তারা সাধারণত চোর বাটপার হয়ে থাকে। তদ্রূপভাবে ঈদের রাতে সহবাসের দ্বারা ভূমিষ্ট সন্তান অধিকাংশ সময় খারাপ হয়ে থাকে।

যৌনবিদদের মতে কুরবানী ঈদের রাতে স্ত্রী সহবাসে যেসব সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তারা চার বা ছয় আঙ্গুলবিশিষ্ট হয়ে থাকে। বসে বসে সহবাসে সম্পূর্ণ বীর্য বের হতে পার না। এতে কিডনী বা পেটে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুরুষাঙ্গ ফুলা বা এমন রোগ দেখা দিতে পারে।

একপার্শ্ব থেকে সহবাস করলে মূত্রথলীতে ব্যাথা হতে পারে। কেননা, এভাবে সহবাসের দ্বারা সম্পূর্ণ বীর্য পুরুষাঙ্গ থেকে বের নাও হতে পারে। যা বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

উত্তম হল বিশ বছর বয়সের পূর্বে সহবাস না করা। কেননা এর পূর্বে যৌন চাহিদার পূর্ণ শক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং বিশ বছরের আগে কোনো মহিলার নিকট এবং ষাট বছর অতিক্রমের পর সহবাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত। এসময় সাধারণত বীর্য থাকে না। হাড্ডি যখন দুর্বল হয়, তখন সহবাসে শরীর একেবারেই দুর্বল হয়ে যাবে। ভূমিকম্পের সময়, ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসলের আগেই সহবাস অনুচিত।

বি. দ্র. উপরে উল্লেখিত বিষয়ে যত্নবান থেকে নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক পরিচালনা করা উচিত। অন্যথায় নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

সহবাস করার পদ্ধতি

সহবাস করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইতে একাধিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এখানে কেবল ঐ পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হবে, যা স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্যই উপকারী ও সন্তান জন্ম নেয়ায় অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

সহবাসের সূচনাতেই স্বামীকে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমে স্ত্রীর বীর্যস্খলন করাতে হবে এরপর নিজের বীর্যপাত ঘটাতে হবে। এজন্য কয়েকটি সূরত হতে পারে। যেমন—

সহবাসের পূর্বে চুম্বনে চুম্বনে পাগলীনি বানিয়ে ফেলবে, আলিঙ্গন করবে, স্তনের বোটা নাড়াচাড়া করবে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। সুঁড়সুঁড়ি, স্তন মর্দন, মলামলি অতিরিক্ত পরিমাণে করবে। মাঝে মাঝে কামনায় ভরপুর ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকবে। এসবে মহিলারা উত্তেজনায় উত্তাল খেলতে শুরু করে। এক সময় সে নিজেই তার ভাব-ভঙ্গিমা দ্বারা বোঝাবে যে, আমি আর সইতে পারছি না, আমাকে কিছু একটা কর। এরপর সহবাসে লিপ্ত হবে। তখন অল্প সহবাসেই স্ত্রীর বীর্যপাত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে স্বামী নিজেকে সংযত রাখবে। অধিক উত্তেজিত হবে না, এতে সামান্য সময়ে নিজেরই বীর্যপাত হয়ে যাবে।

যেভাবে মহিলাদের কাম-উত্তেজনা জাগাতে হবে

নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করলে অতি দ্রুত মহিলাদের কাম উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। যথা–

১। মুখ, কপাল, গাল ইত্যাদি স্থানে ঘন ঘন চুম্বন ও ধীরে ঘর্ষণ করা।

২। সহবাসের পূর্বে মহিলার দেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করা। ধীরে ধীরে তা নাড়াচাড়া করলেও কাম উত্তেজনা জেগে উঠে।

৩। যৌন ইন্দ্রিয়গুলো স্পর্শ, ঘর্ষণ-মর্দন করলেও উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়।

৪। বিশেষ করে স্তন ও ভগাঙ্কুর মর্দনে কাম উত্তেজনা জাগায় সহায়ক।

৫। প্রয়োজনে ধীরে ধীরে আঘাত, দংশন বা নিপীড়ন করা চলে।

সহবাসের আগে স্ত্রীকে ভালোভাবে উত্তেজিত করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় স্ত্রী অতৃপ্ত থেকে যেতে পারে।

সহবাসের গুরুত্ব

সহবাসের পূর্বে যে ঘরে সহবাস করবে সেটা খুব ভালোভাবে পরিস্কার করবে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। ঘরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা মনে আনন্দ তৈরি করে। অপরিস্কার অগুছানো থাকলে মনে বিরক্তি ভাব দেখা দেয়। আর এ সময় সহবাস করলেও মনে তেমন একটা তৃপ্তি অনুভব হয় না। সহবাসের ঘরে যেন অন্য কোনো লোক না থাকে। অন্যের উপস্থিতি স্ত্রীকে লজ্জা শরমের পর্দায় আবৃত করে নেয়। মনে সহবাসের পূর্ণাঙ্গ সুখ অনুভব হয় না। মনে প্রফুল্লতা তৈরি হয় না।

পালঙ্কের উপর সহবাস করা যদিও উত্তম, তবে যমীনের উপর নরম তোষক বা গদি বিছিয়ে সহবাসের মজাই আলাদা। এতে পুরুষাঙ্গের মাথা মহিলাদের গুপ্তস্থানের রেহেমের সাথে অতি দ্রুত মিলে যায়।

বিছানা ও ঘর খুশবু দ্বারা সুঘ্রাণ বানিয়ে হালকা আলোর ব্যবস্থা রাখা। স্ত্রীকে নিজের বাম পাশে বসিয়ে মিষ্টি মিষ্টি রসালাপ করতে থাকা। এমন রম্য কথা বলা যেন স্ত্রীর মনেও সহবাসের প্রতি আগ্রহ জন্মে। এভাবে পুরুষের মনেও সহবাসের অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বীর্য তুলনামুলক বেশি সৃষ্টি হয়। মিষ্টি মিষ্টি কথায় পুরুষাঙ্গে যথেষ্ট শক্তি আসে এবং তা মজবুত ও শক্ত হয়।

সহবাসের পূর্বে প্রয়োজনে স্ত্রীকে পেশাব করাবে। তবে সহবাসের পর উভয়ের জন্য পেশাব করা জরুরি।

সহবাসের সূচনা

সহবাসের সূচনা এভাবে করবে, প্রথমে স্ত্রীকে মহব্বত ভালোবাসার রসালাপ করে সহবাসের প্রতি পাগলিনী বানিয়ে ফেলবে। স্তনের বোটাদ্বয় দু-

আঙ্গুল দ্বারা ধরবে এবং আস্তে আস্তে এমনভাবে ডলাডলি করবে, যেন বোটাদ্বয় শক্ত ও স্ফীত হয়ে যায়।

মহিলাদের স্তন টিপার কারণ হল, স্তন মলা বা ডলাডলি করা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির অন্যতম উপায়। এবং এটির সম্পর্ক বাচ্চাদানির সাথে। স্তন স্পর্শ করার দ্বারা মহিলাদের সাথে সহবাসের প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরি হয় এবং এর দ্বারা মহিলারাও বেশ আনন্দিত হয়।

আঙ্গুলের মাথা দ্বারা মহিলার দু-রানে হালকাভাবে স্পর্শ করে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে টানবে এবং উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নিয়ে যাবে। মহিলার জিহ্বা নিজের মুখে নিয়ে মহিলার নিচের ঠোঁট চুষতে থাকলে তারা অতিদ্রুত সহবাসের জন্য পাগলীনি হয়ে যায়। কিছুক্ষণ এরূপ করার পর তাদের অবস্থা যখন বেচেইন হয়ে যাবে, তখন সহবাস করলে খুব সহজেই বীর্যপাত ঘটানো যাবে। এভাবে সহবাস করলে পুরুষের পূর্বেই মহিলার বীর্যপাত হবে।

বি.দ্র. ঃ নারীর কোন্ স্থান মর্দন বা টিপলে তাদের মন খুশি হয় ও তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১। দুটি কাঁধ ২। মাথা ৩। স্তনবৃত্ত ৪। পাছা ৫। পিঠ

৬। স্তন দুটির মাঝখানের বোটা হালকাভাবে ডলাডলি করা।

৭। তলপেটে হালকাভাবে হাতের ছোঁয়া দেয়া।

সহবাসের পর যা করতে হবে

❖ সহবাসের পর উভয়েই কিছু সময় অবস্থান করবে। এতে মানসিক তৃপ্তি হয়। ধীরে ধীরে দেহ শীতল হয়। প্রেম-প্রীতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

❖ এরপর উভয়ে স্বীয় যৌনাঙ্গ ভালোভাবে ধৌত করবে। এটি অবশ্য পালনীয় তবে সহবাসের কিছুক্ষণ পর।

❖ উভয়ে ভালোভাবে গোসল করবে। গোসল না করলে মন সঙ্কোচিত হয়ে থাকে, কাজ-কর্মে প্রফুল্লতা আসে না, বরং একঘেয়েমি আসে।

❖ শর্করা মিশ্রিত এক গ্লাস পানি কিঞ্চিত লেবুর রস বা দধি কিংবা শুধু ঠাণ্ডা পানি কিছু খেতে হবে। এতে শরীরের মঙ্গল হয়।

❖ প্রয়োজনে ক্ষতিপুরক কোনো ঔষধ সেবন করা যেতে পারে।

❖ সহবাসের পর ঘুমান একান্ত প্রয়োজন।

❖ সহবাসের আগে বা পরে নেশা সেবন করা ভালো নয়। এতে দৈহিক ক্ষতি হয়। মানসিক অসাড়তা আসতে পারে।

❖ সহবাসের পর অধিক রাত্রি জাগরণ, অধ্যয়ন, শোক প্রকাশ, কলহ, কোনো দুরূহ বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা ও মানসিক কোনো উত্তেজনা ভালো নয়।

বি.দ্র. ঃ স্ত্রী সহবাসের বিশেষ কিছু পদ্ধতি এবং দীর্ঘক্ষণ সহবাস করার তদবীর 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গর্ভ সঞ্চারের তরিকা

যদি কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান নিতে চায় এবং সহবাসের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম হোক কামনা করে, তাকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

❖ সহবাসের পর স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বুকের উপর নিজের ওজন স্ত্রীর শরীরে না দিয়ে শুয়ে থাকবে। যেন নিজের বীর্য স্ত্রীর রেহেমের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং পুরুষাঙ্গে সামান্যতম বীর্যও অবশিষ্ট না থাকে। এ বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে যে, স্ত্রীর গুপ্তস্থানে পুরুষাঙ্গ কম্পিত অবস্থায় আছে কিনা? কোনো অবস্থাতেই বাইরে বের করবে না। পুরুষাঙ্গ যখন ঠাণ্ডা ও নিস্তেজ হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর বাইরে বের করে আনবে। এরপর সাথে সাথেই নরম ও মোলায়েম নেকড়া দ্বারা পেঁচিয়ে রাখবে। কোনো অবস্থাতেই যেন ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে। কেননা ঠাণ্ডা বাতাস লাগার দ্বারা পুরুষাঙ্গের শিরা বা রগসমূহ দুর্বল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন পুরুষাঙ্গ একেবারে ঠাণ্ডা ও নরম হয়ে যাবে তখন ধীরে ধীরে পেঁচানো নেকড়া দিয়ে তা পরিস্কার করবে।

❖ সহবাসের পর স্ত্রীকে আধা ঘণ্টা সময় চিত হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, কোনো নড়াচড়া করা যাবে না। নড়াচড়া করলে বীর্য রেহেমের বাইরে বের হয়ে আসার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য সে তার দুই রান দ্বারা লজ্জাস্থানকে চেপে ধরে এমনভাবে শুয়ে থাকবে যেন, সামান্য বাতাসও ভিতরে যেতে না পারে। এভাবে বীর্য বাচ্চাদানির গভীরে পৌঁছে এবং নিজের স্থান নিয়ে নেয়। এ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে আরো ভালো।

❖ বাচ্চাদানি এটি একটি উপুড় করা অঙ্গ। সুতরাং সহবাসের পর উঠ-বস বা নড়াচড়ায় বীর্য বের হয়ে যায়। এজন্য বাচ্চা কামনা করলে, তাকে

আল্লাহর উপর ভরসা করে চুপ চাপ দুই রান চেপে ধরে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া না করার ফায়েদা হল, আসলে বাচ্চাদানিতে বীর্য প্রবেশের পরই তার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এজন্য মহিলারা সে সময় যেমন শান্ত থাকবে, সন্তানের অবস্থানও তেমন মজবুত ও স্থায়ী হবে।

সহবাস থেকে ফারেগ হয়ে যে আমল করতে হবে

সহবাসের পর পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষকে নিম পাতার গরম পানি দ্বারা ধৌত করবে। উত্তম হল সে সময়ই গোসল করা। কেননা, গোসল করার দ্বারা শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্বলতাভাব দূর হয়ে যায়। শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের শক্তি পুনরায় ফিরে আসে। মনে আনন্দ লাগে, শরীরটা ফুরফুরে হয়।

গরমকালে ঠাণ্ডা পানির দ্বারা গোসলে কোনো সমস্যা নেই। তবে তৎক্ষণাৎ গোসল করতে নেই। কেননা, পানির ঠাণ্ডা পুরুষাঙ্গের শিরাসমূহকে দুর্বল বানিয়ে দেয়। সহবাসের পর ঘুম আসলে ঘুমিয়ে যাবে। এতে শরীরের ক্লান্তি ও দুর্বলতা কমে যাবে। শরীর ও মন চাঙ্গা হবে। শরীরে পূর্বের শক্তি ফিরে আসবে।

সহবাসের পর যে খাবার খেতে হবে

সহবাসের পর অবশ্যই কোনো মিষ্টি জাতীয় ফল বা খাবার খাবে। অথবা হালকা গরম ধরনের কিছু খাদ্য খাওয়া খুবই জরুরি। যেমন-গাজরের হালুয়া, ডিমের হালুয়া, মধু মিশ্রিত দুধ, বাদামের হালুয়া। খাওয়ার মতো কিছুই না পেলে শুধু মধু থাকলেও খেয়ে নিবে। একেবারে না খেয়ে থাকবে না। খাওয়ার মতো যা পাবে তা-ই খাবে।

সাবধান! সহবাসের পর কোনো ক্রমেই ঠাণ্ডা কোনো কিছু খাবে না। এমনকি ঠাণ্ডা পানিও পান করবে না। সহবাসের পরপরই গোসল করবে না। যদি অধিক তৃষ্ণা পায়, তবে কিছু সময় পরে পানি অথবা দুধ পান করবে। তবে তা অবশ্যই হাত ধৌতের পর। বর্তমানে এক ধরনের ট্যাবলেট রয়েছে, যা খেলে সহবাসে যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা পুরণ হয়।

সহবাসের উত্তম সময়

কোনো প্রকার বদ খেয়াল ও কু-চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সহবাসের প্রতি যখন

মন আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, তখনই সহবাস করার উত্তম সময়। তদ্রূপভাবে পেটের খাবার হজম হওয়ার পরও সহবাস উত্তম। কেননা ভরপেটের সহবাসে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। পুরুষের বীর্য তরল ও পাতলা হওয়ার যতগুলো মাধ্যম রয়েছে, তন্মধ্যে ভরপেটে সহবাসও একটি মাধ্যম। এজন্য খাবারের দু-ঘন্টা পরে সহবাস করবে। খাবার হজমের পর যে সহবাস করা হয় এবং এর দ্বারা যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, চালাক-চতুর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত মূসা কাযিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাতের প্রথমাংশে নয় বরং রাতের শেষভাবে সহবাস করবে। কেননা, এ সময় সহবাস করলে সব ধরণের আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। দিনের তুলনায় রাতে সহবাস উত্তম। যেসব লোক সারা দিন কাজ-কামে খুব ব্যস্ত থাকে, তাদের জন্য রাতের প্রথম দিকে শুয়ে পড়া উত্তম। রাতের শুরুতে আরাম এবং শেষ রাতে স্ত্রী সহবাস করবে। ক্লান্ত ও অলস শরীরের সহবাসে সাধারণত সন্তান জন্ম নেয় না।

মহিলাদের যৌনচাহিদার আলামত

মহিলাদের মনে কখন সহবাসের আগ্রহ জাগে? এ বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম, যা উপলব্ধি করা বড় কঠিন। কেননা একেক নারীর যৌন চাহিদা জাগার একেক আলামত পাওয়া যায়। তবে নিম্নোক্ত আলামতগুলো অধিকাংশ মহিলাদের যৌন চাহিদা জাগার প্রমাণ হিসাবে পাওয়া যায়। যথা–

১। সময়ে অসময়ে চুল আঁচড়ান বা বেশি বেশি চুল আঁচড়ান।

২। বিনা প্রয়োজনে বক্ষ খোলা ও বন্ধ করা।

৩। স্তন আপন হাতেই মলা বা টিপা।

৪। বারংবার হাঁই তোলা বা হাঁচি দেয়া।

৫। মাঝে মাঝে উভয় হাত মাথায় ফিরান বা বুলান।

৬। নিজের ছোটো বাচ্চাকে বুকের সাথে চেপে ধরা।

৭। কোনো বাচ্চাকে নিজের বুকের [স্তনের] উপর শুয়ানো এবং আদর করা বা বাচ্চার মাধ্যমে নিজে আদর গ্রহণ করা।

৮। আঙ্গুল দ্বারা কান চুলকান।

৯। একাকী বিশ্রাম করা।

১০। হঠাৎ করে অলংকার পরিধান করা কিংবা সুরমা ব্যবহার করা।

পুরুষ ও মহিলার উত্তেজনায় পার্থক্য

সহবাসের শুরুতে পুরুষরা যথেষ্ট উত্তেজিত হয় কিন্তু একবার বীর্যপাত হয়ে গেলে পুনরায় সহবাস শুরু করলে পূর্বের মত উত্তেজনা থাকে না।

মহিলাদের উত্তেজনা ভিন্ন রকমের। সহবাসের শুরুতে বিশেষ আগ্রহ থাকে না। কিন্তু সহবাস কিছুক্ষণ চললে ক্রমশঃ তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে পুরুষের বীর্যপাত হলেও মহিলারা সহবাসে আগ্রহী থেকেই যায়। এজন্য যৌনবিদদের অভিমত হল- মহিলাদের সাথে সহবাস করতে হলে প্রথম থেকেই সহবাস করা উচিত নয়। প্রথমে মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা দরকার, তারপর তাকে চুম্বন, দংশন, নখচ্ছেদ ও আলিঙ্গন ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়া করা উচিত।

এ সকল প্রাথমিক রসালাপ, অঙ্গ-মর্দন, অধর চুম্বন ইত্যাদিতে যখন কামেচ্ছা প্রবল হবে, তখন সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

পূর্ণ তৃপ্তি

এমন ঘটনা অনেকেই বলে যে, পুরুষের বীর্যপাতের পরেও নারীর সম্পূর্ণ যৌনতৃষ্ণা মিটে না। তখন এক পুরুষের বীর্যপাত ঘটলেও অন্য পুরুষকে সে কাম চরিতার্থবশত পাওয়ার ইচ্ছা করে।

পুরুষের বীর্যপাত ঘটলেই পুরুষাঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এবং সে আর সেই মহিলা বা অন্য নারীতে সঙ্গম করতে চায় না। কিন্তু নারীর অন্যরকম ঘটে। তার যোনিদেশ থেকে রস বের না হওয়ার পর্যন্ত তার রমন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এ হীনমন্য নারীরা অন্য পুরুষও গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং বেশ কিছু বিলম্বে তার চরিতার্থ ঘটে। যখন তার যোনিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে রসস্রাব ঘটে, তখনই তার তৃপ্তি হয়ে থাকে।

মহিলাদের কখন অধিক যৌন চাহিদা জাগে

নিম্নোক্ত সময়ে মহিলাদের মাঝে অন্য সময়ের তুলনায় কামভাবের চাহিদা বেশি জাগে। যথা–

১। স্বামী থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার সময়।

২। ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত হওয়ার পর।

৩। সন্তান জন্মের চল্লিশ দিন পর।

৪। গর্ভবতী হওয়ার দুই মাস পর।
৫। উলঙ্গ ফটো বা ফিল্ম দেখার সময়।
৬। নাচ-গান শোনার সময়।
৭। শীতকালে যখন একাকী শুয়ে থাকে।
৮। বৃষ্টি হওয়ার সময়।
৯। বাগান, উদ্যান ও পার্কে সময় কাটানোর সময়।
১০। পর পুরুষের প্রশংসা শুনলে।
১১। কারো নিকট সহবাসজনিত কথা শুনতে থাকলে।
১২। পুরুষে স্পর্শ করলে কিংবা জড়িয়ে ধরলে।
১৩। গহনা, অলঙ্কার কিংবা ভালো পোষাক পরিধান করলে।
১৪। আতর, খুশবু, সেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার অবস্থায়।
১৫। গোসলখানায় একাকী গোসল করার সময় নিজের শরীরের গঠনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালে।

মধ্যমপন্থায় সহবাস করবে

খাবার দাবারে যেমন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হয়। ঠিক সহবাসের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অধিক সহবাস স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমন একেবারে কম সহবাস করাও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যৌনশক্তির দিক দিয়ে সব মানুষ এক রকম নয়। কারো যৌনশক্তি বেশি আবার কারো যৌনশক্তি কম। কিছু লোক এমন রয়েছে যারা একরাতে কয়েকবার সহবাস করেও দুর্বল হয় না। আবার কিছু লোক এমন আছে, যারা এক রাতে দুইবার সহবাস করলেই একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। আবার অনেক পুরুষ এমন রয়েছে যে, পনের দিনের মধ্যে কিংবা মাসে মাত্র একবার সহবাস করে।

সহবাসের বিষয়টি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লাগার মতো। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময় যেমন খাওয়া বা পান করতে হয়, সহবাসের বিষয়টিও তেমন। সহবাসের আগ্রহ ও ইচ্ছা না জাগলে সহবাস অনুচিত। সহবাসের দ্বারা যদি শরীরে ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব হয় তবে এই সহবাস মধ্যমপন্থা অতিক্রম করেছে।

সকল মানুষকে তার সহবাসের শক্তি নিজে নিজে বুঝতে হবে। সাধারণত মোটা ও মজবুত লোকদের জন্য সপ্তাহে একবার সহবাস করা উচিত। অধিক সহবাস সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

নিম্নোক্ত লোকদের অধিক সহবাস করা খুবই ক্ষতিকর-

১। যাদের শ্বাসকষ্ট রয়েছে, তাদের জন্য অধিক সহবাস খুবই ক্ষতিকর।
২। কাশির সাথে যাদের রক্ত আসে, তারা এ থেকে বিরত থাকবে।
৩। যাদের চোখের দৃষ্টি দুর্বল।
৪। যাদের পাকস্থলী ও যকৃৎ দুর্বল।
৫। যাদের সবসময় পেশাব ঝরতে থাকে।

অধিক সহবাসের ক্ষতি

মাত্রাতিরিক্ত কোনো জিনিসই ভালো না। আবে হায়াতও অধিক পান করা ভালো নয়, অন্যথায় এটা বিষ হয়ে যায়। অতিরিক্ত কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক বর্ণিত মহব্বতই প্রশংসাযোগ্য। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা চাই। বিশেষ করে সুস্বাদু ও মজাদার বস্তু খাওয়ার মাঝে কখনোই অতিরিক্ত করা ঠিক নয়। অধিক সহবাসের কারণে গর্ভধারণের শক্তিও হারিয়ে ফেলার সম্ভবনা রয়েছে। কেননা অধিক সহবাসে পুরুষের বীর্য ও মহিলার ধাতু পাতলা হয়ে যায়। যুবক-যুবতীরা তাদের যৌবনকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করে দিওয়ানা হয়ে সহবাসের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে অমূল্য সম্পদ বীর্যকে নষ্ট করে ফেলে। তাদের খেয়ালই নেই যে, এক ফোটা বীর্য সত্তুর ফোটা রক্তের নির্যাস। এক ফোটা বীর্য উৎপাদন হতে সত্তর ফোটা রক্ত ব্যয় হয়। এই দামী জিনিসকে মাত্রাতিরিক্ত সহবাস করে নষ্ট করে দিচ্ছে। এক সময় তাদের অবস্থা এমন হয় যে, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে থাকে। অবশেষে কোনোভাবে সহবাসের জন্য বিভিন্ন হেকিম-ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হয়ে ঔষধের মাধ্যমে সহবাস করতে হয়। অথচ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সহবাস করলে আজ তাকে এসব জ্বালা সহ্য করতে হত না। হত না নিজেকে ধিক্কার দিতে।

অধিক সহবাসে স্ত্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়

অধিক সহবাসে যেভাবে পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তদ্রূপভাবে নারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরুষের ন্যায় মহিলারাও দুর্বল হয়ে যায়, সুস্থ থাকে না। সুস্থ ও সবল সন্তান জন্ম দেয়ার শক্তি থাকে না। গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা উচিত নয়। গর্ভের প্রথম মাসে অধিক সহবাস করার দ্বারা অনেক সময় দুর্বল

গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। অধিক সহবাসে বড় ধরনের রোগ-ব্যাধিও দেখা দেয়। যে সুস্থ ও সবল সন্তান কামনা করে, তাকে স্ত্রী গর্ভের প্রথম ও শেষ মাসে সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। একমাস অতিক্রম না হলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তাই গর্ভের প্রথম মাসে সহবাস করবে না।

অধিক সহবাসের দ্বারা তারাই আরাম বোধ করে, যাদের শরীরে অধিক যৌনোত্তাপ রয়েছে, যাদের শরীরে রক্ত মাত্রাতিরিক্ত এবং মনীও বেশি।

গর্ভবতী মহিলাকে খুব সতর্ক হতে হবে

যখন কোনো মহিলা গর্ভবতী হবে, তখন তাকে খুব সতর্কতার সাথে চলতে হবে। নিজের পেটের বাচ্চাকে ভালো রাখতে গর্ভবর্তী স্ত্রীকে অনেক কিছু বর্জন করতে এবং অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়। যেমন–

❖ গর্ভবতী অবস্থায় ভারী কোনো বোঝা বা অন্যকিছু উঠাবে না।

❖ অধিক গরম কোনো কিছু খাবে না।

❖ বেশি ঠাণ্ডা কোনো কিছু যেমন আইস্ক্রিম কিংবা ফ্রিজের ঠাণ্ডা, বাসি খাবার খাবে না।

❖ অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী রোযা রাখবে না।

❖ যে সব খাবার হজম হতে অনেক সময় লাগে এমন খাবার খাবে না।

❖ দ্রুত হাঁটবে না, দৌড়ানো একেবারেই নিষিদ্ধ।

❖ উল্টা হয়ে শুবে না। কেননা গর্ভবতী অবস্থায় এভাবে শুলে অনেক সময় বাচ্চা পাগল বা মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

❖ অধিক ঘুমাবে না। কেননা এ সময়ে বেশি ঘুমালে সন্তান মোটা, বোবা ও অন্যান্য রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

❖ মাত্রাতিরিক্ত টক জিনিস খাবে না। কারণ এর দ্বারা সন্তান কোষ্ঠরোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

❖ মাত্রাতিরিক্ত লবণ খাবে না। এর দ্বারা মাথার রোগ হতে পারে।

❖ অধিক সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

❖ অধিক নড়াচড়া থেকেও বেঁচে থাকতে হবে।

❖ চিন্তা করবে না, রাগ করবে না এবং পেরেশানও হবে না।

❖ বাথরুম ও টিউবলপাড়ে খুব সতর্কতায় যাতায়াত করবে। অনেকেই এসব স্থানে পিছলে পড়ে যায় এবং গর্ভের সন্তান মারা যায় কিংবা পড়ে যায়।

- ❖ কোনো ব্যক্তির চিৎকার ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখবে না।
- ❖ কোনো ঝগড়া কিংবা মারামারিতে যাবে না।
- ❖ ভয়ানক ফটো দেখবে না।
- ❖ দূষীত আবহাওয়া থেকে বেঁচে থাকবে।
- ❖ পাতলা পায়খানা হওয়ার মতো কোনো কিছুই খাবে না। যদি এ রোগ হয়ে যায়, তাহলে বুঝে শুনে ঔষধ খাবে।

এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ, সবসময় তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবে।

সহজে সন্তান ভুমিষ্টের পরীক্ষিত আমল

সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া কত কঠিন ও কষ্টের বিষয়, তা কেবল যার সন্তান হয় সেই বুঝতে পারে। কি-যে অসহ্য যন্ত্রণা একমাত্র সে-ই অনুধাবন করতে পারে, কাউকে বলে বোঝানো অসম্ভব। সামান্য গুড়ে সুরা 'আম্মা এতাসাআলূন' ও সূরা 'ওয়াস্‌সামাই ওয়াত্ তারীক্ব' পড়ে দম করবে। এরপর গর্ভবর্তী মহিলাকে খাওয়ালে আধা ঘণ্টার মধ্যেই ইনশাআল্লাহ হালকা কষ্টেই সন্তান ভুমিষ্ট হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে লেখকের আমলের কিতাব **'পুশীদাহ খাযানে'** দেখা যেতে পারে।

সন্তান প্রসবে যে মহিলার খুব কষ্ট হয়

সন্তান প্রসবের সময় অসহ্য কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে কিছু কিছু মহিলা রয়েছে, যারা কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম। তারা নিম্নোক্ত ঔষধ পান করলে খুবই উপকৃত হবে। এটা পরীক্ষিত চিকিৎসা।

জাফরান ৪ মাশা। গুড়ের সাথে মিলিয়ে খাবে। সাথে সাথে গরম পানি বা গরম দুধ পান করবে। সম্ভব হলে ঔষধটি সেবনের সাথে সাথে মোরগের গোশতের ঝোল বা শুরবা পান করবে। এতে অতি সহজে ও তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসব হবে।

সাময়িক সময়ের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতী গ্রহণ

অনেক সময় এমন হয় যে, স্বামীর যৌনচাহিদা অধিক বেশি। পক্ষান্তরে স্ত্রীর যৌনচাহিদা কম, শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল, স্বাস্থ্যগতভাবে একেবারেই

ক্ষীণকায়, বয়স একেবারেই কম, কিংবা সন্তান নিলে তাকে বাঁচানো মুশকিল হবে। এ ভয়ও হয় যে, তার সাথে সহবাস করলে সে গর্ভবতী হয়ে যাবে কিংবা স্ত্রী মারা যেতে পারে। অথবা বর্তমানে তার দুধের বাচ্চা রয়েছে এ অবস্থায় সহবাস করলে সে গর্ভবতী হয়ে যাবে। যার ফলে তার বুকের দুধ নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমানে দুধের যে বাচ্চা রয়েছে, দুধের অভাবে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চার মা গর্ভবতী হলে তার বুকের দুধ আর পান করার অবস্থা থাকবে না। অনেক সময় এ জাতীয় দুধ পানের দ্বারা বাচ্চা মারাও যায়। কিন্তু এসবের পরও স্বামী তার সাথে সহবাস করতে চায়। এ অবস্থায় স্বামী এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে, যেন স্ত্রী গর্ভবতী না হয় এবং যৌনচাহিদাও পুরণ হয়।

সহবাসের পরও গর্ভবতী না হওয়ার পদ্ধতি

যে সহবাসে সাধারণত স্ত্রী গর্ভবতী হয় না। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

১। সহবাসের সময় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরবে না।

২। সহবাসের সময় যৌন উত্তেজক কোনো অঙ্গভঙ্গিমা দেখাবে না। যেন স্ত্রীর মনে স্বীয় বীর্যপাতের আগ্রহ না জাগে।

৩। উভয় রান উচু করে সহবাস করবে না।

৪। বীর্যপাতের সময় যথাসম্ভব পুরুষাঙ্গ বাহিরের দিকে রাখবে।

৫। উভয়ের বীর্যপাত যেন একসাথে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

৬। বীর্যপাতের সাথে সাথেই স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং স্ত্রীও দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সাতবার কুর্দন করবে। হাচি দিবে যেন স্বামীর বীর্য বাহিরে বের হয়ে আসে। অথবা সহবাসের পরপরই স্ত্রী সাড়ে সাত তোলা তুলসি পাতার রস সেবন করবে। এতেও সন্তান গর্ভে আসবে না।

অভিজ্ঞ হেকিমদের মতে সহবাসের পূর্বে পুরুষাঙ্গে নিমের তেল ব্যবহার করে সহবাস করলে, স্ত্রী গর্ভবতী হবে না। তদ্রুপভাবে স্ত্রী যদি ঋতুস্রাবের পর চোখ বন্ধ করে আরণ্ড গাছের একটি দানা খায়, তাহলেও সে গর্ভবতী হবে না।

বারবার গর্ভপাত হয়ে যাওয়া

অনেক মহিলার গর্ভে বাচ্চা আসার কিছুদিন পরই নষ্ট হয়ে যায় বা পড়ে যায়। অনেকবার এরূপ হওয়ার পরও বাচ্চা থাকছে না। আসলে এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। যেসব মেয়েদের গর্ভপাত জিন শয়তানের কারণে হয়ে

থাকে, সেসব মহিলারা না বুঝে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রহণ করে এমনকি ফকিরদের নিকট গিয়ে বিদআত, শিরকও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসে না। এসব মহিলাকে সব ধরণের চিকিৎসা বাদ দিয়ে জিন-শয়তান সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তার গর্ভ বহাল থাকবে।

ভুল ধারণা

অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা মহিলাদের বীর্যপাতের বিষয়টি বিশ্বাসই করে না। তাদের ধারণা মতে, মহিলাদের বীর্যপাত হয় না বা মহিলাদের বীর্য নেই। অথচ সত্য কথা হল, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও বীর্য রয়েছে। পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও বীর্যপাত হয়। পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয়। বীর্যপাতের পর পুরুষরা যেমন দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করে, ঠিক মহিলারাও দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করে। কেননা, বীর্য সারা শরীর থেকেই আসে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা। পুরুষদের যেমন অণ্ডকোষ রয়েছে, মহিলাদেরও তেমন অণ্ডকোষ রয়েছে। মহিলাদের যদি বীর্য-ই না থাকত, তাহলে তাদের অণ্ডকোষ থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই বীর্যপাতের কারণেই একেক সময় সন্তান বাবার সুরত ধারণ করে আবার কোনো কোনো সন্তান মায়ের সুরত ধারণ করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল কুরআন শরীফ। মহান রাব্বুল আলামীন যিনি বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টিকারী তিনি বলেন–

فلينظر الانسان مم خلق ، خلق من ماء دافق

يخرج من بين الصلب والترائب

'মানুষদের চিন্তা করার বিষয় যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হল, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্ববেগে নির্গত পানি থেকে। অর্থাৎ বীর্য থেকে, যা পুরুষের মেরুদণ্ডের হাড্ডি ও মহিলাদের বক্ষদেশ থেকে বের হয়।'

এজন্যই বলা হয়, যেমন বাপ তেমন বেটা। অর্থাৎ পিতার যেসব অঙ্গ দুর্বল ও কমজোর সন্তানেরও সেসব অঙ্গ দুর্বল ও কমজোর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা বীর্যতো শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে নির্গত হয়।

স্বামী স্ত্রীর বীর্য দ্বারাই সন্তান ভুমিষ্ট হয়

অভিজ্ঞরা বলেন সহবাসের পর যে বীর্যপাত হয়, সে বীর্য কিছুক্ষণ জীবিত থাকে। বিশেষ করে পুরুষের বীর্য মহিলার জরায়ুতে বেশ সময় জীবিত

থাকে। এরপর স্বামীর বীর্য যখন স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখনই সে বীর্য ধীরে ধীরে সন্তানের আকার ধারণ করে।

সুন্দর সন্তান জন্মের কৌশল

হেকিমগণ বলেন, কেউ যদি সুন্দর সন্তান কামনা করে, তাহলে তাকে সহবাসের সময় সুন্দর-সুশ্রী সন্তানের ফটো সামনে রাখতে হবে। বিশেষ করে বীর্যপাতের সময় অবশ্যই সে ফটোর দিকে গভীরভাবে নযর দিবে এবং মনে মনে ভাববে যে, এটা আমার সন্তান বিশেষ। এরূপ করার দ্বারা আশা করা যায়, সুন্দর ও সুশ্রী সন্তান জন্ম নিবে। এটা খুবই পরীক্ষিত আমল।

বি.দ্র. কোনো প্রাণীর ফটো তোলা, ফটো বানানো ও নিজের কাছে বা ঘর বাড়িতে রাখা জায়েয নেই। এ মাসআলার ব্যপারে উলামায়ে কেরামের স্মরণাপন্ন হবে যে, কেবল প্রাণীর চেহারা সামনে রাখা কতটুকু সহীহ?

সৎ সন্তান লাভের চমৎকার আমল

যদি কেউ তার সন্তানকে হেকিম, ডাক্তার, আলেম, জ্ঞানী ইত্যাদি বানাতে চায়, তাহলে গর্ভবতী স্ত্রীকে গর্ভকালীন অধিক সময়ই ঐ জাতীয় কিতাবাদী অধ্যয়ন করতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি তার সন্তানকে কুরআনের হাফেজ বানাতে চায়, তাহলে গর্ভকালীন বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এবং যথাসম্ভব মুখস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর কেউ তার আগত সন্তানকে আলেম বানাতে চাইলে, গর্ভবর্তী স্ত্রীকে গর্ভকালীন সময়ে অধিকাংশ সময় দীনি কিতাবাদী পড়াতে হবে।

সন্তানকে আল্লাহর ওলী বানাতে চাইলে, গর্ভবর্তী স্ত্রীকে সব ধরনের হারাম কাজ ও হারাম মাল খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি বেশি কুরআনে কারীম তেলায়াত করবে। সব সময় অযু অবস্থায় থাকবে। সীরাতে রাসূল ও সাহাবা বেশি বেশি মুতালাআ করবে। বুযুর্গানে দীনের জীবনী ও তাদের তাকওয়া বিষয়ক পুস্তক মুতালাআ করবে। সব ধরণের পাপ-পঙ্কিলতা, ধোকাবাজী ও প্রতারণা থেকে দিলকে পাক সাফ রাখবে। সব কাজেই সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে চলবে। কোনো গর্ভবর্তী মহিলা এভাবে তার গর্ভকালীন সময় কাটালে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তার নবাগত সন্তানকে ওলীর গুণাগুণ দিয়ে ভূমিষ্ট করবেন।

নিজের নবাগত সন্তানকে বীর বাহাদুর ও সাহসী বানাতে ইচ্ছা থাকলে, গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রীকে নবী রাসূল, সাহাবী ও বীর বাহাদুরদের বাহাদুরী বিষয়ক কিতাবাদী বেশি বেশি পড়তে হবে। এতে আপনার সন্তান একজন জানবায মুজাহিদ ও বীর বাহাদুর হবে।

আর যদি নিজে যেমন সন্তানও তেমন হউক এ কামনা থাকলে, গর্ভবতী স্ত্রী তার গর্ভকালীন সময়ে দৈনিক একাধিকবার শিশা ও আয়নায় নিজের চেহারা দেখবে।

ছেলে সন্তান কামনা

মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতে মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়। সে সন্তান ছেলে হবে বা মেয়ে হবে এটা কেবল আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করেন। দুনিয়ার কেউ নিজের ইচ্ছায় ছেলে সন্তান কিংবা মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার কোনো প্রকার শক্তি রাখে না।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আমি যাকে ইচ্ছা করি ছেলে সন্তান দান করি। আমি যাকে ইচ্ছা করি মেয়ে সন্তান দান করি। আমি যাকে ইচ্ছা করি ছেলে-মেয়ে কোনোটাই দান করি না বরং তাকে বন্ধা বানিয়ে রাখি। এসবই আমার নিয়ন্ত্রণে। আমার ইচ্ছা ব্যতিত কিছুই হয় না। সবই আমার ইচ্ছাধিন।'

এসব জানার পরও দেখা যাচ্ছে একটি ছেলের জন্য পিতা মাতা, বিশেষ করে মা কেবল একটি ছেলে সন্তান পাওয়ার জন্য ঝাঁড়-ফুঁক, তা'বীজ-কবজ, দুআ কালাম কোনো কিছু করতে বাকি রাখে না। দুনিয়ার সব স্থানেই সে যেতে রাজি, তবুও তার থেকে ছেলে সন্তান হতে হবে। এসবের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে ছেলে সন্তান দানকারী মহান রাব্বুল আলামীনের কথাই ভুলে যায়। একবারের জন্য কায়মনোবাক্যে সবকিছুর সৃষ্টিকারী মহান স্রষ্টার নিকট দুআ করে না।

নিম্নে আমি কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করছি, এসব পদ্ধতি অবলম্বন করার পাশাপাশি মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে কায়মনোবাক্যে ছেলে সন্তানের জন্য দআ করবে। বান্দা কেবল মাধ্যম গ্রহণ করতে পারে এবং চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মাধ্যম ও চেষ্টায় সফল করা কেবল আল্লাহ তাআলার কাজ। তিনি বান্দার প্রতি দয়াবান হলেই কেবল এসব চেষ্টা তদবীর কাজে

লাগবে। এজন্য সবসময় আল্লাহকে ডাকতে হবে। তার সাহায্য কামনা করতে হবে। তবেই আশা করা যায় ছেলে সন্তানের মুখ দেখা যাবে। যাহোক নিম্নে ছেলে হওয়ার কৌশল লিখা হল–

১। ছেলে সন্তান জন্মের বিশেষ একটি আমল হল- পূর্ণাঙ্গ সহবাসের আগ্রহ জাগার পরই সহবাস করবে। সহবাসের পূর্ণাঙ্গ আগ্রহ জাগার পর সহবাস করার দ্বারা বেশিরভাগ ছেলে সন্তান জন্ম নেয় এটা বেশ পরীক্ষিত আমল। এটা করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে দুআ করতে থাকবে।

২। সহবাসের ক্ষেত্রে সহবাসের উত্তম সময়ের প্রতিও খেয়াল রাখবে। আর সেটা হল রাতের শেষ প্রহরে।

৩। মাসের বিশেষ একটি দিন বা সময় আছে, যে সময় মহিলারা সহবাসের প্রতি বেশ আগ্রহী থাকে। মহিলাদের জন্য সে সময়টি এমন যেমন প্রাণীদের সহবাসের জন্য বছরের বিশেষ কিছু দিন বা মাস। এজন্য মাসের কোন্ সময় মহিলাদের সহবাসের প্রতি বেশি আগ্রহ জাগে, সে সময়টি মহিলাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং সে সময়েই স্বামীর সাথে সহবাস করবে।

কিছু কিছু মহিলার সহবাসের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখা দেয়, মাসিক বা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পরপরই। আর এর ধারাবাহিকতা এক সপ্তাহ পর্যন্ত বাকি থাকে। আবার কিছু মহিলার যৌনচাহিদা সারা মাসে একই রকম থাকে। এসব মহিলারা বেশি বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। তাদের সাথে সহবাস করলেই পেটে সন্তান এসে যায়। আর যেসব মহিলাদের বিশেষ সময় ছাড়া সহবাসের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ থাকে না। তাদের সাথে ঐ বিশেষ সময় বাদে অন্য সময় সহবাস করলে সাধারণত সন্তান জন্ম নেয় না। ঐ বিশেষ সময় বাদে অন্য সময়ে সহবাসের দ্বারা যেসব সন্তান জন্ম নেয়, অধিকাংশ সন্তান হয় মেয়ে। আবার এর উল্টাও হতে পারে।

৪। ঋতুস্রাবের দিন সহবাস করলে ছেলে সন্তান জন্ম নিবে। আর পরের দিন সহবাস করলে মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে। তদ্রূপভাবে তৃতীয় দিন সহবাস করলে ছেলে হবে আর চতুর্থ দিন সহবাস করলে মেয়ে হবে। এভাবে জোড় বেজোড় অনুযায়ী সহবাস করলেই কাঙ্ক্ষিত ছেলে বা মেয়ে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

কতিপয় হেকিম বলেন, স্বামী স্ত্রীর সহবাসের সময় যার বীর্য জরায়ুতে

প্রথমে পৌঁছবে, সন্তান তার মতোই হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর বীর্য যদি জরায়ুতে প্রথমে প্রবেশ করে, তাহলে মেয়ে হবে। আর যদি স্বামীর বীর্য প্রথমে জরায়ুতে প্রবেশ করে, তাহলে ছেলে সন্তান জন্ম নিবে।

মেয়ে সন্তান জন্মের পদ্ধতি

এটাও সম্পূর্ণ আল্লাহর কুদরতাধীন। আল্লাহর উপর ভরসা করে কন্যা সন্তান জন্মের জন্য যেসব মাধ্যম বা অসিলা গ্রহণ করতে হবে। তা হল- ঋতুস্রাবের রক্ত বন্ধ হলেই বেশি বেশি সহবাস করা। সহবাসের প্রতি স্বামীর ইচ্ছা জাগলেই সহবাস করবে। এতে স্ত্রী নারায থাকলেও সহবাস করবে।

সহবাসে নীতিমালা থাকা আবশ্যক

একটি কথা স্মরণ রাখবে, দুনিয়ার কোন্ সফল কাজটি নিয়ম-নীতি ছাড়া হচ্ছে, দুনিয়ার সব সফল কাজই নিয়ম নীতিতে হচ্ছে। নিয়ম নীতি ছাড়া কোনো কাজ সফল হতে পারে না। সফল হলেও তাতে সাফল্যের তুলনায় ক্ষতির দিকটিই বেশি পাওয়া যাবে।

আমরা দৈনিক কতবার খাবার খাই। প্রতিদিন আমাদের কতবার খাবার খাওয়া উচিত। এসব বিষয় আমরা নিজেদের আয় রোজগারের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করি। মোটামুটি শক্তি সামর্থ থাকলে দিনে তিনবার খাবারের রুটিন করি। যদি কেউ ঐ রুটিনের বাইরেও একাধিকবার খায়, তাহলে দেখা যাবে, এ খাবার গ্রহণের দ্বারা যে আশা করেছিল তা না হয়ে বরং সে উল্টা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ সহবাসের বিষয়টিও একই। নিজের শরীরে যৌনশক্তি কতটুকু আছে, আমার দ্বারা প্রতি মাসে কতবার সহবাস করা দরকার। এসব ভেবে সহবাসের একটা নীতিমালা তৈরি করবে। শরীরকে সুস্থ ও সবল রেখে দিনে যে কয়বার বা সপ্তাহে যে কয়বার সহবাস করতে সক্ষম সে কয়বারের বেশি সহবাস করা বোকা লোকদের পরিচয়।

স্বামীর জন্য শিক্ষনীয় কথা

সকল স্বামীকে এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, সহবাসের দ্বারা কেবল তারাই দুর্বল ও কমজোর হয়, তাদের তুলনায় মহিলারা খুব কমই দুর্বল ও কমজোর হয়। স্বামী ও স্ত্রীর ব্যাপারে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে থাকি যে,

স্ত্রী হল বড় সড়কের ন্যায়, যার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর স্বামী হল সে রাস্তার পথিকের ন্যায়। পথিক কিছুক্ষণ চলার পরই দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু রাস্তার কোনো দুর্বলতা নেই। রাস্তা কখনো দুর্বল হয় না। দুর্বল কেবল পথিকই হয়ে থাকে। একথাটি সর্বদা মাথায় রেখে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। কারণ তোমাকে এ রাস্তা পাড়ি দেয়ার জন্য আজীবন হাঁটতে হবে। এজন্য মধ্যমপন্থায় হাঁটতে হবে। যদি প্রথমেই দৌড় দাও, তাহলে এক সময় তোমার অবস্থা এমন হবে যে, তুমি নরমালভাবে হাঁটতেও পারবে না।

স্তন ও দুধ বিষয়ক কিছু কথা

মানুষ যখন যুবক হয় তখন তার বুকের ছাতীতে এক প্রকার শক্ত গোশতপিণ্ড দেখা দেয়। পুরুষদের শরীরে গরমের মাত্রা বেশি থাকায় সে গোশতপিণ্ডটি গলে যায়, কিন্তু মহিলাদের মাঝে গরমের তাপ কম হওয়ায় এবং ঋতুস্রাব অধিক হওয়ায় দিনদিন তা উপর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে বাচ্চার খাবারের গুদামে পরিণত হয়।

শালদুধের গুরুত্ব

করুণাময় মহান রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার লালন-পালনের সকল ব্যবস্থা তিনিই করেন। একটি নবজাতক শিশু জন্ম নেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে দেন। মায়ের বুকে নবজাত শিশুর দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ, যা নবজাত শিশুর নাজুক অবস্থার উপযোগী।

গর্ভ অবস্থার শেষ পর্যায়ে এবং প্রসবোত্তর ২-৪ দিন মায়ের স্তন হতে যে গাঢ় হলুদ রংয়ের দুধ আসে তাকে শালদুধ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'কোলোস্টাম' বলে। এ দুধ পরিমাণে সামান্য হলেও নবজাতকের জন্য তা খুই গুরুত্বপূর্ণ। শালদুধ হলুদ বর্ণ ও অত্যন্ত গাঢ় হয়ে থাকে বলে অনেকেরই ধারণা শালদুধ বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত যে, এ দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালদুধ ফেলা বা নষ্ট করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। শিশুকে শালদুধসহ বুকের দুধ পান করানো গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে শালদুধ পান করানো উচিত।

বুকের দুধ খাওয়ালে মা ও শিশু উভয়েরই উপকার

শিশুর উপকার

❖ যে সকল শিশু বুকের দুধ পান করে, তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বুকের দুধ পান থেকে বঞ্চিত শিশুদের তুলনায় অধিক উন্নত হয়।

❖ শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধ আদর্শ সুষম ও নিরাপদ।

❖ মায়ের দুধে শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সকল উপাদান সঠিক পরিমাণ থাকে। ফলে শিশু অপুষ্টিতে ভোগে না। যেমন, তা ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমায়।

❖ মায়ের দুধ সহজে হজম হয়।

❖ দুধ টেনে খেলে শিশুর চোয়াল, মাড়ি ও মুখমণ্ডলের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। শিশুর শরীরে বাড়তি মেদ জমে না। তাই শিশু প্রাণবন্ত থাকে।

মায়ের উপকার

❖ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের স্তন, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ঝুঁকি কমে যায়।

❖ মা'র বাড়তি মেদ কমিয়ে শরীরের গঠন সুন্দর করতে সাহায্য করে। মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে, মা ও শিশুর মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে মা সাফল্যমণ্ডিত হন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে পূর্ণ দু-বছর"

বুকের দুধের উপকারিতা

❖ বুকের দুধ শিশুর জন্মগত অধিকার। এ অধিকার হতে শিশুকে বঞ্চিত করা যেমন গুনাহের কাজ তেমনি মানবাধিকার লংঘনের অপরাধ।

❖ মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার চাহিদা অনুযায়ী দুধের ঘণত্ব বা গুণ পরিবর্তন হয়।

❖ বুকের দুধ দিলে মায়ের দৈহিক সৌন্দর্য নষ্ট হয় এমন ভুল ধারণা অনেকেরই। অথচ সত্য কথা হচ্ছে যে, প্রতিদিন ও সঠিক নিয়মে বুকের দুধ

খাওয়ালে মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিকশিত হয় এবং মায়েদের স্তনের ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

❖ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মায়ের দুধপানকারী শিশুদের মানসিক বিকাশ তুলনামূলকভাবে ভালো হয় এবং তাদের আই কিউ কৃত্রিম দুধপানকারী শিশুদের চেয়ে ৮.৫ পয়েন্ট বেশি।

বুকের দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি

❖ শিশুকে সঠিক পদ্ধতি এবং ভঙ্গিতে দুধ খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন। এ সময় ভঙ্গি ঠিকমত না হলে মায়ের অসুবিধা ও অস্বস্তি হতে পারে।

❖ সেজন্য মায়ের উচিত দুধ খাওয়ানোর সময় আরামদায়কভাবে বসে নেয়া। ঘরে সোফা-কুশন না-ই থাকুক চৌকি বা কোনো ইজি চেয়ারে বসেও মা দুধ খাওয়াতে পারেন। খাওয়াতে পারেন কাত হয়ে শুয়েও। যে কোনো ভঙ্গিতে খাওয়ান না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর ঘাড় যেন গুঁজে না থাকে। শিশুর দৃষ্টি থাকতে হবে মায়ের মুখের দিকে। শিশুকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে নিতে হবে যেন স্তনের বোঁটার দিকে তার মুখ থাকে। মাথাটি থাকবে মায়ের হাতের ভাজের উপর। এর সঙ্গে প্রয়োজন মায়ের শরীরের ঘনিষ্ঠ ছোঁয়া।

❖ শিশুর শরীর ও মায়ের বুকের মাঝে ফাঁক না থাকে এবং শরীর যেন মায়ের বুকের সঙ্গে মিশে থাকে। খাওয়ার সময় ঘনিষ্ঠ ছোঁয়া পেতে থাকলে মা শিশু দু-জনেরই অত্যন্ত আরাম ও আনন্দ হয়। শিশু নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করতে থাকে। এর ফলে তার সোমাটিক ডেভেলপমেন্ট খুব ভালো হয়।

❖ দুধ খাওয়ানোর সময় সিগারেট ধরার ভঙ্গি বা কাঁচি ধরার ভঙ্গিতে বোঁটা এবং বোঁটার চারপাশের বাদামী বা কালচে রঙের অংশ (এরিওলা)-কে টিপে ধরা উচিত নয়, তাতে দুধের উৎপত্তি ও নিজস্ব প্রবাহ ব্যাহত হয়।

❖ বুকের নিচে অন্য চারটি আঙ্গুল দিয়ে একটু ঠেলে তুলে বুড়ো আঙ্গুলটি এরিওলার অনেক দূরে চেপে ধরে পুরো স্তনটিকে সামান্য একটু তুলে দুধ খাওয়ানো ঠিক।

❖ প্রথমে শিশুর উপরের ঠোঁটে স্তনের বোঁটাটি দু-একবার লাগাতে হবে; তাতে শিশু বড় করে হা করবে। তখন শিশুর মুখে বোঁটা ভরে দিতে হবে। শিশুর নিচের ঠোঁট এরিওলাকে ঢেকে ফেলবে এবং উপরের ঠোঁট থাকবে এরিওলার শেষ প্রান্তে যাতে বোঁটাটি মুখের ভেতরে উপরের তালু স্পর্শ করে।

স্তনটি একটু তুলে না নিলে ভারের জন্য স্তনবৃন্তটি শিশুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। তখন শিশু অস্বস্তিতে বোঁটা ছেড়ে দিতে চায়।

❖ শিশুর মাথা ও মুখটা শুধু বুকের দিকে টেনে আনা অনুচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুর পুরো শরীরটাই মায়ের দিকে এগিয়ে আসে। যে কোনো ভঙ্গিতেই খাওয়ানো হোক না কেন শিশুর মেরুদণ্ডটি যেন সোজা থাকে এবং স্তনটি মুখ থেকে এদিক ওদিক সরে না যায়।

❖ মায়ের উচিত শিশুকে প্রথমে এক স্তন থেকে পুরোপুরি দুধ খাওয়ানো। এতে দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলে অন্য স্তন থেকে একই সেশনে বা আসনে শিশুকে খাওয়াতে হবে।

❖ দুধ খাওয়াতে শুরু করার পর মায়ের দুধের প্রথমভাগে (যাকে বলা হয় ফোর মিল্ক) থাকে পানি এবং প্রোটিন (আমিষ), কিছুক্ষণ খাওয়ার পর দুধে আসে স্নেহ পদার্থ। এটি যেহেতু শিশুকে তৃপ্ত করে সবচেয়ে বেশি সেহেতু এটা না পাওয়া পর্যন্ত শিশু দুধ খেতে থাকে। এটি পেয়ে তৃপ্ত হলেই শিশু দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, মায়ের দুধে এ স্নেহ পদার্থ আসতে অনেক সময় নেয় বলে অনেক্ষণ ধরে একই দিকে খেতে থাকে।

❖ সে ক্ষেত্রে একদিকে দুধ খাওয়া শেষ করার পর অন্যদিকে ফিরিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করতে হবে। তখন যদি সে না চায় তাহলে আর না খাওয়ানোই ভাল।

❖ তবে মনে রাখতে হবে, পরের বার খাওয়ানোর সময় আবার অন্য দিকের স্তন দিয়ে খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

বুকের দুধ বাড়ানোর উপায়

❖ বুকের দুধ বাড়ানোর জন্য শিশুকে বারে বারে স্তন চুষাতে হবে। যত বেশি শিশু খাবে, তত দুধ আসবে। যাদের যমজ সন্তান হয়েছে, তারাও শুধুমাত্র বুকের দুধ দিয়ে প্রথম পাঁচ/ছয় মাস শিশুকে বড় করতে পারেন। মনে রাখতে হবে-শিশুর চাহিদা অনুযায়ীই দুধ আসে।

❖ মা এবং শিশুকে একই ঘরে একই বিছানায় এবং যতবেশী সম্ভব শিশুকে মায়ের কাছে রাখতে হবে। আর রাতের বেলা বেশি দুধ চুষাতে হবে।

❖ মাকে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি করে খেতে হবে। এ সময় মাকে বেশি পরিমাণ শাক-সবজি, ফল, মাছ, গোশত খেতে হবে। এছাড়াও মা

প্রতিবার দুধ দেয়ার আগে ও পরে এক গ্লাস করে পানি খেলে, দুধ দানের জন্য পানির অংশ পূরণ হয়।

❖ পাঁচ/ছয় মাস বয়স পর্যন্ত বুকে দুধ ছাড়া শিশুকে অন্য কোনো খাবার না দেয়া এবং ফিডার, নিপল ইত্যাদি না দেয়া উচিত। বাচ্চা যদি নিপল চোষে, তবে বুকের দুধ চোষার আগ্রহ কমে যায় এবং দুধ কম আসে।

শিশু যথেষ্ট পরিমাণ দুধ পাচ্ছে কি না বোঝার উপায়

❖ শিশু যদি শুধু বুকের দুধ খেয়ে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টায় ছয়বারের বেশী প্রস্রাব করে, তবে বুঝতে হবে- সে যথেষ্ট দুধ পাচ্ছে।
যথেষ্ট দুধ পেলে শিশু কান্নাকাটি কম করবে, পরিতৃপ্ত দেখাবে এবং শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাবে।

শিশুদের স্তন্যদানে করণীয় বিষয়

❖ সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে সন্তানকে মায়ের নিকট আনতে হবে এবং মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দিতে হবে। মায়ের স্তনের শালদুধ শিশুর জন্য খুবই উপকারী।

❖ শিশুর জ্বর বা ডায়রিয়া হলে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না।

❖ মায়ের জ্বর বা ডায়রিয়া হলে শিশুকে অবশ্যই বুকের দুধ দিতে হবে। বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। মা যদি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন কিংবা মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত হন, তবে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা উচিৎ। এ সময় ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি।

❖ শিশুর দুধ খাওয়া শেষ হলে শিশুকে ডান কাঁধে খাড়া করে শিশুর পিঠে হাত দিয়ে সামান্য চাপ দিতে হয়। ফলে দুধের সঙ্গে পেটে প্রবেশ করা বাতাস বের হয়ে আসবে।

❖ দুগ্ধদানরত মা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং স্তন পরিস্কার রাখবে।

❖ মা ও শিশু খাদ্য, স্বাস্থ্য ও অন্য যে কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।

বালক সাবালক হওয়ার লক্ষণ

যৌবনের আগমনে যুবকের কতগুলো পরিবর্তন আসে। যেমন- মুখমণ্ডলে দাড়ি ও গোফ উঠতে শুরু করে। বগলে এবং নাভীর নিচে, লিঙ্গের আশপাশে লোম বের হয়। কণ্ঠস্বর কিছুটা মোটা হয় এবং মাঝে মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়। এটা ব্যতীত লিঙ্গের উত্তেজনার তারতম্যের ভিতর দিয়েও ঐ সময় বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন দেখা দেয়, লিঙ্গ উপরে নিচে উঠানামা করে এবং চরম মুহূর্তে শুক্রবাহী নালি দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে লিঙ্গের মুখের দিকে শুক্র বের হয়ে আসে। তখন লিঙ্গ খুব মোটা, লম্বা এবং শক্ত হয়। এ সময় যৌবনের তাড়নায় নারী সম্ভোগের বাসনা উগ্রভাবে জাগরিত হয়।

বালিকা সাবালিকা হওয়ার লক্ষণ

যুবতীদের যৌবন আগমনে নাভির নিচে যোনীর চতুর্দিকে সুক্ষ, কুঞ্চিত লোম উদগমন হতে দেখা যায়। স্তনদ্বয় স্ফীত, সুগঠিত হয়ে কদম্ব ফুলের ন্যায় বুকের উপরে শোভা বর্ধন করে। ঐ সময় তাদের হাব-ভাব, চলা-ফেরা, চাহনি সবকিছুই মাদকতাময় মনে হতে থাকে। পুরুষের সান্নিধ্য লাভের বাসনায় তাদের দেহ-মন রোমাঞ্চিত হতে থাকে। তাদের সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটিত হয়। চেহারায় লাবণ্যতা দেখা যায়। তাদের মনের গতি তখন বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমন কি প্রণয় বিষয়ক বইপত্র পড়া ও প্রেমপত্র লিখার ঝোক বেশী মাত্রায় দেখা যায়।

স্বামী-স্ত্রীর রতি শক্তির পার্থক্য

স্বামীদের (পুরুষেরা) কামোত্তেজনা অত্যাধিক প্রবল ও উগ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। পুরুষের জননেন্দ্রিয় (লিঙ্গ) অল্প কারণেই উত্তেজিত হয়ে উঠে। আবার অল্প সময় যৌন মিলনের পরেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বীর্য বের হবার সাথে সাথেই পুরষের উত্তেজনা ও সুখ-স্পৃহা শেষ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সহবাসের আগ্রহ দমে যায়।

কিন্তু স্ত্রীলোকের কামোত্তেজনা অন্য ধরনের। স্ত্রীলোক অল্পতেই উত্তেজিত হয় না। তারা সামান্য স্পর্শ, চুম্বন, মর্দন বা আলিঙ্গনে উত্তেজিত হয় না। তাদের কামোত্তেজনা যেমন দেরীতে হয়, তেমন রতিকালও দীর্ঘায়িত হয়। যৌন শাস্ত্র মতে দেখা যায়, স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা তিন গুণ বেশী কামপ্রবণা

হয়। অতএব, এই ক্ষেত্রে অধিক সময় শৃঙ্গারের দ্বারা স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছেয় যৌনাঙ্গ উত্তেজিত ও সক্রিয় করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের মন চঞ্চল ও উত্তেজিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার যৌন অঙ্গগুলোও সক্রিয় হবে না।

স্ত্রীলোকেরা অল্পতে যেমন উত্তেজিত হয় না তেমন অল্প রতিক্রিয়ায়ও তৃপ্তি পায় না। সুতরাং স্ত্রীলোককে পুরুষরা আদর-সোহাগ ও নানা প্রকারের শৃঙ্গারের সাহায্যে তার যৌন বাসনা তীব্র ও চরম তৃপ্তি লাভের আশায় রতিক্রিয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে উত্তেজিত ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। তা হলেই স্ত্রীলোক চরম সুখানুভব করে আনন্দ ভোগ করে রতিক্রিয়ায় তৃপ্তি লাভ করবে।

মানব দেহেরে উপাদান

মানব দেহে বহু রকমের উপাদান রয়েছে। যে উপাদানগুলো ছাড়া মানবদেহ গঠিত বা সৃষ্টি হতে পারে না। যে সকল উপাদানে মানবদেহ সৃষ্টি বা গঠিত হয় তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- কঠিন অংশ, কোমল অংশ এবং তরল অংশ। নিম্নে তার ব্যাখ্যা দেয়া হল–

১। হাড়, দাঁত, নখ ইত্যাদি কঠিন অংশ।
২। শিরা, মগজ, চর্বি, পেশী (মাংশ) ইত্যাদি কোমল অংশ।
৩। রক্ত, রস, থুথু, বীর্য ইত্যাদি তরল অংশ।

মানুষের জীবন পাঁচ স্তরে বিভক্ত

মানুষের জীবনকে বৈজ্ঞানিকেরা পাঁচটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন। যথা– ১। শৈশব, ২। কৈশোর, ৩। যৌবন, ৪। পৌঢ় ও ৫। বার্দ্ধক্য।

পুরুষের জননতন্ত্র

জীব জগতের জন্ম রহস্যকে সৃষ্টির এক বিচিত্র সৃষ্টি বলে যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে তার মূলে রয়েছে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের দান। সেই অঙ্গগুলোর রহস্যও সকলের জেনে রাখা কর্তব্য। এখন প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখা সকলের জন্যই প্রয়োজন।

কতগুলো অঙ্গের সহযোগিতা ও সমন্বয়কে পুরুষ জননতন্ত্র বলা হয়। তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ বিশেষ প্রধান অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গ রতিক্রিয়ার সাহায্যকারী। পুরুষ জননতন্ত্র ও সাহায্যকারী অঙ্গগুলোর রূপ কেমন তা উল্লেখ করা হচ্ছে-

প্রথমত পুরুষ জননতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার একটি হল বাহ্যিক এবং অন্যটি হল আভ্যন্তরীন।

পুরুষ জননতন্ত্রের বাহ্যিক অঙ্গগুলো হচ্ছে-

১। পুরুষাঙ্গ ২। লিঙ্গমনি ৩। অগ্রচ্ছদা

৪। মূত্রনালী ৫। অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয়।

এখানে পুরুষ জননতন্ত্রের বাহ্যিক অঙ্গ ও আভ্যন্তরীন অঙ্গগুলোর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

পুরুষাঙ্গ

বাহ্যিক দিক হতে দেখলে আপাতত পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয় দুটির কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত দেখা যায়, সকল পুরুষের পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্যের মাপ এক রকম হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের লিঙ্গের দৈর্ঘ্য সোয়া তিন ইঞ্চি হতে চার ইঞ্চির মাঝামাঝি দেখা যায়। উত্তেজনার সময় তা সোয়া পাঁচ হতে ছয় ইঞ্চির কিছু বেশি লম্বা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে লিঙ্গের দৈর্ঘ্য তার চেয়ে কম ও বেশি হতে পারে।

তার চেয়ে সামান্য ছোট বড় হলে তাতে কিছুই আসে যায় না এবং সহবাসে কোনো রকম অসুবিধা হয় না। পুরুষাঙ্গ অস্বাভাবিক ছোট বা বড় হলে সঙ্গমকালে স্ত্রীলোকের জন্য অসুবিধার কারণ হতে পারে।

কারো ধারণা, পুরুষাঙ্গ লম্বায় খুব বড় হলে স্ত্রী সহবাসে বেশী আনন্দ উপভোগ করা যায়। আসলে এরূপ ধারণা করা নিতান্তই বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। লিঙ্গের দৈর্ঘ্য নিয়ে বাহাদুরী করা আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার লিঙ্গের খর্বতা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। মোদ্দা কথা হল যে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সহবাসের সময় ঘর্ষণেই আনন্দ লাভ করে থাকে।

লিঙ্গমনি ও অগ্রচ্ছদা

লিঙ্গের মাথায় অংশটুকুকে লিঙ্গমনি বলা হয়। লিঙ্গের অন্যান্য অংশের চেয়ে এই অংশটা অপেক্ষাকৃত পুরু, চওড়া এবং বেশী সংবেদনশীল। যে চামড়াটুকু দিয়ে এই লিঙ্গমনি আবৃত (ঢাকা) থাকে, তাকে অগ্রচ্ছদা বলা হয়। লিঙ্গের উত্তেজিত অবস্থায় লিঙ্গমনিকে ঢেকে রাখা এবং চামড়া (অগ্রচ্ছদা)

সাধারণত সরে গিয়ে উপরে উঠে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে যেই ছেলেদের 'মুদা' বা ফাইমোসিস থাকে, তাদের অগ্রচ্ছদা খুব ছোট এজন্য চামড়াটা সরে যেতে পারে না এবং লিঙ্গমনি বের হতে পারে না। এই অবস্থায় চামড়াটুকু কেটে ফেললেই ভবিষ্যতের জন্য খুবই উপকার। কারণ, যাদের লিঙ্গমনি সবসময় ঐ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে তাদের সংবেদনশীলতা কমতে পারে না। সুতরাং রতিক্রিয়ার সময় শুক্র ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। এছাড়া আরও বিপদও হতে পারে। যেমন- লিঙ্গমনি অগ্রচ্ছদা দ্বারা আবৃত থাকলে তার ভিতরে অল্প করে ময়লা জমতে থাকে এবং তা নিয়মিত পরিস্কার না করলে বিভিন্ন রোগ জন্ম নেয়। ফলে তাদের যৌন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং পীড়িত হয়ে পড়ে।

সুতরাং- পিতা-মাতার খেয়াল রাখতে হবে যে, তাদের ভুলের জন্য ছোট বেলায়ই তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বুগ্ন হয়ে না যায়। অতএব ছোট বেলাই ছেলেদের লিঙ্গমনি ঢেকে রাখা ঐ চামড়াটুকু কেটে ফেললেই তারা ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নত যৌন স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং তাদের ঔরসে সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন সন্তান জন্ম নিবে এবং স্রষ্টার সৃষ্টির ধারা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইসলামী শরীয়াতে এভাবে লিঙ্গমনি ঢেকে রাখা চামড়াটুকু কেটে ফেলা সুন্নত। একে সাধারণত মুসলমানী বা খৎনা বলা হয়।

মুত্রনালী

লিঙ্গের ভিতর দিয়ে মুত্রাশয় হতে যে চিকন ও সরু নালিটি লিঙ্গের মুখ পর্যন্ত এসে পৌছেছে তাকেই মুত্রনালি বলা হয়। মুত্রাশয়ে জমে থাকা মুত্র (পেশাব) ঐ মুত্রনালী দিয়েই দেহ হতে বের হয়ে যায়।

শুক্রাশয়

পুরুষাঙ্গ ব্যতীত অন্য একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হচ্ছে শুক্রাশয়দ্বয়। একে অণ্ডকোষ বা বীর্যধারও বলা হয়। সাধারণত একটি সুস্থ মানুষের শুক্রাশয় দুটি মুরগীর ডিমের ন্যায় বড় হবার কথা। কিন্তু এর চেয়ে ছোটও হতে পারে। তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাদের ভিতরে বাম পাশেরটা ডান পাশেরটা অপেক্ষা ঈষৎ বড় হয়ে থাকে এবং নীচের দিকে ঝুলানো অবস্থায় থাকে।

এ শুক্রাশয় দুটি যে চামড়ার থলির ভিতরে ভরা থাকে, তাকে ইংরেজিতে 'স্কোটাম' বলা হয়। ঐ স্কোটামের ভিতরে আবার পৃথক পৃথক দুটি বিভাগ

আছে। তার প্রতিটি বিভাগের একটি করে শুক্রাশয় বা অণ্ডকোষ থাকে। ঐ শুক্রাশয় দুটির ভিতরে অনবরত শুক্র জীবানু তৈরী হয়ে চলছে।

শুক্র জীবানুর পরিচয়

রতি ক্রিয়ার সময়ে কামোত্তেজনা যখন চরম পর্যায়ে পৌছে, তখন লিঙ্গের ভিতর হতে সেই ঘোলাটে সাদা আঠাযুক্ত এক প্রকার উষ্ণ তরল পদার্থ দ্রুতবেগে বের হয়ে আসে, তাকেই বলা হয়ে থাকে বীর্য বা শুক্র। এই পদার্থ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তার ভিতরে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীবানু রয়েছে। তাকেই বলা হয়ে থাকে শুক্র জীবানু। স্ত্রী সহবাসের সময় পুরুষের লিঙ্গমুখ দিয়ে বীর্য বের হয়ে স্ত্রী গর্ভাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে এবং গর্ভাশয়ে ঐ শুক্র জীবানুর দ্বারা ভ্রুণের জন্ম হয়ে থাকে। ভ্রুণের উৎপত্তি হবার অর্থ হল, স্ত্রীলোক গর্ভবতী হওয়া।

শুক্র জীবানু সঞ্চার নালী

শুক্রাশয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার ভিতরে এক প্রকার অতি সরু সরু নালী বিদ্যমান, যার নাম হল, শুক্র জীবানু সঞ্চার নালী। নালীগুলোর ভিতরে এক প্রকার বড় বড় কোষ থাকে। এ গুলোকে বলা হয় প্রধান শুক্র জীবানু। যৌবনের শুরু হতে ঐ কোষগুলো সর্বদা দুভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। এ কারণে সর্বদা জীবানু তৈরী হয়ে চলেছে।

এই শুক্র জীবানুগুলোর আকার অতি ক্ষুদ্র। সেটা লম্বায় এক ইঞ্চি চার শ ভাগের এক ভাগ হতেও কম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বীর্যের মধ্যে বিশ হতে পঁচিশ কোটি শুক্র জীবানু থাকে বলে জানা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যম ছাড়া তাকে মানুষের চোখ দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় না। অন্তত: ঐ যন্ত্রের সাহায্যে এক হাজার গুণ বড় করে দেখলে, তা হলেই তাকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখা সম্ভব। ঐ শুক্র জীবানুগুলোর আকৃতিও এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের। তার মাথা কিছুটা লিঙ্গমুণ্ডের আকৃতির মতো। তার নীচে একটা লম্বা লেজ আছে। ঐ লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে শুক্র জীবানুসমূহ শুক্রাশয় হতে বের হয়ে পুরুষের জননতন্ত্রের মধ্যে হতে অগ্রসর হয়। শুক্র জীবানুগুলোর আকৃতি যে কি প্রকার ক্ষুদ্র, তার একটু অনুমান দিচ্ছি ঃ

যৌন বিজ্ঞাণীদের মতে, একজন পুরুষের একবার যতটুকু শুক্র নির্গত হয়, তার ভিতরে এত অধিক সংখ্যক শুক্র জীবানু মৌজুদ থাকে যে, দুনিয়ার পনের হতে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের যতগুলো স্ত্রীলোক আছে, তাদের সকলেরই তা দ্বারা গর্ভবতী হওয়ার সম্ভব।

পুরুষের জননতন্ত্রের ভিতরের পথটা কি প্রকার তা এখানে কিছুটা আলোচনা করছি। ইতিপূর্বে শুক্র জীবানু সহায়ক নালীগুলোর যে নাম উল্লেখ করেছি ঐ গুলো অপেক্ষাকৃত বড় অন্য একটি নালীর ভিতর গিয়ে পড়েছে, তার নাম হল এপিডিডাইমিস। এই এপিডিডাইমিস পুন: তার চেয়ে বড় একটি নালিতে গিয়ে প্রবেশ করেছে, তার নাম হচ্ছে 'ভাস ডেফানস'। যেই সকল শুক্র জীবানু শুক্রাশয়ের ভিতরে জন্ম হচ্ছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে এই 'ভাসডেফারেনসের ভিতরে এসে পড়েছে। পুন: এখান হতে ঐ গুলো একটি ক্ষুদ্র থলির ভিতরে গিয়ে জমা হচ্ছে, তাকে বলা হয় 'শুক্রকোষ'।

এপিডিডাইমিস এবং ভাসডেফারেসনের গা হতে এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়। এই তরল পদার্থ শুক্র জীবানুর সাথে মিশে যায়। অন্য দিকে শুক্র কোষ হতেও আর এক প্রকার তরল পদার্থ এসে তার সাথে মিশে যায়। তার কারণেই শুক্রের রঙটা ঐ প্রকার ঘোলাটে, সাদা এবং আঠালো হয়।

প্রসটেট গ্রন্থি

শুক্রকোষের মুখের কাছে 'প্রসটেট' নামক গ্রন্থি হতে এক প্রকার তরল পদার্থ বের হয়ে আসে। অদ্ভুত ধরণের তার গন্ধ। ঠিক বীর্যের গন্ধের মতোই। কামোত্তেজনার চরম অবস্থায় জননতন্ত্রের গাত্রের পেশীগুলো তখন অতি দ্রুত সংকুচিত হয়। এই প্রকার সংকুচিত হওয়ার কারণে তখন জননতন্ত্রের নালীগুলোও শুক্রকোষের উপর চাপ দিতে থাকে। ঐ চাপের কারণে ভিতরের বীর্য ধাক্কা খেতে খেতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। সমানতালে পেশীগুলো সংকুচিত হয় বলে নালীগুলোর উপরেও তালে তালে চাপ পড়তে থাকে। এই জন্যই শুক্রকোষের ভিতরে যে শুক্রটুকু জমা থাকে, তা একবারে বের না হয়ে তালে তালে লিঙ্গের মুখ দিয়ে দ্রুতগতিতে বের হয়ে পড়ে। যে সময় শুক্রকোষ হতে শুক্র বের হয়ে মূত্রনালীর ভিতরে আসে তখন প্রসটেট গ্রন্থির অদ্ভুত তরল রসটুকু বের হয়ে শুক্রের সাথে মিশে যায়। ঐ রসটুকু অধিক উত্তেজক ও আনন্দদায়ক। সুতরাং যখন শুক্র জীবানুগুলো রসের সাথে

মিলিত হয় তখন তা অত্যাধিক চঞ্চল হয়ে পড়ে। ঐ প্রকারেই বীর্য মূত্রনালী দিয়ে এগিয়ে এসে লিঙ্গ মুখ দিয়ে বের হয়ে স্ত্রী যোনী নালীতে পড়ে।

কাউপার গ্রন্থি

কাউপার গ্রন্থির অবস্থান হচ্ছে প্রসটেট গ্রন্থির নিচে। পুংলিঙ্গের মুলদেশস্থ নালীর দুই পাশে দুটি শক্ত গাটের মত বস্তু আছে। তাকেই কাউপার গ্রন্থি বলা হয়। ঐ দুটি গ্রন্থি হতে উত্তেজনার সময় এক প্রকার রস বের হয়। ঐ রসের কারণে লিঙ্গ নালী পিচ্ছিল হয়ে যায়। অবশ্য ইসলামী পরিভাষায় একে মজী বলে, এখানে উল্লেখ্য যে, সপ্তদশ শতকে জনৈক যৌন বিজ্ঞানী এই গ্রন্থি আবিস্কার করেছেন।

বস্তী প্রদেশ

পুরুষের নাভীর নিচে উরুদ্বয়ের মাঝখানে লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষ যেখানে মিলিত হয়েছে, তাকেই বলা হয় বস্তী প্রদেশ। একটু খেয়াল করলেই বুঝা যাবে যে, ঐ জায়গাটা ত্রিকোণ বিশিষ্ট। যৌবনকালের শুরুতে তার নীচ হতে লোম উঠতে শুরু করে। এই লোম লিঙ্গের আশপাশে অণ্ডকোষের চতুর্দিকে মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। তার নাম 'যৌনকেশ'। যৌবনের শুরু হতে বার্ধক্যের শেষ পর্যন্ত একইভাবে তা বিদ্যমান থাকে।

শুক্র বা বীর্যের উৎপত্তি

মানব দেহের সার পদার্থ হল শুক্র বা বীর্য। দেহের রক্তের সার দিয়ে এই শুক্র বা বীর্য তৈরী হয়ে থাকে। শরীরের সব জায়গায় এই রস ছড়িয়ে থাকে। যৌবনের রতিক্রিয়ার বাসনা হলে এই পদার্থ স্নায়ুমণ্ডলীকে চঞ্চল করে তোলে এবং সমস্ত শরীর হতে শুক্রবাহীস্নায়ুর সহায়তায় এই সংগৃহীত হয়ে ঘণীভূত হয়। রতিক্রিয়ার সময় স্নায়ুমণ্ডলীতে সুখ অনুভব হওয়ার এই ঘনীভূত শুক্র পিঙ্গলা দ্বারা বায়ুর সহায়তার মূলধারে এসে জমা হয়। পুন:মূলধারা হতে অধোবায়ুর সাহায্যে নিম্নের দিকে শুক্রাশয় দিয়ে লিঙ্গ মুখে এসে পড়ে। সহবাসের সময় পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাস অতি দ্রুত হয়ে থাকে। যার ফলে শুক্র দ্রুতগতিতে নেমে আসে। অধোবায়ূর সহায়তা বাদে শুক্র নির্গত হতে পারে না। একজন সুস্থ মানুষের দেহ হতে একবার যতটুকু শুক্র বের হয়, তার

ওজন আনুমানিক এক ডাম হতে দুই ডাম। তবে শুক্রের ওজন এটা হতে কম বা বেশিও হতে পারে। আবার যদি কোনো পুরুষ একাধিকবার রতিক্রিয়া করে, তখন হয়ত শেষবারে শুক্রপাত নাও হতে পারে।

যৌন বিজ্ঞানীদের মতে, বীর্য হল মানুষের খাদ্য সামগ্রীর সারাংশ। আটটি বস্তুর মাধ্যমে এর উৎপত্তি হয়ে থাকে। যেমন- ১। খাদ্য ২। রস ৩। রক্ত ৪। অস্থি ৫। গোশত ৬। মজ্জা ৭। মেদ ৮। শুক্র।

লিঙ্গের গঠন প্রণালী

মানুষের লিঙ্গ কতিপয় শিরা, উপশিরা, তন্তু ও স্নায়ুর সাহায্যে গঠিত হয়েছে। এর ভিতরে কোন অস্থি বা পেশী নেই। কিছুটা স্পঞ্জের মত। এটা কখনো নিস্তেজ হয়ে ছোট হয়ে যায়, আবার উত্তেজনার সময়ে বেড়ে যায়। লিঙ্গ গঠনের ভিতরে একটু চিন্তা করলে অনুভব করা যাবে যে, স্রষ্টার কুদরতের মহিমা কত বড়। তাঁর কুদরতের কোন সীমা নাই।

লিঙ্গের অভ্যন্তরে কতগুলো ছিদ্র ছিদ্র আছে। কামোত্তেজনার সময় ঐ ছিদ্রগুলো রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যার ফলে লিঙ্গ সতেজ ও শক্ত হয়ে থাকে। কামোত্তেজনার পরে কিন্তু এ জমা রক্ত ছিদ্রগুলো হতে বের হয়ে যায়। তখন লিঙ্গ আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যায়। কামোত্তেজনা ব্যতীতও লিঙ্গ প্রসারিত হয়। যেমন পেশাবের বেগ হলে লিঙ্গ প্রসারিত হয়ে থাকে।

আমরা স্বাভাবিকভাবে লিঙ্গকে লম্বায় যতখানি দেখি, আসলে তা তার লম্বার মাপ নয়। আমাদের দৃষ্টির বাইরে ও ভিতরের দিকে তার কতক অংশ আছে। যেমন উত্তেজনার সময় বস্তী প্রদেশে হাত দিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, লিঙ্গের মত শক্ত ও মোটা কিছু অংশ ভিতর দিকেও আছে।

লিঙ্গের কাজ কি

সৃষ্টি জগতে মানব জাতি তথা পুরুষ ও স্ত্রীলোক সঙ্গম করে থাকে এবং তার ফলেই সন্তান লাভ হয়। মানব দেহের ভিতরে যে অসার জলীয় পদার্থ আছে, তা এই লিঙ্গের মাধ্যমে মূত্রের আকারে বের হয়ে যায়। সুতরাং এই অঙ্গ সক্রিয় না থাকলে মানুষের পক্ষে দেহ ধারণ করা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়বে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

মানুষের দেহে সঙ্গম ক্ষমতা বিশিষ্ট অঙ্গ আর নেই। এর গঠন প্রণালী অন্যান্য অঙ্গগুলো হতে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। পুরুষের মনে রতি বাসনার উদ্রেক হলেই তা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার উত্তেজনা দমবে না এবং লিঙ্গও নিস্তেজ হবে না। আসলে রতিক্রিয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা আপনি নিস্তেজ হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।

সুতরাং শরীরের ভিতরে যেমন এই অঙ্গটা একটা বিশেষ ক্ষমতা দখল করে রয়েছে, তেমনি শরীরের সর্ব প্রকারের যৌন সুখানুভূতির প্রাণকেন্দ্রও হচ্ছে এই অঙ্গটা। সঙ্গমকালে পুরুষ ও স্ত্রীকে চরম ও পরম আনন্দ ও সুখ দান করে তার এই অঙ্গ বা লিঙ্গটা।

অতএব, চিন্তা করলে অবাক লাগে যে, কিভাবে একই নালি পথে শুক্র ও মূত্র বের হয়ে থাকে। এটা মানুষের চিন্তার বাহিরে। এটাই হচ্ছে সৃষ্টির স্রষ্টার কুদরতের নিদর্শন। পুরুষ বা স্ত্রীর রতিক্রিয়ার সময়ে মূত্রের বেগ থাকলেও তখন মূত্র বের হয় না। আবার শুক্র বের হওয়ার সময়ও মূত্র বের হতে দেখা যায় না বা বের হয় না।

উত্তেজনা কিভাবে হয়

রতিক্রিয়ার প্রারম্ভিক অবস্থাকেই বলা হয়ে থাকে উত্তেজনাকাল। ঐ সময় লিঙ্গটা কঠিন ও মোটা হয়ে যায়। তখন একটা অভূতপূর্ব শিহরণ লিঙ্গের মধ্য দিয়ে স্রোতের মত বয়ে যেতে থাকে এবং চঞ্চল হয়ে পড়ে দেহ ও মন।

এই উত্তেজনা নানা প্রকারেই হতে পারে। কোনো প্রাণীকে রতিক্রিয়া করতে দেখলে. যৌনাঙ্গসমূহ স্পর্শ বা মর্দন করলে অথবা কোন ষোড়শী যুবতীর কামকেন্দ্রগুলো দেখলে কিংবা আকার ও প্রকৃতি মনে মনে চিন্তা ভাবনা করলে। যৌন সম্পর্কীয় কথোপকথন করলে বা বই পত্র পড়লে ইত্যাদি কারণে পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হয়ে থাকে।

এই উত্তেজনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, শরীয়ত সম্মত বৈধ স্ত্রীর জননতন্ত্রের ভিতরে ঐ লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে কাম-বাসনার তৃপ্তি লাভ করা। অনেকে বৈধ রাস্তা ছেড়ে অন্যভাবেও ঐ কাজটা করে থাকে, যেমন- হস্ত মৈথুন, পুং- মৈথুন বা পশু মৈথুনের মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে থাকে। অবশ্য এটা নিষেধ রয়েছে এবং তা পাপ কার্য।

মসুলমানের পক্ষে এমন করা মহা অন্যায়। ডাক্তারী মতে- স্বাস্থ্যের পক্ষে গর্হিত কাজ। যাদের এমন কু-অভ্যাস; তাদের স্বাস্থ্য অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে।

এখানে আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, পুংলিঙ্গটি কামরসের প্রাচুর্য্যে মোটা ও লম্বা হয়ে এক অনাকাঙ্ক্ষিত পুলকে শিহরিত হয়ে উঠে। তখনই তার স্ত্রী যোনী নালীতে প্রবেশের ক্ষমতা ধারণ করে। কেননা তুলতুলে নরম লিঙ্গ স্ত্রী যৌনাঙ্গে প্রবেশের ক্ষমতা রাখে না। এ জন্যই উত্তেজনা আবশ্যক। তা কি প্রকারে হতে পারে তা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

সহবাসের সময় পুরুষের লিঙ্গ যেমন উত্তেজিত হওয়া আবশ্যক তেমনি স্ত্রীর যৌনাঙ্গেরও কামরসে পূর্ণ হয়ে যৌনিপথ পিচ্ছিল হওয়া দরকার। নতুবা পুং লিঙ্গের ঘর্ষণে স্ত্রীর যোনীর ভিতরে যখম হতে পারে এবং ঐ অবস্থায় পুরুষের জন্য সহবাস করা কষ্ট সাধ্য হবে।

সুতরাং রতিক্রিয়ার সময় পুরুষের লিঙ্গটা যেভাবে উত্তেজিত হয়ে থাকে, ঐ ভাবে স্ত্রীর যোনীনালীও কামোত্তজনায় এক প্রকার রসে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে যায়। তখন পুরুষাঙ্গ খুব সহজেই স্ত্রীর যোনীতে প্রবেশ করিয়ে জরায়ু মুখ পর্যন্ত পৌছানো যায়। এই প্রকারেই রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে থাকে। কামোত্তজনায় যখন ধীরে ধীরে আকাঙ্ক্ষা চরম পর্যায় পৌছাতে থাকে, তখন পুরুষাঙ্গটা দ্রুত ঘনঘন স্ত্রীর যোনীর মধ্যে উপর নীচে নাড়াচাড়ার কারণে পুরুষের ইচ্ছে শক্তির তারতম্য ভেদে কিছু সময় রতিক্রিয়া স্থায়ী হয়ে শুক্রপাত হয়ে থাকে। শুক্রপাতের পরক্ষণেই পুরুষাঙ্গটা ক্রমান্বয়ে ছোট ও নরম হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

পুরুষাঙ্গ বিষয়ে কিছু কথা

آلہ تناسل তথা পুরুষাঙ্গ– এর পরিচিতি বিভিন্ন নামেও রয়েছে। যেমন–

عضو مخصوص، قضیب، ذکر، عضو تناسل، آلہ مردی

তবে আমরা پوشیدہ راز কিতাবে পুরুষাঙ্গের জন্য آلہ تناسل শব্দটি ব্যবহার করেছি। যার অর্থ– যে যন্ত্রের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা যায়। বাংলা ভাষায় একে পুরুষাঙ্গ বলে।

মানুষের শরীরে যতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি অঙ্গ। পুরুষেরা প্রাপ্তবয়সে পৌছার পর তাদের পুরুষাঙ্গে এক প্রকার শক্তি আসে। যার কারণে বিশেষ মুহূর্তে তা শক্ত ও মজবুত হয়। যখন শক্ত ও মজবুত হয়, তখন তা পূর্বের তুলনায় অনেকটা দীর্ঘ হয়ে যায়। সহবাসের

সময় পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হওয়ার ফায়েদা হল, এর দ্বারা পুরুষের বীর্য মহিলার রেহেমের ভিতরে চলে যায় এবং সে বীর্যেই সন্তান জন্ম হয়ে থাকে।

পুরুষদের এই বিশেষ অঙ্গে কোনো প্রকার হাড্ডি নেই। কিন্তু যখন শক্ত ও মজবুত হয়, তখন হাড্ডির মতো শক্ত হয়ে যায়। এটা শুধুমাত্র গোশত ও রগ-শিরা দ্বারা প্রস্তুতকৃত।

এ অঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট হল, এর দ্বারা যৌনসম্ভোগের কাজ সমাধা কর যায়। অর্থাৎ বীর্য ভাণ্ডারের স্থান পরিবর্তনের কাজটি স্বাদ ও প্রফুল্লতার সাথে সম্পাদন করে থাকে। জ্ঞাতব্য বিষয় হল, পুরুষাঙ্গের প্রসারতার শক্তি অন্তর থেকে হয়ে থাকে। আর তার উপলব্ধি হয় ধমনির দ্বারা। তার খাবার যোগান দেয় কলিজা। কলিজা ও মস্তিষ্ক থেকে পরস্পর মিলনের ইচ্ছাশক্তি জাগে।

বেশিরভাগ সময় পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্যতা পাশাপাশি ছয়টি আঙ্গুল মিলালে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য হয়, সে পরিমাণ লম্বা বা দীর্ঘ হয়ে থাকে। মহিলাদের গুপ্তাঙ্গের দৈর্ঘ্যতাও ঐ পরিমাণই হয়ে থাকে। যদি কারো পুরুষাঙ্গ লম্বায় ঐ পরিমাণ না হয়, যার কারণে সহবাসের সময় তার লিঙ্গ বাচ্চাদানি পর্যন্ত পৌছে না এবং সহবাসে স্ত্রী পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তিও পায় না, তাহলে তাকে সহবাসের সময় ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আর সেটি হল, তাকে তার যৌনাঙ্গ বৃদ্ধির ঔষধ ব্যবহার করতে হবে, নতুবা সহবাসের সময় স্ত্রীর নিতম্বের নিচে বালিশ বা বালিশের মতো উঁচু জিনিস রেখে সহবাস করতে হবে। এতে স্ত্রী পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করতে পারবে। এর দ্বারা কারো মনে কোনো প্রকার কষ্ট থাকবে না।

যৌনাঙ্গের উত্তেজনা উপলব্ধি অনেক ভাবেই হতে পারে। পুরুষাঙ্গের লাল বর্ণের শিরা, কালো বর্ণের শিরাগুলো উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। পুরুষাঙ্গের প্রসারতা, শক্তি ও অনুভূতি শিরা ও ধমনী বেশি হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। পুরুষাঙ্গে প্রথম অংশ তথা মাথা দেখতে খোসাবিহীন সুপারির মতো গোলাকার। সেজন্য তাকে সুপারীও বলা হয়ে থাকে।

পুরুষদের শারীরিক গঠন বৃদ্ধি পাওয়ার সময় পর্যন্ত পুরুষাঙ্গ লম্বা ও মোটা হয়ে থাকে। আর তা হল ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত। এর পর মানুষদের যদিও গঠন বৃদ্ধি পায় কিন্তু পুরুষাঙ্গ বৃদ্ধি পায় না। তবে মোটা ও গোল হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর এর জন্য বিভিন্ন ফরমুলা রয়েছে।

পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘতা তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১। ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ। ২। নয় আঙ্গুল পরিমাণ।

৩। বারো আঙ্গুল পরিমাণ।

সাধারণ লোকদের ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হয়ে থাকে। হ্যাণ্ডস্যাম ও মজবুত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের নয় আঙ্গুল পরিমাণ পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হয়। শক্তিশালী ও লম্বা লোকদের পুরুষাঙ্গ বারো আঙ্গুল পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। তবে এ ধরণের লোক সংখ্যায় একেবারেই কম। যাদের পুরুষাঙ্গ বারো আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা এসব পুরুষাঙ্গ ভালো নয়। সাধারণত এসব পুরুষাঙ্গে শক্তি কম থাকে। বিশেষ সময়ে তেমন একটা মজবুত ও শক্ত হয় না। এদের সাথে যেসব মহিলার সহবাস হবে, দীর্ঘতার দিক দিয়ে তাদেরও যথেষ্ট লম্বা হতে হবে। অন্যথায় মহিলারা তাকে সহ্য করতে পারবে না। স্বামী যেমন হবে স্ত্রীও তেমন হতে হবে। এমন যদি হয় যে, স্ত্রী বেশ লম্বা কিন্তু স্বামী একেবারে বেটে, তাহলেও বেমানান। আবার যদি এমন হয় যে, স্বামী অনেক লম্বা কিন্তু স্ত্রী স্বামীর কোমর বরাবর লম্বা, তাহলেও বেমানান। এদের মধ্যে কেউ সহবাসে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তিলাভ করতে পারবে না। এজন্য বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীর উচ্চতা খেয়াল রাখতে হবে।

আমাদের দেশের পুরুষদের পুরুষাঙ্গ সাধারণত ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মেয়েদের যৌনতৃপ্তি দেয়ার জন্য ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ পুরুষাঙ্গ হলেই যথেষ্ট।

এসব ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার মিল না হলে, কেউ পূর্ণাঙ্গতৃপ্তি পায় না। বিশেষ করে মহিলা যদি স্বামী থেকে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি না পায়, তাহলে তাকে যত কিছুই দেওয়া হোক না কেন, তার সব চাহিদা [এটা ছাড়া] পুরণ করা হোক না কেন, পৃথিবীর রাজত্ব তার হতে দিলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। দুনিয়ার সবকিছু দিলেও সে মন থেকে মেনে নিবে না। দুনিয়া সব কিছু, প্রয়োজনের অধিক টাকা পয়সা দিলেও, আসল জিনিসটা মন মতো দিতে পারা গেল না, তাহলে মনে রাখতে হবে [স্ত্রীর মনে হবে] তাকে কিছুই দেওয়া হয় নি। আল্লাহ্ তাআলা পুরুষের এ বিশেষ অঙ্গটি যে কাজের জন্য বানিয়েছেন, এর দ্বারা যদি সে কাজটি পূর্ণাঙ্গভাবে না হয়, তাহলে পুরুষের পুরুষত্ব কোথায়?

অতএব এ বিষয়ে যতেষ্ট যত্নবান হতে হবে। দুনিয়ার জীবনে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতে চাইলে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণাঙ্গ আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়ার জন্য সব রকম চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বীর্যপাতের পর ফরয গোসল

বীর্যপাতের পর গোসল করা ফরয। ছেলে বা মেয়ে যে কারো স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করতে হবে। কম বা বেশি হোক গোসল করতে হবে। পুরুষদের পুরুষাঙ্গ দিয়ে বীর্যের ন্যায় আরো দু-ধরণের পানি বের হয়। একটির নাম 'অদী' অপরটির নাম 'মযী'।

অদী বলা হয় এক প্রকার সাদা পানিকে। দেখতে ডিমের সাদা অংশের ন্যায়। যা পেশাবের আগে পরে কিংবা পেশাবের সাথে মিশ্রিত হয়ে বের হয়।

মযী এক প্রকার পাতলা পানী, যা সহবাসের খেয়াল আসলে বা মহিলাদের নিকট দীর্ঘক্ষণ বসে আলাপ করলে কিংবা বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গে মাথায় দেখা যায়। এটা বের হলে গোসল ফরয হয় না, তবে অযু ভেঙ্গে যায়। যেসব স্থানে নাপাকী লেগেছে, সেসব স্থান পাক করে অজু করতে হবে। অন্যথায় শুধু অজু করলেই নিজে পবিত্র হবে না।

মনী বা বীর্য, মযী ও অদী-এগুলোর শরয়ী হুকুম ওলামায়ে কেরাম ও মুফতি সাহেবদের থেকে জেনে নিতে হবে।

অণ্ডকোষ সম্পর্কে কিছু ধারণা

অণ্ডকোষের অবস্থান পুরুষাঙ্গের নিচে। যা দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চি, প্রস্থে সোয়া ইঞ্চি, ওজনে আধা ছটাক ডিম্বাকৃতির দুটি কোষ। যার মধ্যে বীর্য প্রস্তুত হয়। এটি একেবারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বা ধমনি দ্বারা আবৃত। কোষাকৃতি নল বিশিষ্ট। দৈর্ঘ্যে শরীরের ভিতর দিকে তিন বিঘত। এ রগগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে পরস্পর গিঁট দেয়া হয়, তবে দৈর্ঘ্য দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। শরীরের প্রস্তুতকৃত বীর্য ঐ শিরাগুলি দ্বারা অণ্ডকোষে এসে জমা হয়।

অণ্ডকোষ প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীরই রয়েছে। এটাকে গুদাম ঘর বিশেষও বলা যেতে পারে। মানুষের অণ্ডকোষের গোশত সাদা এবং সবচেয়ে নাযুক স্থান। সামান্য ব্যাথাও অসহ্য মনে হয়। এর ভিতরের গোশত সাদা, এজন্য বীর্যের রঙও সাদা। যেমন মহিলাদের স্তনের ভিতর গোশত সাদা হওয়ার কারণে দুধের রঙও সাদা।

দীর্ঘক্ষণ সহবাস করার পদ্ধতি

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ মিলবে না, যে দীর্ঘক্ষণ সহবাস করতে

অনিচ্ছুক। যুবক, বৃদ্ধ, মুসলমান, কাফের, বেদীন সকলেরই জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া স্ত্রীর সাথে দীর্ঘক্ষণ সহবাস করা। এমন আশা দোষণীয় নয়। বরং এমন আশা করাও নেকির অন্তর্ভুক্ত। কেননা স্ত্রী সহবাস করলে, কি উপকার ও ছাওয়াব রয়েছে, ইতিপূর্বে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণত একজন পুরুষ পূর্ণাঙ্গ কাম-ভাব নিয়ে স্ত্রী সহবাস করলে তিন থেকে সাত মিনিট পর্যন্ত বীর্যকে আটকে রাখতে পারে। এর বেশি কেউ বীর্যকে আটকে রেখেছে বলে আজ পর্যন্ত কোনো তথ্য আসে নি। তবে ভিন্ন চিকিৎসা বা কৌশলের কথা আলাদা। পুরুষের শরীর অধিক গরম এবং খুব দ্রুত বীর্য সৃষ্টি হয় তাই সহবাসের ক্ষেত্রে পুরুষেরা কিছুক্ষণ পরপরই সহবাসে সক্ষম এবং প্রতি সহবাসে বীর্যপাত হয়, এজন্যই তারা মহিলাদের উপর বিজয়ী। প্রক্ষান্তরে মহিলারা কিছুক্ষণ পরপরই সহবাস করতে স্বামীকে সুযোগ দিতে পারলেও তাদের বীর্যপাত হয় না। তাদের শরীর পুরুষের তুলনায় ঠাণ্ডা ফলে তাদের বীর্য সৃষ্টিতে সময়ের প্রয়োজন।

পুরুষদের বীর্য আসে পিঠের মেরুদণ্ডের হাড্ডি থেকে। আর মহিলাদের বীর্য আসে তাদের বুকের হাড্ডি থেকে। এজন্য বেশি উত্তেজিত হলে পুরুষের তুলনায় মহিলার বীর্যপাত আগে হয়ে যায়। যৌন উত্তেজনা যার বেশী হবে, তার বীর্যপাত ততো তাড়াতাড়ি হবে।

একজন পুরুষ এক রাতে একাধিকবার সহবাস করতে সক্ষম এবং প্রত্যেক সহবাসেই তার বীর্যপাত হয়। বীর্যপাত না হওয়ায় একাধিকবার সহবাস করলেও মহিলারা তেমন দুর্বল হয় না, যতটা দুর্বল স্বামী হয়।

বিলম্বে বীর্যপাত

আরবীতে বিলম্বে বীর্যপাত হওয়াকে امساك (ইমসাক) বলে। বিলম্বে বীর্যপাতের মূল কারণ হল- বীর্য গাঢ়, ঠাণ্ডা ও শুকিয়ে যাওয়া। শীতকালে যেমন প্রচণ্ড শীতের কারণে বরফ জমে এবং রোদ্রের কারণে তা ধীরে ধীরে গলে যায়। বীর্য শুকিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও হল পাতিলের নিচে আগুন জ্বালানোর দ্বারা তাতে শুকিয়ে থাকা গোশতের শুরবার ন্যায়। যার বীর্য এমনিতেই ঘণ বা দীর্ঘক্ষণ পর বীর্যপাত হয় তার বীর্য গাঢ় করার কোনো ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। বিলম্বে বীর্যপাতের বিস্তারিত আলোচনা 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে লিখা হয়েছে।

মহিলাদের যৌন চাহিদা কমানো

কিছু কিছু মহিলা এমন রয়েছে, যাদের যৌনকামনার সামনে পুরুষরা দুর্বল। তাদের যৌনকামনা অধিক বেশি। স্বামীর সাথে সহবাস করে তৃপ্তিলাভ করে না, যৌনক্ষুধা নিভে না। ফলে পরপুরুষের খেয়াল মনে জাগতে থাকে। এক পর্যায়ে অনেকেই পরপুরুষের সাথে দৈহিক কু-সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। এসব মেয়েদের জন্য যৌন চাহিদা কমানোর ঔষধ খাওয়া আবশ্যক।

পুরুষাঙ্গের প্রকারভেদ

যৌনবিদগণ পুরুষাঙ্গের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে বলেন-পুরুষের পুরুষাঙ্গ সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত। যথা–

১। শশকীয় পুরুষাঙ্গ।
২। বৃষকীয় পুরুষাঙ্গ।
৩। অশ্বকীয় পুরুষাঙ্গ।

নিম্নে প্রত্যেকটির পরিচয় দেয়া হল-

শশকীয় পুরুষাঙ্গের পরিচয়

শশকীয় পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বচন হবে, মিষ্ট, মন সদা প্রফুল্ল, তারা দেখতে সুন্দর এবং কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। তাদের মুখ গোলাকার এবং দেহ মধ্যাকারের। তাদের হাত পা খুব হালকা এবং সুন্দর। তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। গুরু ও জ্ঞানীজনে ভক্তি থাকে। এসব লোকদের পুরুষাঙ্গ ছয় আঙ্গুল লম্বা এবং বীর্য থেকে সুরভি গন্ধ বের হয়। তারা খুব হালকাভাবে বেড়ায় এবং কামেচ্ছা মাঝে মাঝে জাগে।

বৃষকীয় পুরুষাঙ্গের পরিচয়

বৃষকীয় পুরুষাঙ্গের অধিকারী ব্যক্তিরাও কিছু পরিমাণে মিষ্টভাষী হয়ে থাকে। তাদের ঘাড়-গর্দান বলিষ্ঠ, কর্কশ কণ্ঠস্বর, রক্তবর্ণ হস্তপদ এবং গতি চমৎকার। তাদের ভ্রু খাড়া এবং পেট কচ্ছপাকারে গোলাকার। তাদের বীর্য এবং দেহ থেকে লবণাক্ত আস্বাদ বের হয়। তাদের গতি মাঝারি রকমের কিন্তু স্বভাব হয়ে থাকে তিক্ত। তাদের পুরুষাঙ্গ সাধারণত নয় আঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হয়ে থাকে।

অশ্বকীয় পুরুষাঙ্গের পরিচয়

এমন লোকেরা সাধারণত বাচাল, মুখ হয় লম্বা। লম্বা ও সরু কান, মাথা ও অধর সরু হয়ে থাকে। তাদের কেশ ঘণ ও সন্নিবিষ্ট ও বক্র। তাদের হাত পা বেশ লম্বা লম্বা এবং দৃঢ়। তাদের আঙ্গুল বেশ লম্বা এবং নখের আঙ্গুলের চেহারা সুগঠিত। তাদের আওয়াজ বা স্বর মেঘ গর্জনবিশেষ। চলাফেরার ক্ষেত্রে তারা খুব দ্রুত পা ফেলে হাটে। তাদের বীর্য থেকে মদের গন্ধ বের হয়। এসব লোকদের পুরুষাঙ্গ প্রায় বারো আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা হয়ে থাকে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের পরিচয়

পুরুষের যৌনাঙ্গের মত স্ত্রীর যৌনাঙ্গের দুটি রূপ আছে। একটা বাহ্যিক অপরটা আভ্যন্তরীন। প্রথমে স্ত্রীলোকের প্রজননতন্ত্রের বাহ্যিক রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

যোনী প্রদেশ

স্ত্রীর প্রজননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হল তার যোনী প্রদেশ। তলপেটের নিম্নে যেখানে উরুদ্বয় এসে মিশেছে, সেই স্থানে খুব নরম থলথলে মাংস বিশিষ্ট ত্রিকোণাকার একটা জায়গা আছে। তার অগ্রভাগ ক্রমান্বয়ে চিকন বা সরু হয়ে উরুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। ঐ স্থানটা তিন হতে সাড়ে তিন ইঞ্চির মত লম্বা হবে। তাকেই বলা হয় যোনী প্রদেশ।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বাহ্যিক রূপ বা অঙ্গ আট প্রকার। যথা-

১। কামাদ্রি ২। বৃহদৌষ্ঠ ৩। ক্ষুদ্রদৌষ্ঠ ৪। ভগাঙ্কুর
৫। মূত্রনালীর মুখ ৬। যোনীনালী ৭। সতীচ্ছদ ৮। মলদ্বার

নিম্নে এগুলোর আলোচনা ক্রমান্বয়ের করা হল –

কামাদ্রি

স্ত্রীলোকের তলপেটের নিম্নস্থানে যেখানে উরুদ্বয় মিশেছে, ঐ ত্রিকোণ বিশিষ্ট স্থানটাকেই বলা হয় 'কামাদ্রি'। ঐ জায়গার দুই দিকে পুরু চামড়া আর চর্বি থাকে বলে ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের কৈশোর জীবনের শেষে যৌবনে আগমনে ঐ স্থানে লোম গজিয়ে থাকে। এই লোমগুলোর উপর দিয়ে ঐ ত্রিকোণ বিশিষ্ট স্থানটা জুড়ে ক্রমান্বয়ে দুপাশ দিয়ে বাঁকাভাবে নিচের দিকে

নেমে যায়। সঙ্গমাবস্থায় বা অন্যান্য সময় ঐ লোমগুলো স্ত্রীলিঙ্গের নমনীয়তা বজায় রাখে।

বৃহদৌষ্ঠ

কামাদ্রির নিম্নের দিকে ঠিক মাঝখান হতে দুপাশে এক জোড়া পুরু ও চেপটা চামড়ার নিচের ভাঁজ, দেখতে কিছুটা ঠোটের মত। মাংসপেশী প্রায় তিন হতে সাড়ে তিন ইঞ্চি নেমে মলদ্বারে কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঐ ঠোটের মত মাংসপেশীদ্বয়কে বলা হয় বৃহদৌষ্ঠ। স্ত্রীলোকের এই বৃহদৌষ্ঠে পুরুষের অণ্ডকোষের ন্যায় কাজ করে থাকে। বৃহদৌষ্ঠের ভিতরটা কোমল ও মসৃণ হয়। কিন্তু তার বাইরের দিকটা কিছুটা কর্কশ ও লোমে আবৃত থাকে। স্ত্রীলোকের যোনীপথ এই মাংসপেশী দ্বারা ঢাকা থাকে। যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের যৌবন অটুট ও সন্তান ধারণশক্তি থাকে, ততদিন পর্যন্ত ঐ ঠোঁট দুটি কিছুটা ফোলা আর কোমল থাকে এবং যোনী-নালীর মুখ কিছুটা চেপে রাখে। কিন্তু যে সময় স্ত্রীলোকের যৌবনে ভাটা দেখা দেয়, আর সন্তান ধারণ ক্ষমতা রহিত হয়ে যায় এবং মাসিক রক্তস্রাব (হায়েজ) চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই কোমল মাংসপেশী দুটি কোকড়িয়ে ফাঁক হয়ে যায়। বৃহদৌষ্ঠের শেষ প্রান্তের এক ইঞ্চি নিচেই হল স্ত্রীলোকের মলদ্বার।

ক্ষুদ্রৌষ্ঠ

ক্ষুদৌষ্ঠ দেখতে বৃহদৌষ্ঠের মতো। বৃহদৌষ্ঠের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বিভাজযুক্ত ঠোটের মতো দুই টুকরা চামড়া দুদিক দিয়ে এসে যোনীনালী এবং মুত্রনালীর মুখ ঢেকে ফেলেছে, এটাই ক্ষুদৌষ্ঠ। এই পাতলা মাংসের আস্তরণটা স্থিতিস্থাপক তন্তু দিয়ে গঠিত। স্ত্রীলোকের কামনা-বাসনায় এটা কিছুটা কঠিন হয়ে উঠে। ক্ষুদৌষ্ঠ অতিরিক্ত স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। গ্রন্থিগুলো হতে রস নির্গত হওয়ায় স্ত্রীলোকের যোনীনালী সর্বদা ভিজা থাকে বলে পুরুষের লিঙ্গটা স্ত্রীর যোনী-নালীতে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

ভগাঙ্কুর

স্ত্রীলোকের যোনী ফাটলের উপর দিকে সেখানে ক্ষুদ্রৌষ্ঠের মুখ দুটি এসে পরস্পর জোড়া লেগেছে, ঠিক ঐ স্থানটায় একটি ক্ষুদ্র মাংসের পুটলির মতো

দেখা যায়, এটাকেই ভগাঙ্কুর বলা হয়। এই ভগাঙ্কুরের সাথে পুরুষের লিঙ্গাগ্রের বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। কিন্তু ভগাঙ্কুরে অনেক বেশি স্নায়ু সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে পুরুষের লিঙ্গাগ্র অপেক্ষা অনেক বেশী পুলক সঞ্চারক, সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের বাহ্যিক যৌনাঙ্গের ভিতরে এর মতো সুখানুভব ও আনন্দদায়ক অন্য কোনো অঙ্গ নেই। এটা আকারে সাধারণত সিকি ইঞ্চি হতে আধা ইঞ্চি ভিতরে হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের যখন স্বামী সহবাসের ইচ্ছে জাগে, তখন এই ভগাঙ্কুরটি কিছুটা কঠিন হয় এবং তার ভিতরে বিদ্যুতের মতো এক প্রকার শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ঐ শক্তির জন্য ভগাঙ্কুর অগ্রমনিটা বার বার নাচতে থাকে।

মুত্রনালী

স্ত্রীলোকের যৌনী-মুখের কিছুটা উপরে এবং ভগাঙ্কুরের নিচে তাদের মুত্রনালির মুখ অবস্থিত। মুত্রাশয় হতে বের হয়ে মূত্রনালীটা এই জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। পুরুষের থেকে স্ত্রীলোকের মুত্রনালীর বিস্তার বেশী কিন্তু দৈর্ঘ্যে কম। সাধারণত স্ত্রীলোকের মুত্রনালী লম্বায় দেড় ইঞ্চির মত হবে। অনেকের হয়ত এমন ভুল ধারণা হতে পারে যে, স্ত্রীলোকের মুত্রনালী ও যোনীনালীর মুখ দুটি একই। আসলে এটা ঠিক নয়। মুত্র-নালীর অল্প একটু নিচে পিছনে ঘেসে যোনীনালীর অবস্থান।

যোনী-নালী

স্ত্রীলোকের মলদ্বারের উপরে এবং মুত্রনালীর নিচে যোনীনালীর মুখ। স্ত্রীলোক দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে যোনীনালীকে একটি লম্বা ফাটলের মত দেখা যাবে। কিন্তু শুয়ে থাকাবস্থায় উরুদ্বয়কে উপর দিকে উঠিয়ে ফাঁক করলে তখন যোনীমুখকে একটা ডিমের মত দেখা যাবে। ঐ যোনীমুখ হতে অভ্যন্তরে যে নালীটা জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকেই বলা হয়ে থাকে যোনীনালী। যোনীনালীর প্রাচীরগাত্র সর্বদা চেপে থাকে। কোনো রকম গর্ত বা ফাঁক দেখতে পাওয়া যায় না। একমাত্র যে সময় যোনীমুখে পুরুষাঙ্গ ঢুকানো হয়, তখনই যোনীপথ ফাঁকা হয়ে যায়। এটা ছাড়াও স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব (হায়েজ) ও শ্বেতস্রাবের সময় কিছুটা ফাঁকা হয়ে থাকে। যোনীনালীর সংকোচনতা এবং প্রসারতার ক্ষমতা অদ্ভুত ধরণের। এই কারণে সঙ্গমকালে পুরুষের লিঙ্গটা

ছোট বা বড় হলেও বেশ খাপ খেয়ে যায়। কোনো প্রকার অসুবিধা হয় না। স্ত্রীলোকের যোনীনালীর মাপ পাশের দিকে তিন হতে চার ইঞ্চি এবং ভিতরের দিকে পাঁচ হতে ছয় ইঞ্চির মত। স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গটা বিশেষভাবে সংকোচন ও সম্প্রসারণশীল পেশীতন্তু দ্বারা তৈরি। তাতে চাপ পড়লে প্রয়োজন মতো ফাঁকা হয়ে যায়। মেয়েলোকের সন্তান প্রসবের সময় যোনীনালীর অভ্যন্তর ভাগটা খুব নরম হলেও সমতল নয়, কতগুলো অসমান খাঁজে ভরা।

সতীচ্ছদ

স্ত্রীলোকের যোনীনালীর মুখটা ঝিল্লির পাতলা পর্দার একটা আবরণ দ্বারা বন্ধ হয়ে থাকে। এই পর্দাটার নামই হল সতীচ্ছদ। সতীচ্ছদ নানা প্রকারের হয়ে থাকে। সতীচ্ছদের উপরিভাগে দুটি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দ্বারা মেয়েদের ঋতুর (হায়েজের) সময় রক্তস্রাব বের হয়ে থাকে। এই প্রকারের সতীচ্ছদ হল স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো কোনো মেয়েদের সতীচ্ছদে অনেকগুলো ছিদ্র দেখা যায়। আবার তার পাশে করাতের মত খাঁজ কাটাও থাকে। আবার কারো সতীচ্ছদ ছিদ্রশূণ্য দেখা যায়।

মেয়েদের বিবাহের পরে যোনীনালীতে সঙ্গমকালে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের সময় অধিকাংশ স্ত্রীলোকের যোনীমুখের ঝিল্লির পর্দাটা ছিড়ে যায়। মেয়েলোকের সতীচ্ছদ না ছেড়া পর্যন্ত পুংলিঙ্গ যোনীনালীতে প্রবেশ করতে পারে না। এই সতীচ্ছদের পর্দা ছেড়ার সময় স্ত্রীলোকের সামান্য ব্যথা পেয়ে থাকে। কোনো কোনো স্ত্রীলোকের কিছুটা রক্তও বের হয়।

আবার কোনো কোনো স্ত্রীলোকের সতীচ্ছদের পর্দাটা বেশ পুরু এবং সম্প্রসারণশীল দেখা যায়। এই অবস্থায় যোনীনালীতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করতেই পারে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর জন্য দাম্পত্য জীবন কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় ডাক্তার দ্বারা অস্ত্রোপাচার করে সতীচ্ছদ অপসারণ করে নিতে হবে। তবে এটা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

কুমারী মেয়েলোকের সতীচ্ছদ হয় কিনা

মেয়েদের সতীচ্ছদ পাতলা হলে যৌনমিলন ছাড়াও অন্য কোনো কারণেও তা ছিড়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ রকম অবস্থা ঘটতে দেখা যায় যে, মেয়েদের বাল্যকালে বা কৈশোর জীবনে দৌড়াদৌড়ি,

লাফালাফি, সাঁতার কাটা, উঁচু জায়গা হতে নিচে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে সতিচ্ছদ ছিড়ে যেতে পারে।

অনেক পুরুষেরা এই রকম ধারণা পোষণ করে যে কুমারী মেয়েদের সতীচ্ছদ অক্ষুন্ন থাকবে। এ রকম ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। এতে অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে কলহ হতে পারে। পুরুষের অগ্রচ্ছাদার সাথে মেয়েলোকের সতীচ্ছদের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। অনেক ছেলেদের জন্ম থেকে দেখা যায়, তাদের অগ্রচ্ছদা একেবারেই মুক্ত। কোনো রকম চামড়ার আবরণ নেই। এটা প্রাকৃতিক ঘটনা। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর অসীম কুদরতের নমুনা। ইসলামী সমাজে এটাকে মুসলমানী সুন্নত বলা হয়ে থাকে।

বুঝা গেল যে, মেয়েদের বেলায়ও এই প্রকারে ছিন্ন সতীচ্ছদ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ সতীচ্ছদ ছাড়াও মেয়েরা জন্মগ্রহণ করে। এ নিয়ে তর্ক- বিতর্ক করা উচিত নয়।

স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে তার বাহ্যিক রূপের মোটামুটি পরিচয়ের পর এখন আভ্যন্তরীন বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

মেয়েলোকের যৌনাঙ্গের ক্ষুদ্রৌষ্ঠ আর মুত্রনালীর ঠিক মাঝখানে আধা ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত গোলাকার সিমের বিচির মত দুটি গ্রন্থি দেখা যায়, এই গ্রন্থি হতে দুটি সরু নল বের হয়ে যোনী মুখের নিকট এসে শেষ হয়েছে। এই গ্রন্থি দুটি সান্দনী গ্রন্থি। এই গ্রন্থি হতে সর্বদা এক প্রকার আঠা আঠা পিচ্ছল রস বের হতে থাকে। স্ত্রীলোকের কামনাবাসনার সময় এই রস অধিক পরিমাণে বের হয়। আবার ঐ রস স্বাভাবিকভাবে সর্বদা কিছু কিছু বের হতে থাকে। এই রস বের হয়ে যোনীনালীকে সর্বক্ষণ ভিজিয়ে রাখে বলে রতিক্রিয়ার সময় কষ্ট হয় না এবং হাঁটাচলায় ঘর্ষণে ব্যথা পায় না। স্ত্রীলোকের সানন্দী পুরুষাঙ্গের কাউপার গ্রন্থির সাথে কিছুটা মিল আছে।

স্ত্রী-প্রজননতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোর নাম

১। ফাণ্ডাস ২। জরায়ু দেহ ৩। জরায়ু-গ্রীবা ৪। জরায়ু মুখ
৫। যোনীনালী ৬। যোনীপথ ৭। বৃহদ্রৌষ্ঠ ৮। ক্ষুদ্রৌষ্ঠ
৯। মূত্রাশয় ১০। ভগ্নাঙ্কুর ১১। মলদ্বার
১২। আভ্যন্তরীণ যৌনী-প্রাচীর ১৩। বাইরের যোনী-প্রাচীর।

জরায়ু

পেঁপে বা লাউ উল্টে ধরলে যে রকম দেখতে পাওয়া যায়, মেয়েদের জরায়ুটা তদ্রুপ। অথবা কিছুটা পানের বটুয়া বা রাবারের বেলুনের মত হয়ে থাকে। তার গলাটা চিকন এবং পেটটা মোটা। এটা লম্বায় তিন ইঞ্চি হয় এবং চওড়ায় দুইঞ্চি হতে আড়াই ইঞ্চি হয়ে থাকে। এই জরায়ুর ভিতরেই ভ্রুণের আবির্ভাব এবং ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে। জরায়ুর অভ্যন্তরীণ প্রাচীর এক প্রকার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। এর জন্য জরায়ুর ভ্রুণ বিকাশোপযোগী হয়। মোটামোটিভাবে জবায়ুর তিনটি অংশ আছে।

জরায়ুর উপরের অংশকে ফাণ্ডাস, মধ্যের ফুলা চওড়া অংশটিকে জরায়ুর দেহ এবং নিচের চিকন মুখকে জরায়ুর গ্রীবা বলা হয়।

মেয়েদের জরায়ুর আকৃতি ত্রিভূজের মতো। তলপেটের গহব্বরে উপরের ভাগে এর অবস্থান। উপরের মোটা ভাগ উঁচুদিকে হেলে থেকে সরু জরায়ুগ্রীবা একটি গোল আধারের মতো মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যোনীনালীর শেষ ভাগের সাথে এসে মিশেছে। যোনীর সীমা পর্যন্ত এই অংশটুকুকে তলপেটের মুখ বলা হয়। একটি সরু ছিদ্রপথ বরাবর জরায়ুর ভিতর গিয়ে শেষ হয়েছে। মেয়েদের সন্তান প্রসবের সময় এই সরু ছিদ্র পথটি বেশ চওড়া হয়ে যায়। গর্ভের শেষ অবস্থায় প্রসবকালে জরায়ুর মাপ দশ হতে এগোরো ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে। প্রসবান্তে জরায়ুটা এক দেড় মাসের ভিতরে পূণরায় আস্তে ধীরে ছোট হয়ে যায়। জরায়ুর অবস্থান মেয়েদের মলপ্রকোষ্ঠ আর মুত্রাশয়ের মাঝ বরাবর।

ডিম্বকোষ

স্ত্রীলোকের ডিম্ববাহী নলের নিচে জরায়ুর দুদিকে বাদামের মতো আকৃতি বিশিষ্ট দুটি গ্রন্থিকে বলা হয় ডিম্বকোষ। দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ইঞ্চি এবং প্রস্থে এক ইঞ্চির মতো। এখানে গর্ভ সঞ্চারণের জন্য অসংখ্য ডিম্ব সৃষ্টি ছাড়াও এক প্রকার রস বের হয়। পুরুষের পৌরুষত্ব, সৌন্দর্য এবং মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা এর দ্বারা বিকশিত হয়ে থাকে। নারীর যৌবনের লাবণ্যতা, কাম-বাসনা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা ইত্যাদি এই ডিম্বাকোষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যে সকল স্ত্রীলোকের রোগের কারণে ডিম্বকোষ অস্ত্রোপাচার করে অপসারণ করা হয়েছে তাদের লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য মাঝ পথেই হারিয়ে গেছে। শরীর শুকনা, ঋতুস্রাব, এবং সন্তান ধারণের শক্তি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ না থাকলে তাদের জন্মের উদ্দেশ্যই বৃথা। তাদের রূপ-যৌবন আর মাতৃ-জীবনের স্বপ্নময়ী আশা আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে যায়।

ডিম্ববাহী নল

মেয়েদের জরায়ু আর ডিম্বকোষের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী দুটি সরু নল স্থাপিত আছে। ঐ নল দুটি জরায়ুর দেহে যে স্থানে মিশেছে, তা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ/ছয় ইঞ্চির মতো হবে। এটি ক্রমান্বয়ে চওড়া হতে হতে তার শেষ প্রান্ত ঝালরের মতো হয়েছে।

জরায়ুর দুই পাশের এই নলের মধ্য দিয়ে ডিম্বকোষ হতে ডিম্ব বের হয়ে জরায়ুর ভিতরে পড়ে এবং মেয়েদের মাসিক ঋতুকালে রক্তের সাথে যোনীনালী দিয়ে বের হয়ে যায়।

যৌনাঙ্গের প্রকারভেদ

যৌনবিদগণ পুরুষাঙ্গের শ্রেণীবিন্যাস করার সাথে সাথে মহিলাদের যৌনাঙ্গের শ্রেণী বিন্যাসও করেছেন। মহিলাদের যৌনাঙ্গ সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত। যথা–

১। হরিণী যোনি বা যৌনাঙ্গ।
২। ঘোটকী যোনি বা যৌনাঙ্গ।
৩। হস্তিনী যোনি বা যৌনাঙ্গ।

হরিণী যোনি বা যৌনাঙ্গ

এদের চটুল চক্ষুতে লাল রেখা থাকে। তাদের মুখ পদ্মের মত প্রফুল্ল, বাবলা জাতীয় গাছের ফুলের মতো তাদের গায়ের চামড়া কোমল হয়।

এদের স্তনও হয় কদম গাছের ফুলের মতো গোলাকার ও নরম। গায়ের চামড়া হয় চম্পা পুষ্পের মতো শ্বেতবর্ণ। তাদের নাসিকা হয় টিয়া পাখীর নাসিকার ন্যায় তীক্ষ্ণ ও লম্বা। তাদের হাত হয় মুক্তার ন্যায়। রাজহংসীর মতো হয় তাদের চলন। কণ্ঠস্বর হয় কোকিলের ন্যায় সুমধুর। হরিণীর মতো হয় গ্রীবা। তারা গুরুজন, ইমাম, শিক্ষক ও আল্লাহ্‌ভক্ত।

সাদা পোশাক পরিধান করতে তারা বেশ আগ্রহী। খাবার খেয়ে থাকে পরিমাণে সামান্য। তবে তারা বিলাসবর্তী হয় না। তথাপি অনুভূতিতে বেশ

পারদর্শিনী। কথা খুব কম বলে এবং নিদ্রা তুলনামূলক কম। তাদের যোনি ছয় আঙ্গুল পরিমাণ গভীর এবং পদ্মগন্ধা।

ঘোটকী যোনি বা যৌনাঙ্গ

কৃশা ও স্থুলকায় হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকায় বহূবর্ণ বিশিষ্ট বেশভূষা এদের বেশ প্রিয় জিনিস। এরা ধৈর্যহীনা। এদের স্তন হয় শিথিল। চক্ষু হয় কাপর্দ বা শ্যামবর্ণ কিন্তু বাঁকা চোখে কটাক্ষ মারতে খুব পটু। এদের চলন বেশ দ্রুত।

পুরুষের সাথে সহবাসে বেশ প্রিয় এবং সহাবাসের সময় পুরুষকে দংশন, আঁচড় এবং চিমটিতে বড়ই অগ্রসর। সুযোগ পেলে মদও পান করে। এদের কণ্ঠস্বর কর্কশ ও চিৎকার প্রবণ। লম্বা লম্বা দাঁত এবং খাড়া খাড়া চুলই এদের বিশেষত্ব। ঘুমের দিকে দিয়ে বেশ পটু। এদের যোনি হয় নয় আঙ্গুল পরিমাণ গভীর এবং মৎস্যাগন্ধা।

হস্তীনি যোনি বা যৌনাঙ্গ

এদের গতি ভঙ্গী হস্তীনির মতো। এদের আঙ্গুল হয় মাংসল এবং বাঁকা বাঁকা। গ্রীবা হ্রস্ব এবং মাংসল হয়ে থাকে। ওষ্ঠাধর হয় পুরু পুরু। নিতম্ব বা পাছা বেশ চর্বিযুক্ত। খাওয়ার বেলায় অনেককে হার মানিয়ে দেয়। এদের নিদ্রা হস্তিনীর মতই।

এদের শরীরে বেশ লোম থাকতে দেখা যায়। আচার ব্যাবহার হয় নির্লজ্জ। পুরুষের সাথে সহবাসে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। তবে বেশিরভাগই দেখা যায় কেবল অর্থের বিনিময়ে সহবাস করে থাকে।

এদের যোনি বেশ প্রশস্ত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো ধরণের পুরুষাঙ্গ ধারণ করতে সক্ষম।

নারীর যোনি

পুরুষদের পুরুষাঙ্গ যেমন ছয়, নয় এবং বারো আঙ্গুল লম্বা হতে পারে। ঠিক নারীর যোনিও ছয়, নয় ও বারো আঙ্গুল গভীর হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী বা উত্তেজনায় এদের যোনির ব্যাস মাংসপেশীর ক্রিয়ার দরুন কম-বেশি হতে পারে।

পুরুষের পুরুষাঙ্গ এবং নারীর যৌনাঙ্গ যদি সমান ব্যাসবিশিষ্ট ও দৈর্ঘ যুক্ত

হয়, তাহলে সহবাসের সময় উভয়ে বেশ আনন্দ পেতে পারে। একে বলে পূর্ণ মিলন বা সমআনন্দ।

মহিলাদের ঋতুস্রাব বা হায়েজ

বাংলাদেশের মেয়েরা সাধারণত বারো হতে ষোল বছর বয়সের ভিতরে হায়েজ বা মাসিক ঋতুস্রাব দেখে থাকে। আমাদের আবহাওয়া গরম বিধায় মেয়েরা এত কম বয়সে ঋতু বা হায়েজ দেখে থাকে। প্রতি মাসে মেয়েদের এই হায়েজ বা ঋতুস্রাব একবার হয়ে থাকে বলে এটাকে মাসিকও বলা হয়। মেয়েদের হায়েজ বা ঋতুস্রাব পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়ত মতে নয় বছর বয়সেও হায়েজ হয় এবং পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত তার স্থায়ীত্ব থাকে। গর্ভাবস্থায় মেয়েদের হায়েজ বা ঋতুস্রাব হয় না। যদি কারো হয় তাহলে তাকে গর্ভস্রাব বলা হয়।

স্ত্রীলোকের পঞ্চান্ন বছর বয়সের পরে ঋতুস্রাব দেখা যায় না। এর পরে গর্ভধারণের ক্ষমতা থাকে না। তখন তারা বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।

নিয়মতান্ত্রিক ঋতুস্রাব হওয়া মহিলাদের জন্য সুসংবাদ। অনিয়মতান্ত্রিক ঋতুস্রাব হওয়া তাদের দুর্ভোগের কারণ। ঋতুস্রাব সময়ে সহবাস অনুচিত। এতে উভয়েই মারাত্মক রোগে আক্রান্তের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ সময় সহবাস করা শরীয়ত কর্তৃক কড়াভাবে নিষিদ্ধ। ঋতুস্রাবের সময় সব ধরনের ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকা উচিত। এমনকি ঠাণ্ডা পানিতে হাত, বৃষ্টির পানিতে গোসল কিংবা শরীরে বেশি ঠাণ্ডা লাগালে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ঋতুস্রাবের সময় অধিক দৌড়ঝাপ, মেহনত, বোঝা উঠানো এবং এ জাতীয় ভারী কোনো কাজ না করা। প্রচণ্ড গরম এবং অধিক চা পান এ সময়ের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

হায়েয সম্পর্কে ভুল ধারণা

হায়েয বা ঋতুস্রাব সম্পর্কে অনেকের ধারণা, মহিলারা গর্ভবতী হলে, ঋতুস্রাবের রক্ত পেটের বাচ্চার খাবার হয়ে থাকে। বাচ্চা এ রক্ত খেয়ে জীবিত থাকে। এটা একেবারেই ঠিক নয়। ঋতুস্রাবের রক্ত বড়ই দুর্গন্ধ ও পচা বস্তু। যা শরীরে লাগলেও ঘৃণা আসে, সেটা কিভাবে মাসুম বাচ্চার খাবার হতে পারে? বাচ্চার শরীর একেবারে তুলতুলে, তার মেজাযও একেবারে কোমল,

সব ধরণের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত এবং গঠনপ্রকৃতিও একেবারে দুর্বল। সুতরাং রিযিকদাতা আল্লাহ্ কিভাবে এ ঘৃণ্য খাবার বাচ্চাকে দিতে পারেন?

প্রশ্ন হল, গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাবের রক্ত কোথায় যায়?

জবাবঃ কোনো মহিলা গর্ভবতী হলে, ঋতুস্রাবের রক্ত বাইরে আসা বন্ধ হয়ে যায়। বাচ্চা জন্মের সময় এ রক্তে পিচ্ছিল অবস্থায় ভুমিষ্ট হয়। এজন্যই ভুমিষ্ট হওয়ার সময় মহিলাদের মাত্রাতিরিক্ত রক্ত বের হয়।

গর্ভস্ত সন্তানের খাবার এসে থাকে মায়ের ভালো রক্ত থেকে। আর যে রক্ত খাওয়ার উপযুক্ত নয়, সে রক্ত বাচ্চা জন্মের সময় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে বের হতে থাকে। আরবী ভাষায় একে নেফাস বলে। ঋতুস্রাবের রক্ত তিনভাগে বিভক্ত। ১। যে রক্ত ফিলটার করা বা ফ্রেস কেবল সে রক্তই বাচ্চার খাবার ২। ঐ রক্ত যা বাচ্চার দুধের জন্য স্তনের দিকে চলে যায় ৩। ঐ রক্ত যা সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত বন্ধ থাকে, সন্তান জন্মের সময় এবং পরে বের হয়ে যায়।

জরুরি কথা

যেসব মহিলার ঋতুস্রাব বা হায়েয আসে না, সে মহিলা সন্তান ধারণে অক্ষম। তার থেকে কখনো সন্তান জন্ম নিবে না।

ঋতুস্রাব বা হায়েজের সময়কাল বা স্থায়িত্ব

মেয়েলোকের প্রতিমাসে জরায়ু হতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যৌননালী দিয়ে যে রক্ত বের হয়ে আসে তাকে ঋতুস্রাব বা হায়েজ বলা হয়।

হায়েজের সর্বনিম্ন সময়কাল তিনদিন তিনরাত। সর্বোচ্চ সময়কাল দশ দিন দশ রাত। এর পরের রক্তস্রাব এস্তেহাজার (রোগ) হিসাবে গণ্য হবে।

হায়েজের নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়কাল (মুদ্দত)

মেয়েদের সর্বপ্রথম মাসে যে কয়দিন হায়েজ (ঋতুস্রাব) থাকে ঐ কয়দিনকেই তার নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়কাল (মুদ্দত) বলে জানতে হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) উভয়ের মত এবং এই মতের উপরই ফতোয়া হয়েছে।

হায়েজের রং ও পরিমাণ

হায়েজের (ঋতুস্রাবের) রং ছয় প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

১। লাল। ২। কালো। ৩। হলুদ। ৪। সবুজ।
৫। শ্বেত মিশ্রিত লাল ও ৬। কালো মিশ্রিত লাল।

হায়েজের রক্তের পরিমাণ অবস্থাভেদে দুই হতে তিন ছটাকের মতো হয়ে থাকে, কিন্তু সবসময় এ পরিমাণ ঠিক থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তের পরিমাণ অনেক বেশি হয় তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

বেশি রক্তস্রাবের কারণ ও প্রতিকার

যে সকল মেয়েদের স্বাভাবিক নিয়মে ঋতুস্রাব হয়, তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নত হতে থাকে। যাদের অতি বেশি রক্তস্রাব হয়, তাদের রোগ বলে মনে করতে হবে। এই রোগকে অতিস্রাব বা রক্তপ্রদর বলা হয়। যাদের শরীর দুর্বল, রক্ত কম, স্বাস্থ্য রোগা, তারাই এই রোগে বেশি ভুগে।

মেয়েদের জরায়ুর ভিতরে ঝিল্লিযুক্ত অংশের ফুলা ফুলা অবস্থাই বেশি ঋতুস্রাবের কারণ। এটা ছাড়াও আরও কিছু কারণে বেশি স্রাব হয়। যেমন- জরায়ুতে ঘা, জরায়ুর স্থান পরিবর্তন, জরায়ু বড়, জরায়ু ছিড়ে গেলে অথবা সন্তান ভুমিষ্ঠের পরে ফুলের কোনো কচি আটকিয়ে থাকলে ইত্যাদি।

যদি কোনো মেয়েলোকের অতিরিক্ত স্রাব হতে থাকে, তবে দেখতে হবে তার এ স্রাবের কারণে নারীদেহ শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা এবং ঐ স্রাবে চাঁপবাধা কালো কালো খণ্ড রক্ত আসে কিনা? সাধারণত নিয়মিত স্রাবে রক্ত চাঁপবাধা কালো রং হয় না। অবশ্য জরায়ুর ভিতরে শ্লেম্মাদির সংমিশ্রণ থাকলে স্রাবের রক্তে চাঁপবাধা কালো রং হয় না। কিন্তু অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে শ্লেম্মাদির চেয়ে রক্তের পরিমাণ বেশি থাকে বলে সহজেই চাঁপ বেধে যায়। ঐ ধরণের অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ডাক্তারি ঔষধ ছাড়াও মেয়েলোকের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। যেমন- বেশি পরিশ্রম না করা, অধিক রাত না জাগা, বার বার কামনা-বাসনায় না পড়া, অতিমাত্রায় রতিক্রিয়া না করা ইত্যাদি মানা দ্বারা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়ার আশংকা থাকে না। যারা ঐ নিয়ম-কানুন মানে না তাদেরই অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হয়ে থাকে। তাই নারীদের নিরোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ঐ সকল কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করে চলতে হবে। তাহলে ঐ ধরণের রোগ ব্যাধি হতে পরিত্রাণ পাবে।

প্রতিষেধক

যাদের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তারা পরিশ্রমের কাজ কর্ম একটুও করবে না। খোলা জায়গায় আলো বাতাসে হাঁটাচলা করবে। উঁচু-নিচু স্থানে হাঁটবে না। সম্ভব হলে হালকা ব্যায়াম করবে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের সময় একটি বালিশ কোমরের নিচে রেখে চিৎভাবে শুয়ে কোমরটাকে চার পাঁচ ইঞ্চি উঁচা করে রাখলে অতিরিক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এইসব মেয়েদের লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে এবং বেশি পরিমাণে দুধ পান করতে হবে। অবশ্য নিয়মিতভাবে দুধ পান করতে পারলে খুবই উপকারে আসবে। গুরুপাক খাদ্য পরিহার করতে হবে। এছাড়া ভালো ফল খেতে চেষ্টা করবে। তবে ঐ অবস্থায় আনারস ফল না খাওয়া উচিত।

সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল, কোষ্ঠ কাঠিন্য যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। অর্থাৎ পায়খানা যাতে পরিষ্কার হয় সেদিকে বেশি খেয়াল রাখবে।

হায়েযের কতিপয় মাসআলা

◆ হায়েয চলাকালীন সকল প্রকার নামায-রোযা আদায় করা নিষেধ। তবে নামায ও রোযার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। হায়েযের কারণে নামায একেবারে মাফ হয়ে যায়, কিন্তু রোযা সাময়িকের জন্য মাফ হয়, পরবর্তীতে আদায় করতে হয়। কিন্তু নামায আর কখনো আদায় করতে হয় না।

◆ সুন্নত বা নফল নামাযরত অবস্থায় হায়েয দেখা দিলে, সাময়িকের জন্য মাফ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে তা কাযা করতে হয়। দিনে রোযা অর্ধেকের পর হায়েয দেখা দিলেও একই হুকুম। সাময়িকের জন্য মাফ হয়ে যাবে কিন্তু পরবর্তীতে কাযা করতে হবে। নফল রোযার ক্ষেত্রে একই হুকুম।

◆ ফরয নামায চলন্তাবস্থায় হায়েয দেখা দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যায় এবং সে ওয়াক্তের নামাযও মাফ হয়ে যায়।

◆ নামাযের শেষ ওয়াক্তে হায়েয দেখা দিলে যদি সে ওয়াক্তের নামায এখনও আদায় না করে, তবে নামায মাফ হয়ে যাবে কাযা করতে হবে না।

◆ রমযান মাসে হায়েয হলে দিনের বেলা পবিত্র হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার করা নিষেধ। রোযাদারের মতো না খেয়ে থাকা ওয়াজিব। তবে ঐ দিন রোযার মধ্যে গণ্য হবে না; বরং ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

◆ হায়েয অবস্থায় যে কাপড় পরিধান করেছিল, তাতে হায়েযের নাপাকি বা ভিন্ন কোনো নাপাকী লেগে না থাকে, তাহলে সে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতে পারবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি কোনো স্থানে নাপাক লেগে থাকে, তাহলে কেবল সে স্থানটুকই ধৌত করলে যথেষ্ট। পূর্ণাঙ্গ কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

◆ হায়েয চলাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করা হারাম। তবে একত্রে চলা-ফেরা, খাবার-দাবার, ঘুম, শয্যাগ্রহণ করা সবই জায়েয। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীর হাটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থানে তার কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে লজ্জত হাসেল করতে পারবে না। এ মুহূর্তে স্বামী তার স্ত্রী থেকে যৌন ক্ষুধা মিটাতে পারে না। শরীয়ত মতে হারাম হওয়ার সাথে সাথে হেকিমী মতেও বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ। যদি স্বামী এ মুহূর্তে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায়, তাহলে স্বামীকে নরম সুরে বুঝাবে। কথা না মানলে, কোনো ক্রমেই রাজী হবে না। কেননা পাপ কাজে কারো কথা মানতে নেই। নিতান্তই যদি যৌন ক্ষুধায় লিপ্ত হয়, তাহলে উভয়েই কবিরা গোনাহে গোনাহগার হবে।

◆ হায়েয চলাকালীন স্বামী তার স্ত্রীর নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত স্থানে হাত বা কোনো অঙ্গ লাগাবে না। কিন্তু নাভীর উপর থেকে মাথা পর্যন্ত অন্যান্য স্থানে হাত লাগাতে পারবে এমনকি চুমুও দিতে পারবে।

◆ কারো পাঁচ দিন বা নয় দিন নিয়মিত হায়েয আসত। সে নিয়ম মতো হায়েয হয়ে বন্ধ হয়ে গেল; সুতরাং যতক্ষণ গোসল না করবে, ততক্ষণ স্বামী সহবাস করতে পারবে না। তবে যদি এ অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামায চলে যায় এবং এর মধ্যে রক্তস্রাব না আসে, তাহলে বিনা গোসলে সহবাস করতে পারবে। এর পূর্বে সহবাস ঠিক হবে না।

◆ পূর্ণাঙ্গ দশ দিন দশ রাত রক্তস্রাব হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে সহবাস করাতে কোনো সমস্যা নেই। গোসল করুক বা না করুক।

◆ হায়েয চলাকালীন মহিলার শরীর ও মুখের লালা পাক। অন্য কোনো নাপাকী শরীরে থাকে সেটি ভিন্ন কথা। কেবল হায়েযের কারণে শরীর নাপাক বলা যাবে না। এ অবস্থায় শরীরে ছোঁয়া লাগলে বা স্বামী স্ত্রীর মুখের ভিতর জিহ্বা প্রবেশ করালে তাতে নাপাক হবার কিছু নেই।

◆ একদিন কিংবা দুদিন রক্তস্রাব হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করা ওয়াজিব নয়, অযু করে নামায পড়বে; কিন্তু সহবাস করা যাবে না। কেননা

পনের দিনের মধ্যে রক্তস্রাব শুরু হলে বুঝতে হবে যে, সেটা হায়েযের সময় ছিল। আর যদি পনের দিনের মধ্যে রক্তস্রাব দেখা না যায়; তবে প্রথম দু-এক দিনের রক্তস্রাব ইস্তেহাযা বলে বিবেচিত হবে এবং সে সময়কার নামাযও (যা আদায় করা হয় নি) কাযা করতে হবে।

নেফাস বিষয়ক কিছু কথা

◆ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলাদের যোনি থেকে যে রক্তস্রাব হয়, তাকেই নেফাস বলে।

◆ এক গর্ভে একাধিক সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে (৬ মাসের মধ্যে) প্রথম বাচ্চা ভূমিষ্ঠের পর থেকেই নেফাসের মেয়াদ গণনা করতে হবে। দ্বিতীয় সন্তান থেকে নয়।

◆ নেফাসের ঊর্ধ্ব মেয়াদ চল্লিশ দিন, নিম্ন মেয়াদের কোনো সময় সীমা নেই। দু-চার দিন বা এক-আধ ঘণ্টাও হতে পারে। এমনকি সন্তান প্রসবের পর রক্ত নাও আসতে পারে।

◆ প্রসবের পর একেবারে রক্ত না আসলেও গোসল করা ওয়াজিব।

◆ নেফাসের সময়সীমার মধ্যে সব সময় রক্ত আসতে হবে এমন নয়, বরং মেয়াদের ভিতরে মাঝে মধ্যে দুচার ঘণ্টা বা দুচার দিন বন্ধও থাকতে পারে। বন্ধ হওয়ার পর যদি আবার আসে, তাহলে মাঝখানের সময়কেও নেফাসের সময় ধরা হবে।

নেফাসের কতিপয় মাসআলা

◆ চল্লিশ দিনের কমে নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে, তাড়াতাড়ি গোসল করে নামায পড়তে আরম্ভ করবে। যদি গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির সম্ভবনা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। সাবধান! কোনোক্রমেই নামায ত্যাগ করবে না। নামায ত্যাগের কোনো সুযোগ নেই।

◆ অনেক এলাকায় এ প্রচলন আছে যে, চল্লিশ দিনের কম সময়ে নেফাস বন্ধ হলেও নামায রোযা আদায় করা যাবে না বরং চল্লিশ দিন পার হতেই হবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং যখনই রক্ত আসা বন্ধ হবে, তখনই গোসল করে নামায আদায় করতে হবে।

◆ চল্লিশ দিন অতিক্রম করেও যদি কারো রক্তস্রাব আসে, তাহলে চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্তেহাযা সাব্যস্ত করে ইস্তেহাযার মাসআলা অনুযায়ী প্রতি ওয়াক্তে অযু করে নামায আদায় করা শুরু করবে। যদি এটা জীবনের প্রথম নেফাস না হয়ে থাকে, তাহলে ইতিপূর্বে তার কত দিন নেফাস ছিল, তা নির্ধারণ করে বাকি দিনগুলোকে ইস্তেহাযা সাব্যস্ত করে অনাদায়ি নামাযগুলো কাযা করে নিবে।

◆ কারো পূর্বে নিয়ম ছিল ত্রিশ দিন নেফাসের। কিন্তু এবার ত্রিশ দিনে তা বন্ধ হল না; এমতাবস্থায় সে গোসল না করে অপেক্ষা করবে। যদি চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে স্রাব বন্ধ হয় তবে এই চল্লিশ দিনই নেফাস। আর যদি চল্লিশ দিনের বেশী রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে আগের অভ্যাস অনুযায়ী ত্রিশ দিন নেফাস এবং অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযায় গণ্য হবে। চল্লিশ দিন পর গোসল করে পবিত্র হবে এবং ত্রিশের পরের দশ দিনের নামায কাযা পড়বে।

◆ নেফাসের সময়ও নামায সম্পূর্ণ মাফ, তবে রোযা মাফ নয়। রোযা কাযা করতে হবে।

◆ নেফাসের সময়ও সহবাস ও হাটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থান ভোগ করা হারাম। তবে একত্রে খাবার-দাবার, চলা-ফেরা, বিশ্রাম ও শয্যাগ্রহণ সবই করা যাবে।

হায়েয-নেফাসের বিবিধ মাসায়েল

◆ হায়েয নেফাস চলাকালিন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করা যাবে না। অর্থাৎ গোসল ওয়াজিব থাকা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ, কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও স্পর্শ করা সবই নিষেধ। তবে কুরআন শরীফ যদি গেলাফ দ্বারা মোড়ানো থাকে বা আলগা কাপড় দ্বারা পেচানো থাকে, তাহলে প্রয়োজনে স্পর্শ করা যাবে।

◆ নাপাক হালতে কুরআনের একটি পরিপূর্ণ আয়াত পড়া ঠিক নয়, তবে একটি ছোট আয়াত বা তার চেয়ে কম হলে পড়া যাবে।

◆ অযুবিহীন কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যায় না, মৌখিকভাবে পড়া যায়।

◆ পরিহিত কাপড় দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে আলগা কাপড় দ্বারা স্পর্শ করা যাবে।

◆ টাকা-পয়সা, তশতরী, রুমাল, তাবিজ অথবা অন্য কোনো বস্তুতে কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে, নাপাক অবস্থায় অর্থাৎ হায়েয নেফাসওয়ালী মহিলারা ও যাদের উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে, তারা কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না। তবে যদি কোনো পাত্রে বা থলিতে রক্ষিত থাকে, তবে সে পাত্র স্পর্শ করা যাবে।

◆ দোয়ার নিয়তে যদি সূরা ফাতিহা বা কুরআন শরীফে যে সকল আয়াত দুআ মুনাজাত সম্বলিত, তিলাওয়াতের নিয়ত বাদে কেবল দুআর নিয়তে পাঠ করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

◆ প্রতি ওয়াক্তে হায়েয নেফাসওয়ালী মহিলারা সত্তর বার ইস্তেগফার পড়লে এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার সওয়াব পাবে।

◆ কারো উপর গোসল ফরয ছিল এবং গোসল শেষ করার পূর্বেই ঋতুস্রাব শুরু হল, এমতাবস্থায় তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। বরং ঋতু হতে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করবে। এ গোসলই উভয় প্রকার গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে।

◆ পবিত্র হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য যদি মহিলারা এমন ঔষধ ব্যবহার করে, যা সাময়িকভাবে হায়েযকে বন্ধ করে দেয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো প্রকার অসুবিধা নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন করা জায়েয আছে। তদ্রূপভাবে রমযানের ত্রিশটি রোযা রমযানের ভিতরেই পালনের উদ্দেশ্যে এমনটি করা জায়েয আছে। তবে চিকিৎসা বিদ্যা অনুযায়ী শরীরের জন্য ক্ষতিকর।–জাদীদ ফিকহী মাসাইল

◆ যদি কারো ব্যবহৃত কুরসুফ (নেপকিন) ভিজে অবস্থায় লাল অথবা হলুদ বর্ণের থাকে; কিন্তু তা শুকিয়ে গেলে সাদা বর্ণের হয়ে যায়। এর উপর হায়েযের হুকুম প্রয়োগ করা হবে। কেননা, ভিজে অবস্থার ধর্তব্য হবে।

◆ হায়েয অবস্থায় চারকুল ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা জায়েয নেই। তবে দুআর নিয়তে জায়েয আছে।

◆ হায়েয অবস্থায় শিক্ষিকা ছাত্রীদের থেকে সবক শুনতে পারবে। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে ছাত্রীদের কোনো গোনাহ্ হবে না।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম যপনা করা জায়েয।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় হাতমুজা পরিধান করে কুরআন শরীফ কিংবা কুরআনী আয়াত সম্বলিত কোনো কাগজ ইত্যাদি ধরা বা বহন করা জায়েয নেই, যদিও মোজা চামড়ার হোক না কেন। কারণ, হাত মোজা হাতের মধ্যেই গণ্য হয়ে থাকে।

◆ হায়েয নেফাসের হালতে যমযমের পানি পান করা যাবে। তেমনিভাবে যে পানিতে আয়াতে কুরআনী অথবা দুআ পড়ে ফুঁক দেয়া হবে, তা পান করা জায়েয।

◆ হায়েয ও নেফাসের হালতে ফেকাহ্ বা হাদীস গ্রন্থ স্পর্শ করা বা বহন করা মাকরূহ। কেউ কেউ বলেছেন, জায়েয আছে, কিন্তু তা অনুত্তম। তবে উত্তম হল এই যে, রুমাল ইত্যাদি দ্বারা স্পর্শ করা।

◆ হায়েয ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ লিখতে পারবে না। কারণ, কুরআন লেখা, পড়া ও ছোঁয়ার একই হুকুম।

◆ হায়েয অবস্থায় কুরআনের অনুবাদ লেখা মাকরূহ।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় জায়নামাযে বসে যিকির-আযকার করতে পারবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে, জায়নামাযে যেন নাপাক না হয়।

◆ হায়েয অবস্থায় কারো মুখ থেকে সেজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াত পাঠ করতে শুনলে, পাঠকারীর জন্য সেজদা ওয়াজিব। কিন্তু শ্রোতার জন্য ওয়াজিব নয়।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় আযানের জওয়াব দেয়া যাবে।

ইস্তেহাযার পরিচয়

◆ স্ত্রী-লোকের যৌনাঙ্গ থেকে যে রক্ত তিন দিন থেকে কম বা দশ দিনের চেয়ে বেশী অথবা নেফাসের সময় চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশী এসে থাকে, আরবী ভাষায় তাকে ইস্তেহাযা বলে।

◆ নয় বছরের পূর্বে কোনো মেয়ের রক্ত এলে, সেটা ইস্তেহাযার হুকুম।

◆ সন্তান পেটে থাকাবস্থায় যদি রক্ত দেখা দেয়, সেটাও ইস্তেহাযা।

◆ সন্তান জন্মের সময় বা জন্মের পূর্বে যে রক্ত বা পানি বের হয়, সেটাও ইস্তেহাযা। অর্থাৎ বাচ্চার অর্ধেক অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত যে রক্ত বা পানি বের হয় সেটা ইস্তেহাযা।

ইস্তেহাযার হুকুম ও মাসায়েল

◆ হায়েয নেফাসের ন্যায় ইস্তেহাযা চলাকালিন নামায রোযা মাফ হয় না। নামায রোযা আদায় করতে হয় এবং সহবাস করাও জায়েয। ইস্তেহাযা বন্ধ হলে গোসল করা ওয়াজিব নয়।

◆ ইস্তেহাযা থাকাকালীন প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তে নতুন ওযু করবে এবং এর দ্বারা ফরয, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সর্বপ্রকার নামাজ পড়তে পারবে। ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে অযুও ভেঙ্গে যাবে।

◆ ইস্তেহাযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের নিয়তে অযু করে তিলায়াত ও সে ওয়াক্তের নামায আদায় করা যায়। এ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে অযুর বাদ হয়ে যাবে।

◆ ইস্তেহাযা যদি সব সময় না হয়, বরং মাঝে মাঝে হয় আবার মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে। তাহলে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে যখন ইস্তেহাযা বন্ধ হবে, তখনই নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা, ইস্তেহাযা থাকা সত্ত্বেও যখন রক্ত পড়া বন্ধ হয় তখন নামায আদায় করা উত্তম।

◆ ইস্তেহাযা অবস্থায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে। কুরআন শরীফও স্পর্শ করতে পারবে।

◆ এক অযু দ্বারা এক ওয়াক্তের নামায আদায় হবে, একাধিক ওয়াক্তের নয়। তবে এক ওয়াক্তে একাধিক কাযা নামায আদায় করতে পারবে।

গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল

◆ গর্ভপাত হলে যদি সন্তানের হাত-পা ইত্যাদি তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে বাচ্চা ধরা হবে এবং যে রক্ত বের হবে সেটাকে নেফাসের রক্ত বলে বিবেচিত হবে। সন্তানকে দাফন-কাফন দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পয়, তাহলে যে রক্ত বের হয়েছে তা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না। বরং দেখতে হবে ইতিপূর্বে যে হায়েয হয়েছে, তা যদি পনের দিন বা তার চেয়ে বেশী পূর্বে হয়ে থাকে এবং এখনকার রক্ত নিম্নে তিন দিন দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এটা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি ইতিপূর্বে হায়েয পনের দিনের কম সময় আগে হয়ে থাকে এবং বর্তমানের রক্ত তিন দিনের কম দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এটা ইস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য করা হবে।

উল্লেখ্য যে, সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশের পর (যার মেয়াদ ১২০ দিন) গর্ভপাত করানো হারাম।

ধ্বজভঙ্গ পুরুষের পরিচয়

আরবী ভাষায় ধ্বজভঙ্গ পুরুষকে عِنِّين (ইন্নীন) বলা হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগের অনেক কারণ থাকলেও এ রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। চিকিৎসার মাধ্যমে পূর্ণসুস্থতা লাভ সম্ভব। সকল ধ্বজভঙ্গ রোগীর উচিত অভিজ্ঞ হেকিমদের স্মরণাপন্ন হওয়া।

ধ্বজভঙ্গ রোগ চেনার উপায়

যেসব পুরুষদের বীর্য খুব কম সৃষ্টি হয়। আর যেটুকু সৃষ্টি হয়, তাও আবার পাতলা। মজা স্বাদ অনুভব করা ছাড়াই এমনকি পুরুষাঙ্গ দাঁড়ানো ব্যতীতই বীর্যপাত হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে পুরুষাঙ্গ চিকন ও নিস্তেজ হতে থাকে। ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়া পেলে তা সংকোচিত হয় না। কারণ পুরুষাঙ্গ আগে থেকেই সংকোচিত হয়ে আছে। পুরুষাঙ্গ যদি একেবারেই না দাঁড়ায়, শত চেষ্টা করেও যদি দাঁড় করানো সম্ভব না হয় বরং পূর্বের হালতেই থাকে এবং এ হালত দীর্ঘদিন যাবত হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কারণ চিকিৎসার দ্বারা তারা সুস্থ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি কারো অবস্থা উপরোক্ত হালতের চেয়ে কিছুটা কম হয়ে থাকে, ঠাণ্ডা পানির ছোয়ায় পুরুষাঙ্গ পূর্বের তুলনায় কিছুটা সংকোচিত হয়, তাহলে এসব রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। তারা সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ। তাদের উচিত অভিজ্ঞ হেকিম দ্বারা চিকিৎসা করানো।

এ রোগ ভয়ানক কঠিন; এ রোগ যার হয়েছে সব সময় সে চিন্তা ও টেনশনে ভোগে। ধ্বজভঙ্গ হলে সংসার করা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে, স্ত্রী সহবাসে ও সন্তানের মুখ দর্শনে বঞ্চিত হতে হয়। পুরুষের পক্ষে ধ্বজভঙ্গ কি কঠিন ও ভয়ঙ্কর রোগ তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ-ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, পুরুষত্বহীন, স্ত্রী গমনে অক্ষমতা, শরীরের দুর্বলতা হয়। এজন্য এ রোগের তদবীর শুরুতে করতে হয়। রোগ পুরাতন হয়ে পেকে গেলে বহুদিন তদবীর করলে তবে হয় তো ভালো হয়। নতুবা সকল তদবীর নিস্ফল হয়ে যায়। এজন্য ইউনানী হাকিমগণ এ রোগের তদবীর শীঘ্র করতে বলেন। অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, হস্ত মৈথুন ও বেশ্যাগমনে এসব রোগ হয়ে থাকে।

ধ্বজভঙ্গের প্রাথমিক তদবীর

❖ শতমূলী দুই তোলা, দুধ ষোল তোলা ও পানি চোষট্টি তোলা একত্রে আগুনে জাল দিয়ে ষোল তোলা থাকতেই নামাবে। এক তোলা ঔষধ দুই থেকে তিন চামচ চিনি মিশিয়ে সেবন করবে। এ ঔষধ বছরে একবার ব্যবহার করবে। এটা সেবনে কোনো ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হতে পারে।

❖ জিরাকেরমানী, সোওয়াবাকেলা, চিনি পিষে জৈতুন তৈল আর বাবুনার তেলে মিশ্রিত করে মলম তৈরি করবে। এরপর ঐ মলম অল্প আগুনে গরম করে প্রলেপ দিয়ে পট্টি বেঁধে রাখবে।

❖ আনারের পাতা এক তোলা, মেহদির পাতা এক তোলা, নিম পাতা এক তোলা, সোডা এক তোলা, এক সঙ্গে মিশ্রিত করে ফাঁকি করে খাবে।

❖ মাকাল ফলের শাস সাতবার পানিতে ধৌত করে আধা পোয়া আটার সাথে দুই ছটাক চিনি দিয়ে হালুয়া প্রস্তুত করে দৈনিক সকালে এক তোলা পরিমাণ সেবন করবে।

❖ প্রথমে পরিমাণমত একটা পান নিবে। উক্ত পানে খাঁটি ঘি মাখিয়ে আগুনে গরম দিব। পান গরম গরম অবস্থায় লিঙ্গে পেচিয়ে বেঁধে রাখবে এবং সকালে খুলে ফেলবে। কমপক্ষে এভাবে ২১ দিন বাঁধবে এবং সকালে খুলে ফেলবে। এতে অবশ্যই লিঙ্গের উত্তেজনা ফিরে আসবে। এ সময় সকালের ভিজানো ছোলাবুট, মাখন এবং পুস্টিকর খাবার নিয়মিত খাবে।

❖ যে সব আমে বীজ হয় বা আটি হয় নি, এরকম আম ছোট ছোট করে কেটে রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে ভালোভাবে ছাকবে। উক্ত গুড়ো এক তোলা পরিমাণ সমপরিমাণ আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে এক সপ্তাহ সকালে খালি পেটে সেবন করলে যাবতীয় ইন্দ্রীয় দোষ ভালো হয়ে যাবে।

❖ দৈনিক একটি করে কবুতরের বাচ্চা, লঙ্কা ছাড়া সামান্য গরম মসল্লা ও লবন মেখে ঘি-এ ভেজে রাতে শয়নকালে ভক্ষণ করবে। ২ থেকে ৩ সপ্তাহ নিয়মিত তা ভক্ষণ করলে ধ্বজভঙ্গ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হবে।

❖ চল্লিশটি খোরমা ফল দানা ফেলে আধা সের পরিমাণ ঘি-এ ভেজে আধা সের মধুতে ভিজিয়ে একটি কাঁচের বৈয়ামে রাখবে। দৈনিক সকালে ১টা করে ঐ খোরমা খেলে ধ্বংভঙ্গ রোগ আরোগ্য হবে।

❖ আফুলা শিমুল গাছের মূলের ছাল বাতাসে শুকিয়ে চূর্ণ করে ১ ছটাক চূর্ণ করে ১ ছটাক পরিমাণ মধুর সাথে মেখে সমপরিমাণ ১৭টি বটিকা

বানাবে। দৈনিক সকালে ১টি করে বটিকা ঠাণ্ডা পানির সাথে সেবন করলে ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হবে।

❖ যারা যৌন ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন, পুরুষাঙ্গ দুর্বল বা নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাদের জন্য একটি চমকপ্রদ ঔষধ হল, একটি পাকা বেল ভাঙ্গার পর ভিতরে কতগুলো লম্বা লম্বা আঠাল কোষ পাওয়া যাবে। আমরা তাকে বিচি বলে জানি। উক্ত বিচি মূল আঠার সাথে সমপরিমাণ পাকা সবরি কলা নিয়ে ভালোভাবে চটকায়ে পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে একটি পান দিয়ে লিঙ্গ পেচিয়ে দৈনিক দুই ঘণ্টা বেধে রাখবে। এভাবে তিন থেকে চার সপ্তাহ ব্যবহার করলে দুর্বল পুরুষাঙ্গ অতি তাড়াতাড়ি সতেজ ও সবল হয়ে উঠবে।

স্বপ্নদোষ রোগ

স্বপ্নদোষ বলা হয় ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়াকে। 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা ও তার চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরো কিছু অতিরিক্ত আলোচনা করা হচ্ছে। যেসব কারণে স্বপ্নদোষ দেখা দিতে পারে। যেমন—অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা, কু-চিন্তা ফিকির, অশ্লীল স্বপ্ন দেখা, বদ হজম ও পেট খারাপের কারণে। মূত্রথলির দুর্বলতা, বীর্যথলি ভরপুর ইত্যাদি। বীর্যথলি ভরপুর অবস্থায় নতুন বীর্য তৈরী হলে, অতিরিক্ত বীর্য বের হয়ে আসে। বীর্য অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ ছাড়া বাকিগুলো বীর্যপাতলা বা ধাতু দুর্বলতার কারণে হয়। যার চিকিৎসা আবশ্যক।

স্বপ্নদোষ হওয়ার যতগুলো কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে বদ নযর হল অন্যতম। মনের ইচ্ছা নিয়ে কোনো বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, অধিকাংশ সময় স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলার হাজার শোকর যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে [মূল লেখক] বিগত কয়েক বছর যাবত স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা করেছেন। দীর্ঘদিন স্বপ্নদোষ না হওয়াতেও আমি ঘাবরিয়ে গেলাম, না জানি আমার আবার কোন্ রোগ দেখা দিল। এজন্য আমার মুরব্বীদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। তারা আমাকে শান্তনা দিলেন যে, দেখ! স্বপ্নদোষ বেশিরভাগ বদ নযরের কারণে হয়ে থাকে, কারো যদি স্বপ্নদোষ না হয়, তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কিছুদিন পর আমি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর রেছালা মুতালাআ করলাম, তাতে লেখা হয়েছে যে, স্বপ্নদোষের উল্লেখযোগ্য কারণ

হল বদ নযর ও বদ খেয়াল। এক তাফসীরে আল্লামা সুয়ুতী রহ. লিখেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ জীবনে কখনো স্বপ্নদোষ হয় নি।

হযরত শায়খ জাকারিয়া রহ. লিখেন, তার জীবনে কেবল একবার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আর তাও হয়েছিল উটের উপর সাওয়ার অবস্থায়। নবী ও রাসূলগণের স্বপ্নদোষ না হওয়ার করণ হল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বদ নজর ও বদ খেয়াল থেকে মুক্ত রেখেছেন।

সকল পুরুষের স্বপ্নদোষ হতে হবে এমনটি নয়। বরং কারো সারা জীবনে স্বপ্নদোষ নাও হতে পারে। আবার কারো কারো দেখা যায় যে, মাসে দুএকবার হয়ে থাকে। যদি কারো মাসে দুএকবার স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তাকে হেকিমের স্মরণাপন্ন হতে হবে না। কিন্তু যদি কারো অবস্থা এমন হয় যে, এক মাসে চার পাঁচ বার বা তার চেয়েও বেশি স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তাকে হেকিমের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

যদি কারো এভাবে মাসকে মাস বছরকে বছর স্বপ্নদোষ হতে থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে তার শরীরে দুর্বলতা দেখা দিবে। অনেক লোক এমনও আছে যে, এক রাতেই তার একাধিকবার স্বপ্নদোষ হয়। এসব লোক একেবারেই দুর্বল হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠলেই মাথা ঘুড়াবে, শরীরে দুর্বলতা অনুভব হবে, চোখে অন্ধকার দেখবে, চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যাবে, মন ভালো থাকবে না।

অবস্থা এমন হয় যে, বীর্য পাতলা হতে হতে পানির ন্যায় হয়। স্বপ্নদোষ কখন হয়, সে নিজেও জানে না। পেশাব পাখানার সময়ও বীর্যপাত হয়। কোনো সুন্দরী রমনীর সাথে আলাপ করলে, কোনো যৌনবিষয়ক বই পড়লেও বীর্যপাত হয়ে যায়। যখন কারো বীর্য এমন পাতলা হয়ে যাবে, তখন তার দ্বারা সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

অধিক বীর্যপাত ও মাত্রাতিরিক্ত স্বপ্নদোষের ক্ষতি

বীর্যপাত ও স্বপ্নদোষের আধিক্যতার ক্ষতি যৌবনের সূচনাতে তেমন বুঝা যায় না এবং শরীর তেমন দুর্বলও হয় না। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও নিজের দিকে খেয়াল করে না। মাঝে মাঝে সকাল বেলা তার মাথা ব্যথা করে, মাথা ভারী ভারী মনে হয়। বিশেষ করে বীর্যপাতের পর মাথা হালকা হালকা ব্যাথা অনুভব হয়। যদি কারো এক রাতেই একাধিকবার স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে

সে অস্থিরতা ও আত্মভোলা রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। কোনো রোগের কারণে কেউ এমন অন্ধ হয় না যেমন হয় অধিক বীর্যপাতের কারণে। অধিক স্বপ্নদোষে চোখের দৃষ্টি কমার সাথে সাথে দিল-মনও দুর্বল হয়ে যায়। শরীরে কম্পন রোগ হয়, খাদ্য হজম হয় না। অণ্ডকোষদ্বয় ঝুলা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঢিলা হয়ে যায়। স্মরণশক্তি কম ও মাঝে মাঝে কানে টুনটুনি আওয়াজ হয়।

আবার কারো কারো ঘুম হয় না– এমন রোগী খুব কমই পাওয়া যায়। এ রোগের বেশিরভাগ লোকদের ঘুম বেশি হয়ে থাকে। যখন তারা ঘুমায়, ভয়ানক স্বপ্ন দেখে। এসব লোকেরা পেরেশানীতে ভুগে, চেহারার লাবণ্যতা থাকে না। সাদা চেহারাদারী ব্যক্তিদের চেহারা হরিদ্রাবর্ণ হয়ে যায়। উপরে নিচে উঠানামার সময় হাঁপানো ও সামান্য কাজ করলেই অস্থির হয়ে যায়। বেশি বেশি পেশাব হয়। কারো কারো পেশাবে দুর্গন্ধও প্রকাশ পায়। ভালো ও উত্তম খাওয়ার পরও কোনো উপকার হয় না বরং দিন দিন চিকন হতে থাকে।

যদি কারো মাঝে উপরোক্ত আলামত পাওয়া যায়, নিজেকে বাঁচাতে হলে অতিশীঘ্র তাকে হেকিমদের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

স্বপ্নদোষ রোগের বিভিন্ন কারণ

যেসব লোকদের মাঝে স্বপ্নদোষ রোগটি বিদ্যমান, বিভিন্ন কারণে তাদের মাঝে এ রোগটি পাওয়া যায়। যথা–

হস্তমৈথুন, অধিক সহবাস, সমকামিতা, বীর্যের আধিক্যতা, আপত্তিকর মহব্বতের খেয়াল জাগা, চিত হয়ে শয়ন করা, পুরুষাঙ্গ পেটের বরাবর রেখে শয়ন করা, বদ হজম, অধিক খাবার গ্রহণ, পুরুষাঙ্গে চুলকানি রোগ থাকা, পুরুষাঙ্গে চর্মরোগ হওয়া, গোপ্তস্থানের পশম বৃদ্ধি পাওয়া, কারো সাথে কু-সম্পর্ক থাকা, মহব্বত ও ভালোবাসাজনিত দৃশ্যাবলি দর্শন, কিডনি বা মূত্রথলীর দুর্বলতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বপ্নদোষ রোগের চিকিৎসা

স্বপ্নদোষের ক্ষতির দিকগুলো উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন স্বপ্নদোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা হবে।

❖ স্বপ্নদোষ থেকে মুক্তির পথ ও পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি হল নিজের খেয়াল ও ধ্যান ধারণাকে সব সময় পাক সাফ রাখবে। নিজের মনকে নিজের আয়ত্বে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সৎ ও ভালো লোকদের সাথে চলাফেরা করবে। এসবের সাথে সাথে খাবার ও পেট ভালো রাখাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

❖ অধিক মসলাজনিত খাবার, যেসব খাবার বিলম্বে হজম হয়, সেগুলো যথাসম্ভব কম খাবে। যেমন- গোশত, কাবাব, ডিম, অধিক পরিমাণে চা পান, কফি পান, বেগুন, মশুরির ডাল ইত্যাদি।

❖ খাবার দাবার বিশেষ করে রাতের খাবার কমিয়ে দিবে এবং শোয়ার কমপক্ষে দুই ঘন্টা পূর্বে খাবে। শোয়ার সময় অধিক পরিমাণে পানি ও চা পান করবে না। শোয়ার পূর্বে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন সেরে ঘুমাবে। মূত্রথলীতে পেশাব জমা হয়ে স্বপ্নদোষ হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। নরম ও গরম বিছানায় শয়ন করা অনুচিত। বরং এমন ঘরে শোবে, যে ঘরে আলো বাতাশ প্রবেশ করে।

❖ চিত হয়ে শয়ন করাও স্বপ্নদোষ হওয়ার সহায়ক।

❖ শেষ রাতে পেশাবের বেগ হলেই উঠে পেশাব করবে।

❖ গরমকালে রাতে অধিক গরম লাগলে এবং মেজাজও গরম থাকলে যদি গোসল করার দ্বারা কোনো সমস্যা না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে গোসল করে নেওয়া অনেক লাভজনক।

❖ স্বপ্নদোষ প্রতিরোধক ঔষধ বেশি দিন সেবন করবে না। এতেও উল্টা এ্যাকশন হতে পারে। আজীবনের জন্য ধ্বজভঙ্গ রোগ হতে পারে।

❖ স্বপ্নদোষ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি শয়নকালে কখনো লিঙ্গে কোনো প্রকার মলম বা মালিশ ব্যবহার করে শয়ন করবে না। অন্যথায় স্বপ্নদোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

❖ স্বপ্নদোষ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বপ্নদোষের চিকিৎসার পূর্বে হেকিমের নিকট নিজের পেটের হালত বর্ণনা করবে। চিকিৎসা চলাকালিন যৌনচাহিদা বৃদ্ধিকারী কোনো প্রকার খাবার বা ঔষধ ব্যবহার করবে না।

❖ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রাতের খাবারে কাঁচা পেঁয়াজ খাবে না। অন্যথায় এ রাতেই স্বপ্নদোষ হবে।

❖ তামাক, বিড়ি, সিগারেটও সেবন করবে না। যদি এসব পান করতে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে তা পরিত্যাগ করবে। কেননা, তামাক

মানুষের দেমাগ ও বীর্যের জন্য অধিক ক্ষতিকর। বিষ যেমন মানুষকে ক্ষতি করে, তামাক মানুষকে তারচেয়েও বেশি ক্ষতি করে। এটা যদি মাত্রায় একটু বেশি সেবন করা হয়, তবেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সমস্ত শরীরকে দুর্বল বানানো, মাথা ঘেমে পানি পড়া, মাথা ঘুরা, বমি, চোখে সরিষার ফুল দেখা, দৃষ্টিশক্তি কম, শ্রবণশক্তি হ্রাস, হাত পায়ে জ্বলন, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হজম শক্তি দুর্বল এমনকি আত্মভোলা হয়ে যায়। হেকিমদের মতে তামাক অধিক পরিমাকে ব্যবহার করলে একসময় মানুষের ফোফরাও নষ্ট হয়ে যায়। দিলে ধুক ধুকানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ জাতীয় আরো অনেক রোগ দেখা দেয় যা একজন সুস্থ মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অভিজ্ঞদের মতে তামাক গ্রহণকারীদের সন্তানও দুর্বল হয়ে থাকে।

স্বপ্নদোষের চিকিৎসা এভাবে করবে–

❖ কাবাবচিনি ও মকরধজ একসাথে মিশিয়ে চিনি সহযোগে সাতদিন ব্যবহার করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

❖ দৈনিক সকালে কবিতরের গম সমান পরিমাণ ইছবগুলের ভূষি সেবন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

❖ সকাল বেলা এক ছটাক ধনিয়া ভালোভাবে কচলে একগ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রাতে শয়নকালে উক্ত পানি ছেকে ২ চামচ চিনি দিয়ে শরবতের মতো বানিয়ে পান করবে। এতেও স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

❖ আধা তোলা ধনিয়ার গুড়ো ২ চামচ মধুসহ সকালে নিয়মিত সেবন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

❖ রাতে শয়নকালে লিঙ্গে ওলিভয়েল তৈল মালিশ করে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

❖ চার আনা পরিমাণ অশ্বগন্ধা চূর্ণ করে রাতে ঘুমের কিছুক্ষণ আগে কাচা দুধে মিশিয়ে সেবনের পর ঘুমালে ইনশাআল্লাহ স্বপ্নদোষ হবে না।

❖ শনিবার অথবা মঙ্গলবার রাত্রি বেলা শশ্মানঘাটের ধুতরা গাছের মূল অর্থাৎ শিকড়, কোমরে বেধে রাখলে আর কোনোদিন স্বপ্নদোষ হবে না।

❖ রাতে শোয়ার সময় ভালোভাবে মুখমণ্ডল কান পর্যন্ত, হাত বগল পর্যন্ত এবং পা হাটু পর্যন্ত এমনকি গলাও উত্তমরূপে ধৌত করে ঘুমাবে।

❖ মাত্রাতিরিক্ত চা ও সিগারেট সেবন না করা।

❖ রাতে বেশী পরিমাণ খানা খাওয়া উচিত নয়। অধিক রাত পর্যন্ত

জেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নিয়মিত আহার ও নিদ্রা যাওয়া উচিত।

❖ জৈতুনের তেল পুরুষাঙ্গ ম্যালিশ করে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ হয় না। একখণ্ড শিশা পুরুষাঙ্গের মূলদেশে বেঁধে রাখলেও শুক্রপাত হয় না।

তদ্রূপভাবে দুই তোলা চিনি ভালোভাবে গুড়ো করবে। তারপর সিকি তোলা পরিমাণ আফিম ভালোভাবে মিশিয়ে দুই রত্তি পরিমাণ অর্থাৎ প্রতি তোলায় ৪৮টি করে বড়ি তৈরি করবে। এরপর প্রতি রাতে শয়নকালে একটি করে বড়ি এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করবে। আল্লাহ চাহে তো অচিরেই স্বপ্নদোষ হতে রক্ষা পাবে।

❖ প্রত্যেক দিন ভোর বেলা কৈতরগম কিংবা ইছবগুলের ভূষি এক গ্লাস সরবত বানিয়ে নিয়মিত সেবন করলে স্বপ্নদোষ রোগ ভালো হয়ে যাবে।

অধিক স্বপ্নদোষের কারণে কারো ধাতু বা বীর্য পাতলা হয়ে গেলে নিম্নোক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করবে।

❖ সালাম মিছরী ২০০ গ্রাম, শ্বেত মুসরী ১০০ গ্রাম, সকাকুল মিছরী ২০০ গ্রাম, কালো মুসরী ১০০ গ্রাম, সিংঘাড়ের আঠা ৫০ গ্রাম ও চিরিডাল চূর্ণ ৫০ গ্রাম। এগুলো চূর্ণ করে পরিস্কার কাপড়ে ছেকে নিতে হবে। তারপর ঐ চূর্ণগুলো ৩ কিলো গব্বুর দুধে মিশিয়ে অল্প আঁচে ফুটিয়ে গাঢ় করতে হবে। তারপর ৫০০ গ্রাম গব্বুর ঘি ও ৭৫০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে আরো কিছুক্ষণ আগুনে ফুটাতে হবে। এরপর যখন খুব ঘন বা একটু শক্ত হবে, তখন একটি কাঁচের পাত্রে রেখে দিতে হবে।

যৌনশক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হল মিসওয়াক করা

যৌন শক্তি বা সেক্স পাওয়ার বৃদ্ধির বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন একটি আত্মীক ও ঈমানী আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মেসওয়াক করা। মেসওয়াক করার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিরই অগণিত উপকার রয়েছে। মেসওয়াকের যতগুলো উপকার রয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নে কিছু আলোকপাত করছি।

মেসওয়াক করার দ্বারা সেক্স পাওয়ার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীর মুখের দুর্গন্ধ স্বামীর মনে যৌন চাহিদার মাত্রা যতই থাকুক না কেন, তাকে প্রতিরোধ করে দেয়। এ দুর্গন্ধ বন্ধের অন্যতম উপায় হল মেসওয়াক করা।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায়, মেসওয়াক করার দ্বারা মুখে সুঘ্রাণ সৃষ্টি হয়, মুখ পরিস্কার হয়, দিল দেমাগ শক্তিশালী হয়, অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, মেসওয়াককারী ব্যক্তির সাথে ফেরেশতারা মুসাফাহা করে, যিনা ব্যভিচার থেকে মুক্তির উপায়, দাঁতকে শক্তিশালী বানায়, দাঁতে ঝলক সৃষ্টি করে, দাঁতের মাড়ি মজবুত করে, কাশ বের করে দেয়, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, মেসওয়াকে অভ্যস্ত ব্যক্তির রুজি রোজগার করা সহজলভ্য হয়ে যায়, অনেক দেরিতে বৃদ্ধপনা দেখা দেয়, কোমর মজবুত ও শক্তিশালী বানায় ইত্যাদি।

মেসওয়াক বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার [অনুবাদক] রচনা 'মাসায়িলুন নিসা' কিতাব দেখা যেতে পারে।

যিনা ব্যভিচারের ক্ষতি

যিনা ব্যভিচার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করলেও এখানে যিনা ব্যভিচার মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ক্ষতির দিকটি উল্লেখ করা হচ্ছে, কারণ বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, বর্তমানে লোকজনে যিনা ব্যভিচার করে নিজেকে বড় মনে করে লোকসমাজে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করছে। আবার অনেকে যিনার ক্ষেত্রে সেঞ্চুরি করে মিষ্টিও বিতরণ করছে। অথচ এ আকাশ যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন যিনা সম্পর্কে হুশিয়ার বাণী করেছেন এভাবে–

ولا تقربوا الزناء انه كان فاحشة وساء سبيلا

"তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না। কেননা, এটা বড়ই বেহায়াপনা ও নির্লজ্জ কাজ"।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন, তাওরাত কিতাবে আছে 'যিনা ব্যভিচার করিও না, যদি তোমরা যিনা ব্যভিচার করো, তাহলে মনে রাখবে তোমাদের স্ত্রীও যিনা করবে।'

যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করে যেখানে গোসল করে, সে যমিনও তার জন্য বদ দোআ করতে থাকে। যিনার দ্বারা যদিও দুনিয়ায় মজা অনুভব হয় কিন্তু আখেরাতে রয়েছে এর জন্য কঠিন থেকে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যিনার আগুন ঈমানকে জ্বালিয়ে দেয়। যিনাকারীর খারাবতার প্রভাব তার প্রতিবেশীর উপরও বর্তায়। যদি প্রতিবেশীরা যিনাকারীকে খারাপ জ্ঞান না করে।

যেখানে যিনা ব্যভিচার হয়, সেখানে খোদা প্রদত্ত বালা-মুছিবত নাযিল হতে থাকে। ভূমিকম্প দেখা দেয়। যিনাকারী ব্যক্তি বড়ই দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন করে।

আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে–

الزناء يخرب البناء

"যিনা ব্যভিচার প্রত্যেক ভিত্তিকে নির্মূল করে দেয়"।

পক্ষান্তরে যিনা ব্যভিচার থেকে যারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে- কিয়ামতের দিন যখন কেউ আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো স্থান পাবে না, সকলে সামান্য আশ্রয় নিতে জায়গা খুঁজবে, তখন আল্লাহ তাআলা যিনা থেকে বাঁচনেওয়ালাদেরকে স্বীয় আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। যিনা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা জান্নাত পাওয়ার অন্যতম উপায়।

হাদীসে এসেছে, তিন ব্যক্তিকে যদি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তবুও জাহান্নাম তাদেরকে জ্বালাবে না। তন্মধ্যে একজন হল, যে ব্যক্তি সব সময় কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করত। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি মেহমানের কদর করত এবং তৃতীয় হল ঐ ব্যক্তি, যিনা ব্যভিচারের মহা সুযোগ আসার পরও যে নিজেকে বিরত রেখেছে।

যিনা ব্যভিচারের বিশেষ ছয়টি ক্ষতি

১। যিনাকারীর চেহারার রৌনক্ব বা উজ্জ্বলতা, শোভা, সৌন্দর্য বা বাহার শেষ হয়ে যায়।

২। রোজি রোজগারে বরকত কমে যায়। যে কাজই করুক না কেন, কোনো কাজেই বরকত হয় না।

৩। হায়াত কমে যায়। হায়াতে বরকত হয় না। অর্থাৎ হায়াত পাওয়ার পরও যথেষ্ট পরিমান ছাওয়াবের কাজ করতে পারে না।

৪। আল্লাহর আযাব-গজবে নিপতিত হয়। বালা-মছিবত সর্বদা লেগেই থাকে; একটার পর একটা সমস্যা লেগেই থাকে।

৫। হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশে কঠোরতা করা হবে।

৬। দীর্ঘকাল জাহান্নামে পড়ে থাকতে হবে।

বলা হয়েছে, যিনাকারীর কবরের দিকে আগুনের বিশ লাখ দরজা খুলে দেওয়া হবে। প্রত্যেক দরজার সাথে সাপ, বিচ্ছু আসবে এবং তাকে দংশন

করতে থাকবে। এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আরো বলা হয়, যে বৎসরে যিনা করেছে, সে বৎসরের আমল বাদ হয়ে যাবে, জাহান্নামের মধ্যে বিশেষ একটি কুপ রয়েছে, যেখানে কেবল যিনাকারীদেরকেই নিক্ষেপ করা হবে। আর সে কুপের আগুনের শাস্তি এতো কঠিন হবে, যদি সে কুপের মুখ খুলে দেওয়া হয়, তাহলে সে আগুনে সারা জাহান্নামবাসি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এমনও বলা হয় যে, যদি সে কুপের সামান্যতম আগুন অন্যান্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সেসব জাহান্নামবাসীরা জ্বলে পুড়ে যাবে। এই কঠিন কোপে কেবল যিনাকারী, সুদখোর, পিতা-মাতার নাফরমান বান্দারা শাস্তিভোগ করতে থাকবে।

যিনা করার পর যখন সে গোসল করে এবং তার গোসলের এক ফোটা পানি মাটিতে পড়ে, তখন যমীন আল্লাহর দরবারে এ বলে ফরিয়াদ জানায়, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হুকুম করো যেন আমি এ যিনাকারীকে আমার ভূগর্ভে নিয়ে আসি। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি শান্ত হও, সবর কর। এক সময় তোমার কাছেই আসবে। যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। বনি ইসরাইলের ৭০ হাজার লোক এই যিনার কারণেই আচানক মছিবতাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল।

যিনা নামক এ হীন কাজটি মানুষের আত্মিক ও ঈমানী শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। সমস্ত নেক খাছলত ও সৎ স্বভাবগুলো ধীরে ধীরে মুছে দেয়। কুদরতী ভাবেই যিনাকারীর সুনাম-সুখ্যাতি, মান-ইজ্জত ও সম্মান বিলীন হতে থাকে। নেককার মহিলারা যিনাকারীকে যথেষ্ট ভয় পায়। যিনা করার কারণে সকল সৎ কাজ করার সাহস হারিয়ে যায়। চেহারা ফেকাশে হয়ে যায়। রোজি রোজগার ও কামাইয়ে বরকত থাকে না।

যিনা ব্যভিচার এমনই একটি খারাপ কাজ, যা পৃথিবীর কোনো মাজহাব এমনকি কোনো ধর্মই স্বীকৃতি দেয় নি। সব ধর্মেই যিনা ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যিনাকারীর শাস্তি সব ধর্মেই রয়েছে। কুরআনুল কারিমের ১৮ পারার সুরা 'নুর' -এ যিনাকারীর শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়াতে যিনার মজায় এমন ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। দেখা গেছে, অনেক বিত্তবান ব্যক্তিরা যিনার কাজে লিপ্ত হওয়ায় একপর্যায়ে তারা রাস্তার ফকীর হয়ে গেছে। নিজের কষ্টে অর্জিত অর্থ সম্পদ যিনা করতে গিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অবশেষে আল্লাহর নিকট

অপরাধী বান্দা হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং দুনিয়ার লোকজনের নিকটও ঘৃণ্য লোক হিসেবে গণ্য হয়েছে।

দুনিয়ার এ স্বাদ ও মজা ক্ষণিকের জন্য। এ স্বাদ ও মজা একদিন ছাড়তেই হবে, আজীবন ধরে রাখা যাবে না। দুনিয়াতে জীবিত থাকাবস্থায় বৃদ্ধ হলে এমনি এমনিই বাদ পড়ে যাবে। যৌবন বয়সের বাহাদুরী ক্ষণিকের জন্য। বৃদ্ধ বয়সে এ বাহাদুরী আর থাকবে না। সুতরাং এখন থেকেই নিজেদেরকে সংযত করে পরকালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে ।

আল্লাহর দরবারে দুআ করি, তিনি যেন এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন, তাদেরকে এ হীন কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দেন। যিনার লিপ্ত ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত দুআটি বেশি বেশি পড়বে–

اللهم انى اعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى ومن شر لسانى ومن شر قلبى ومن شر منى

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কান দ্বারা খারাপ কথা শ্রবণ করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমার দৃষ্টিশক্তির খারাবতা, আমার যবানের খারাবতা, আমার কলবের খারাবতা ও বীর্যের খারাবতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

উক্ত দুআটি হাদীস শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি প্রত্যেক নামাযের শেষে তিনবার করে পড়বে।

সমকামিতা বিষয়ক কিছু কথা

লাওয়াত্বাত তথা পুরুষের সাথে মনোবাসনা পুরণকারী ব্যক্তি যদি দুনিয়ার সব পানি দিয়েও গোসল করে, তারপরও কিয়ামত দিবসে সে অপবিত্র অবস্থায় উঠবে। এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কেবল তওবা-ই এ পাপকে মুছে দিতে পারে। যে ব্যক্তি কোনো বাচ্চাকে মনের খাহেশ নিয়ে আদর করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে হাজার বছর জাহান্নামে ফেলে রাখবেন।

শয়তান কাউকে কোনো বাচ্চার সাথে অপকর্ম করতে দেখে, সেখান থেকে আল্লাহর আজাবের ভয়ে দ্রুত পলায়ন করে। এ পাপকর্ম চলাকালে আল্লাহর আরশ কাঁপতে থাকে। কামভাবের সাথে বাচ্চাকে চুমা দেওয়া মায়ের সাথে যিনা করার মতো। মায়ের সাথে যিনা নবীদেরকে হত্যা করার নামান্তর।

হযরত সুলাইমান আ. একদা এক শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার দৃষ্টিতে কোন আমলটি উত্তম? জবাবে শয়তান বলল, লাওয়াত্বাত বা সমকামিতা। শয়তান আরো বলল, একজন মহিলা যখন অপর আরেকজন মহিলার সাথে এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়, তখন আমি অনেক খুশি হই।

লাওয়াত্বাত তথা সমকামিতা এই পাপ কাজের জন্যই আল্লাহ তাআলা হযরত লুত আ.এর জাতিকে নির্মূল করে দেন। যমীন উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন। তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

যেসব লোক সমকামিতা করে বা স্বীয় স্ত্রীর গোপ্তস্থানের পরিবর্তে পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে, তাদের সম্পর্কে হযরত আলী রা. বলেন- এসব লোকদেরকে হত্যা করে আগুনে জালিয়ে দেওয়া দরকার। হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তাদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করে পাথরাঘাত করে মেরে ফেলা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবটি পড়া যেতে পারে।

হস্তমৈথুন বিষয়ক কিছু কথা

হস্তমৈথুন অর্থাৎ হাত দ্বারা যৌনাঙ্গ হতে বীর্যপাত ঘটানো, যাকে জলক বলা হয়। এ বিষয়ে 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল এ বিষয়ে আরো জরুরি কিছু কথা আলোকপাত করা হবে।

হস্তমৈথুন এটি খুবই বদ অভ্যাস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন, হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো হারাম। বর্তমানে এটা এমনই একটি জঘন্য মছিবত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সারা বিশ্বেই এই অপকর্মটি বিরাজমান। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ পাওয়া যাবে না যে দেশে এ হীন কাজটি হচ্ছে না। আর এ হীন কাজের দরুণ অনেক লোক ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটা মাত্রাতিরিক্ত সহবাসের চেয়ে ক্ষতিকর। হস্তমৈথুনের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে বিস্তার করে। সাথে সাথে ক্ষতিকারক অনেক রোগও দেখা দেয়। বিশেষ করে, অন্তর, মস্তিষ্ক, যৌনাঙ্গ একেবারে বিকল হয়ে যায়। যে ব্যক্তির এ বিশেষ অঙ্গটি দুর্বল ও বাদ পড়ে যাবে, তার জীবনের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এমন ক্ষতি, শত আফসোস করেও তা আর পূর্বাবস্থায় আনা যায় না। এ খারাপ অভ্যাসটি সব বয়সেই হতে পারে। আর যে ব্যক্তি এ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা এটি করা ছাড়া থাকতে পারে না।

এ বদঅভ্যাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যেসব সমস্যা দেখা দেয় তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল।

মাথা ব্যাথা, মস্তিষ্কের ব্যাথা, কোমরে ব্যাথা, পায়ে ব্যাথা করে। মাথা চক্কর মারে। এমনকি যে কোনো বিষয়ে সে সন্দিহান হয়ে যায়। শরীর এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, হাটুর উপর ভর দেয়া ব্যতিত দাঁড়াতে পারে না। কোমরের ব্যাথায় বসতে পারে না। শুতে গেলে পাঁজর ব্যাথা করে। অনেক সময় চলাফেরা করার সময় অনিচ্ছায় পেশাব বের হয়ে যায়। মাঝে মাঝে উঠ-বস করতেও বীর্যপাত হয়ে যায়। দিন-রাতে স্বপ্নদোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তার বীর্য এত পাতলা হয়ে যায় যে, কখন তার বীর্যপাত হল সে সময়টিও তার জানা থাকে না।

এছাড়াও পেশাব বা পানির মতো বীর্য পাতলা হয়ে যায়। বীর্যের কীট শেষ হয়ে যায়। যে কারণে ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। দিল দেমাগ সঠিকভাবে কাজ করে না। অনেকে পাগল হয়ে যায়। অনেকের দিন কাঁপে। পুরুষাঙ্গ বক্র হয়ে একদিকে হেলে পড়ে। যৌনাঙ্গের শিরা বা রগ দুর্বল হয়ে যায়। ধ্বজভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা বেশি। সাহস হারিয়ে ফেলে। সব সময়ই চিন্তা ও টেনশন কাজ করে। এ রোগটি যে কতো মারাত্মক কেবল সেই বুঝে যে এ রোগে আক্রান্ত। যেমন কবরের অবস্থা মৃত ব্যক্তিই বুঝতে পারে। এজন্যই হাকীমগণ বলে থাকেন, হস্তমৈথুন করা যিনা ব্যভিচার করার চেয়েও অধিক ক্ষতিকারক।

কারো মাঝে এ রোগটি দেখা দিলে যতদ্রুত সম্ভব আরোগ্যের ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক পিতা-মাতা তার ছেলের এ ব্যাপারে বেখেয়াল থাকে। তাদেরকেও এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

জরুরি হেদায়াত

আল্লাহ তাআলা মহিলাদের গোপ্তস্থানকে এজন্য পর্দাদার বানিয়েছেন, সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গ মোটা ও ফুলে যায়, তথাপিও তারা যেন পুরুষাঙ্গ তাদের গোপ্তস্থানে প্রবেশ ও বের করার সময় কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব না করে। এবং তাদের পুরুষাঙ্গ কোনো প্রকার চাপের সম্মুখিন না হয়।

প্রক্ষান্তরে পুরুষদের পেছনের রাস্তা খোলামেলা। তার ভেতরের পথ সামান্য প্রশস্ত। সে রাস্তা দিয়ে যদি [মোটা ও ফোলা অবস্থায়] পুরুষাঙ্গ প্রবেশ

করে, তাহলে অবশ্যই পুরুষাঙ্গ চাপের সম্মুখিন হবে। আর পুরুষাঙ্গ যখন চাপের সম্মুখিন হবে এর দ্বারা পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ ও চিকন হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। আর যদি একবার কারো পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ ও চিকন হয়ে যায়, তাহলে তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অনেক কষ্ট ও মেহনতের প্রয়োজন। অনেকেই এ রোগে আক্রান্ত থাকতে থাকতে নিজের লিঙ্গকে এমন চিকন বানিয়ে ফেলেছে যে, শত চিকিৎসা ও চেষ্টা করেও কোনো ফল পায় নি। অনেকেই ধ্বজভঙ্গ হয়ে গেছে।

মহিলাদের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে সহবাস করাটা স্বাভাবিক নিয়ম। আল্লাহ তাআলা এ রাস্তাকে এ কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ পথে সহবাস করার দ্বারা দৈনিক তার যৌনশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করার মাঝে এ ধরণের কোনো প্রকার উপকারিতা নেই। বরং ক্ষতি আর ক্ষতিই। আমাদের ধর্মে এ পথে সহবাস করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলা হয়েছে। সরকারি আইনেও অনেক বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের হীন কাজের জন্য আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর দুনিয়াতে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা কেবল বোনাস হিসেবে। এ পথে সহবাস করার দ্বারা অপমান ও অপদস্থ ছাড়া আর কি আছে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সর্বদা চিন্তা ও পেরেশানীতে ভোগে। আজীবনের জন্য সন্তান জন্ম দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাছ তওবা করার তাওফীক দান করুন।

মহিলাদের সমকামিতা

পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের মাঝেও সমকামিতা নামক বদঅভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। যুবতী নারীরা যৌন উত্তেজক আলোচনা শোনার দ্বারা বা যৌন উত্তেজক ছবি দেখার দ্বারা এ কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। তদ্রূপভাবে এ জাতীয় বাজে কার্যাবলী টিভি'র বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়ে থাকে। ফলে যুবতী নারী বা বিধবা নারীরা সেসব চিত্র দেখার কারণে নিজেদের মাঝেও ঐ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

যেসব মহিলাদের স্বামী কাছে থাকে না বা বিদেশে থাকে কিংবা যেসব মহিলারা স্বীয় স্বামী দ্বারা তৃপ্ত হয় না, তাদের মধ্যে অনেকেই ঐ হীন কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। পূর্বকার যুগের মহিলাদের মাঝে এ বদ অভ্যাস ছিল, যখন

কোনো নারী নিজের যৌন চাহিদা পূরণের কোনো স্থান না পেতো, তখন তাদের মতো আরো অনেক নারীরা পরস্পরে সমকামিতায় লিপ্ত হতো। সে সময়কার সমকামিতার ধরণ ছিলো- তারা নিজেদের গোপ্তস্থানে পরিমাপ অনুযায়ী চামড়া বা রেশমের কাপড় দ্বারা পুরুষাঙ্গের ন্যায় লিঙ্গ বানাতো। সে লিঙ্গে তুলা বা নরম জাতীয় কোনো কিছু ভরে দিয়ে খুব মজবুত আকারে তা মোটা ও লম্বা বানাত। এরপর সেটাকে অপর মহিলার কোমরে বেঁধে দিয়ে পুরুষের ন্যায় সহবাস বা সমকামিতা করতো। বর্তমানেও এ ধরণের বিভিন্ন উপায় উপকরণ পাওয়া যায়।

এ জাতীয় বাজে অভ্যাসে অভ্যস্থ মহিলারাও পুরুষদের ন্যায় সমকামিতার বিভিন্ন বালা-মছিবতে আক্রান্ত হয়। তারা কোনো পুরুষের সাথে সহবাস করে তৃপ্তি পায় না। পুরুষের সাথে সহবাসে তারা কোনো প্রকার আনন্দ অনুভব করে না। এসব নারীরা সন্তান ধারণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এ বদঅভ্যাসে আক্রান্ত নারীদের চিকিৎসা খুবই দুষ্কর।

সমকামি নারীদেরকে চেনার উপায়

সমকামি নারীদেরকে চেনার উপায় এজন্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যেন তাদের গার্জিয়ানরা তাদেরকে সংশোধন করতে পারেন। তাদের হিতাকাঙ্খী হয়ে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন। এতে উভয়ের জন্য রয়েছে অফুরন্ত কল্যাণ। এ বিষয়ে লিখে তাদেরকে অপদস্থ করা উদ্দেশ্য নয়। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কারো দোষ গোপন করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন করবেন।

সমকামি নারীদেরকে চেনার উপায় হল– তাদের মেজায থাকবে তিক্ত, সামান্যতেই রেগে যাবে। সব সময় তাদের নাকের উপর রাগের চিহ্ন ফুটে থাকবে, চেহারা থাকবে কুঞ্চিত, চোখের নিচে কালো দাগ, চেহারা ফেকাশে, চেহারার মাঝে খারাবতার চাপ ফুটে উঠবে, চেহারা সব সময় শুকনো শুকনো মনে হবে, চেহারার ঔজ্জ্বলতা নিস্তেজ এবং চোখদ্বয় কোঠরাগত হবে, চোখের চারপাশে চিন্তা ও টেনশনের ছাপ প্রস্ফুটিত হবে। এসব নারীদের সবসময় মাথা ব্যাথা থাকে, কথার আওয়াজে কোনো ভারত্বভাব থাকবে না। মাথার চুল অতি অল্প বয়সেই ঝরতে থাকবে। অতি অল্প বয়সেই চুল সাদা হতে থাকবে। ক্ষুধা হ্রাস পাবে। আবার যা খাবে, তাও সহজে হজম হবে না। সব সময় দিল

ধরফর করতে থাকবে। আবার অনেকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। আবার যদি ঋতুস্রাব আসেও তবু তা পরিমাণে একেবারেই সামান্য। ঋতুস্রাবের রক্ত থাকবে কালো রঙয়ের দিকে ধাবমান এবং তা হবে খুবই দুর্গন্ধযুক্ত।

পিঠ ও রানেও ব্যাথা অনুভব হবে। জরায়ুর ভিতরে এবং লজ্জাস্থানের বহিরাংশ ফুলে যাবে। জরায়ু থেকে ক্রমাগত রক্ত পরতেই থাকবে। লজ্জাস্থানে জ্বলন রোগ দেখা দিতে পারে।

সমকামিতা রোগ থেকে বাঁচানোর তদবীর

সমকামিতা এমন একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস যা ধন-সম্পদ, আমল-আখলাক, সৌন্দর্য এমনকি ঈমানের জন্য অপূরণীয় ক্ষতিদায়ক। এজন্য প্রত্যেক পিতা-মাতা ও গার্জিয়ানকে স্বীয় বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই আখলাক গড়ার প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। সর্বদা তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন, তারা কোনোক্রমেই এ জাতীয় হীন অভ্যাসে লিপ্ত হতে না পারে। এসব বিষয়টি যেন তারা বুঝতেও না পারে। ছোট থেকে ছোট বিষয়ের ক্ষেত্রেও কড়া নযর রাখবে। যেসব ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেছে তাদের নিজেদেরকেই উত্তম আখলাক গড়তে হবে। যাবতীয় বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। কোনোক্রমেই বদ অভ্যাসে লিপ্ত করা যাবে না।

যদি কেউ ঘটনাক্রমে এসব বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে অতি দ্রুত সেসব ত্যাগ করতে হবে। যেসব সন্তানদের মাঝে এসব লক্ষণ দেখা দিবে, গার্জিয়ানদের উচিত অতি তাড়াতাড়ি তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা। যেমন কোনো সন্তানের মাঝে পিতা-মাতা দেখতে পেল যে, তাদের সন্তানের চোখের পুতলি স্বাভাবিক না থেকে তুলনামুলক ফুলা বা বড় বড় হয়ে গেছে। কথা বলার সময় তার দৃষ্টি পায়ের দিকে থাকে। কথা বলার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে পারছে না। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে। তার চেহারা আকার আকৃতি ভয়ানক হয়ে যাচ্ছে। চেহারা ফেকাশে হয়ে যাচ্ছে, বদ মজাযী, চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে, অলস হয়ে যাচ্ছে, সব সময় ভিত থাকে। ইত্যাদী হাব ভাব যখন দেখবে, তখনই সন্তানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে থাকবে। যদি সত্যি সত্যি সন্তান বাজে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে তড়িৎ সংশোধন করতে হবে। অন্যথায়

এক পর্যায়ে সন্তান সমকামিতা, হস্তমৈথুন বা এর চেয়েও মারাত্মক কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। অল্প বয়সেই নিজের মৌলিক বস্তু হারিয়ে ফেলবে। যখন বুঝে আসবে, তখন হয়ত শত চেষ্টা করেও পূর্বের ন্যায় সুস্থ হতে পারবে না। আজীবন তাকে এ গ্লানী নিয়ে জীবন যাপন করতে হবে।

বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি হাদীস

বিবাহ মানব জীবনে খুবই জরুরি জিনিস। বিবাহ করতে যে ব্যক্তি কোনো সমস্যা নেই তার অবিবাহিত জীবন কাটানো অনুচিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পর্কে অনেক হাদীস বলেছেন, তন্মধ্যে কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করলাম।

১। 'মুহতাজ ও অসহায় সে ব্যক্তি যার স্ত্রী নেই। অদ্রুপভাবে মুহতাজ ও অসহায় সে নারী, যার স্বামী নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তারা অর্থ-সম্পদে বিত্তবান হয়, তাহলেও কি তারা অসহায়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বললেন, হ্যাঁ তারা যতো সম্পদের অধিকারী হোক না কেন, তারা অসহায়।' আসলে এ হাদীসে বিবাহহীন জীবনকে অসহায় জীবন বলার কারণ হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের মাঝে বিবাহ প্রথা চালু করেছেন কেবল মানুষদের আরাম ও শান্তি পাওয়ার জন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

وجعل منها زوجها ليسكن اليها

"আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জোড়া জোড় করে বানিয়েছেন যেন আমরা শান্তিবোধ করি।"

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন, স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি যখন মহব্বত ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখতে থাকেন।

৩। বিবাহ ঈমানের অর্ধেক। অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। সেহেতু বলা যায় যে, যদি কারো ঈমান অপূর্ণাঙ্গ থাকে, তাহলে তার আমলে ছাওয়াব কম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৪। যখন কোনো স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে চুমা দেয়, তখন তাকে প্রত্যেক চুম্বনের বিনিময়ে হাজার বছর ইবাদতের ছাওয়াব দান করা হয়। যখন গলার সাথে গলা মিলায় তখন তাকে দুহাজার বছর ইবাদতের ছাওয়াব দান করা

হয়। যখন সহবাস করে, তখন তাকে তিনহাজার বছর ইবাদত করার সমান ছাওয়াব দান করা হয়। এরপর যখন [সহবাসের পর ফরয] গোসল করে তখন তাকে চার হাজার বছর ইবাদত করার সমপরিমান ছওয়াব দান করা হয়।

৫। স্ত্রী যখন আপন স্বামীকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে, তখন তাকে দুহাজার বছর ইবাদত করার সমপরিমাণ ছাওয়াব দান করা হয়। প্রক্ষান্তরে যে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘরের বাইরে যাবে, আকাশ যমীন ও ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না সে স্বামীর ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। আর যে মহিলা স্বামী ব্যতিত অন্যান্য পরপুরুষদেরকে নিজের শরীর দেখাবে, পরপুরুষদের প্রত্যেক দৃষ্টিতে মহিলার উপর ৩৬০টি অভিশাপ নাযিল হবে।

৬। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমর মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যখন তোমরা স্বীয় স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী হবে এবং স্বামীও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট, তখন তোমাদেরকে দিনে রোযা রাখা ও রাতে ইবাদত করার সমপরিমাণ ছাওয়াব দান করা হবে। যখন সন্তান ভূমিষ্টের কাছাকাছি সময় হয়ে আসবে, তখন তার জন্য জান্নাতে চক্ষু শীতলকারী জিনিসপত্র প্রস্তুত করা হয়। যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো হবে প্রতি গ্রাসের বিনিময়ে একটি করে নেকি দান করা হবে। বাচ্চার কারণে রাত জাগতে হলে এর বিনিময়ে সত্তরটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ ছাওয়াব দান করা হবে। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। –ইবনে মাযাহ

সুখের সংসার গড়তে স্বামী স্ত্রীর দায় দায়িত্ব

বর্তমানে অনেক স্বামী স্ত্রীর মাঝে মিল মহব্বত পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। যে কারণে সংসারে অশান্তি নেমেই আছে। খুব কম সংসারই পাওয়া যাবে, যারা বেশ সুখে আছে। এজন্য প্রত্যেক মহিলার উচিত স্বীয় স্বামীকে মন প্রাণ উজার করে ভালোবাসা। স্বামীর উচিত স্ত্রী যদি কখনো কিছুটা উলট পালট করে ফেলে তখন তাকে সংশোধন করা নিজে সবর করা। স্বামী যখন বাড়িতে আসবে, তখন হাসি খুশি মুখে স্বামীকে স্বাগতম জানিয়ে বরণ করা। অযুর হালতে খাবারা রান্না করবে। সব সময় স্বামীর সাথে বসে একই দস্তরখানে খাবার খাবে।

সূচীপত্র

সকলেই বিবাহের পূর্বে জল্পনা কল্পনা করে যে, আমার সংসার হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী সংসার। দুনিয়াতেই আমি স্বর্গের সুখ অনুভব করব। আমার সংসার হয়ে থাকবে সকলের জন্য উপমাতুল্য। আমার উপমা দিয়ে অন্যান্য লোকেরা নিজেদের সংসার গুছাবে। কিন্তু বিবাহের পর তার জল্পনা কল্পনা একেবারে মাটির সাথে মিশে যায়। স্বর্গের সুখ তো দুরের কথা দুনিয়ার মাঝে তার চেয়ে দুঃখ কষ্টের জীবন আর কারো আছে বলে মনে হয় না। তখন তার এ খেয়াল আসে যে, আসলে বিবাহের জীবন খুবই কষ্টদায়ক। বিবাহের পূর্বেই ভালো ছিলাম। বিবাহ কেন করলাম। একাকী জীবনই দুনিয়ার জন্য স্বর্গীয় জীবন। আসলে তার এসব চিন্তা-ভাবনা সবই ভুল। তার জীবনে কেন এসব দুর্ভোগ নেমে এল, সে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। নিম্নে দাম্পত্ব জীবনে কেন অশান্তি নেমে আসে এবং তার প্রতিকার কি, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

সাংসারিক জীবনে কলহের কারণ

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অথবা যে কোনো একজন দীনের ব্যাপারে উদাসীন হলে।

২. স্ত্রী চলাফেরায় বেপরোয়া ও সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা থাকলে।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কারো কোনো কু-অভ্যাস থাকলে।

৪. স্বামী-স্ত্রীর কারো অতীত জীবনে কোনো কলঙ্কময় বিষয় থাকলে।

৫. স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘদিন আলাদা অবস্থান করলে।

৬. স্বামীর ছোটখাটো প্রয়োজনের গুরুত্ব না দিলে।

৭. স্ত্রীর অনুরোধ বা আবদার না রাখলে।

৮. স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সামঞ্জস্যতা না থাকলে।

৯. স্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ধনী এবং স্বামীর সম্পদ কম হলে।

১০. স্ত্রী শালীনতা ও পর্দার প্রতি অমনোযোগী হলে।

১০. স্ত্রী নিজ বাপ-ভাইয়ের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি অমনোযোগী হলে।

১১. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে শিক্ষার সামঞ্জস্যতা না থাকলে।

১২. স্ত্রী পরপুরুষ এবং স্বামী পরনারীর সাথে অবাধ মেলামেশা করলে।

১৩. পরস্পরের চাহিদা না মিটলে।

১৪. স্ত্রীর প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট না হলে।

১৫. স্বামীর শাসক সুলভ আচরণে।

১৬. স্ত্রীর মুখ বে-লাগাম হলে বা তার বে-লেহাজ কথাবার্তার কারণে।

১৭. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণ ভিন্নমুখী হলে।

১৮. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে।

১৯. স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহজনক চোখে দেখলে।

২০. উভয়ে উভয়ের ছোটখাটো ভুলত্রুটি বড় করে দেখলে।

২১. প্রকাশ্যে বা গোপনে উভয়ে উভয়ের দোষত্রুটি অপরের কাছে প্রকাশ করলে।

২২. ছোটখাটো ব্যাপারে জিদ ধরে থাকলে।

২৩. অপরের কান কথা বিশ্বাস করে একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা করলে।

২৪. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ধর্মীয় সামঞ্জস্যতা না থাকলে।

২৫. বিবাহ সম্পাদনের পূর্বে বা পরে কোনো আচরণ প্রতারণামূলক হলে।

২৬. একে অপরের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ হারিয়ে ফেললে।

২৭. স্ত্রীর হাতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হলে।

২৮. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর অধিকার আদায়ে অমনোযোগী হলে।

এছাড়া আরো বহুবিধ প্রকাশ্য ও গোপন কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

সকল লোকের আকার আকৃতি চেহারা ও স্বভাব যেমন এক নয়, তেমনি সব দাম্পত্য কলহের ধরণও এক নয়। দেখা যায়, এক দম্পত্যির মাঝে যে কারণে কলহ সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক একই কারণে আরেক দম্পত্যির কোনো প্রতিক্রিয়াই হয় নি। দ্বিতীয় দম্পত্যি ঘঠনাটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন।

সাংসারিক জীবনে কলহের প্রতিকার

সাংসারিক জীবন কলহমুক্ত থাকার ব্যাপারে যে যতো কথাই বলুক না কেন, এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে-স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অধিকার ও হক

সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা এবং যথাযথভাবে সে হক পূরণ করতঃ পরস্পরে উভয়ের প্রতি দয়াদ্র হওয়া। দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাইলে, অবশ্যই সকলকে এ ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। অন্যথায় ছোটখাটো দাম্পত্য কলহ ধীরে ধীরে প্রকটরূপ ধারণ করে গোটা পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত করবে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর সচেতন হওয়া খুবই জরুরি।

প্রত্যেক দম্পতি যদি তাদের দাম্পত্য জীবনে কতিপয় বিষয়ে একটু যত্নবান হন এবং স্বয়ং দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ দাম্পত্য কলহ সহজেই মিটে যেতে বাধ্য। সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল। যথা–

১। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ।

২। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে, পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। স্ত্রীর উচিত-স্বামীর এ শরীয়তপ্রদত্ত কর্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব মেনে নেয়া।

তবে পুরুষদেরকে তার স্ত্রীদের উপর অযাচিতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নারীদের উপর অবিচার করা যাবে না। পুরুষদেরকে স্মরণ রাখতে হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ী হজ্বের ভাষণ। তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের নারীদের হক সম্পর্কে ওসীয়ত করে যাচ্ছি, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। তাদের উপর তোমাদের হক আছে এবং তোমাদের উপর তাদের হক আছে। তোমাদের হক হল, তারা যেন তোমাদের শয্যায় অন্য কাউকে আসতে না দেয়। আর তাদের হক হল, তোমরা উত্তমরূপে তাদের ভরণ-পোষণ করবে।" –(তিরমিযী)

৩। নারীদের বক্রতা স্বভাবজাত, এটা তাদের থেকে পৃথক করা যাবে না। তবে এটা তাদের কোনো দোষ নয় বিশেষ হিকমতে সৃষ্টিগতভাবেই এ স্বভাব তারা প্রাপ্ত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নারীদের এ অবস্থাকে পাঁজরের বক্র হাড্ডির সাথে তুলনা করে বলেছেন, "যদি এ পাঁজরের বক্র হাড্ডি সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি লাভবান হতে চাও, তাহলে তার বক্রতা মেনে নিয়েই লাভবান হতে হবে। মূলত এটি গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিরল উপমা। তাই স্বামী এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতার ভূমিকা নিলে তথা স্ত্রীর বক্রতা মেনে নিয়ে সেভাবে ম্যানেজ করে চললে, দাম্পত্য জীবন মধুময় হবে।

৪। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "আমি যদি মানুষকে অন্য কোনো মানুষের সম্মুখে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর সম্মুখে সিজদা করার হুকুম দিতাম।" –(তিরমিযী)

উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হল তার স্বামীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা। তাই সকল স্ত্রীকে এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া জরুরি।

এমনকি স্বামীর মাঝে কোনো প্রকার কু-অভ্যাস থাকলে তার জন্য তাকে অবহেলা করা যাবে না। বরং স্বামীকে আন্তরিক ভালোবাসা, মহব্বত, শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবা করে তার মন জয় করতঃ সেই কু-অভ্যাস দূর করণে আপ্রাণ চেষ্টা-তদবীর করে যেতে হবে।

৫। স্বামীর আর্থিক অবস্থার উপর খেয়াল রাখতে হবে। তার শক্তি-সামর্থ অনুপাতে জীবনমান চালাতে হবে। স্বামীর আর্থিক শক্তি-সামর্থের বাইরে কোনো কিছু আবদার করা যাবে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনো কিছু আবদার করে না পেলে, তাতে মন খারাপ করা অনুচিত।

স্ত্রী নিজ কথায় অটল থাকার জন্য জিদ ধরা অনুচিত। প্রাথমিকভাবে স্বামীর কথা জেনে পরবর্তীতে তা নিয়ে নিভৃতে সিদ্ধান্তে পৌঁছা উত্তম।

স্বামীর ক্রয়কৃত বস্তুর সরাসরি সমালোচনা বা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। তাতে লাভের তুলনায় ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। তাই যদি কখনো কোনো বস্তু অপছন্দ হয়, তারপরও তা হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে এবং ভালো বলে উল্লেখ করতে হবে।

৬। স্বামীর সেবায় নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখবে। যেন তার ভালোবাসা ও সেবায় তার প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট থাকেন। তদ্রুপভাবে স্বামীকেও স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা দেখাতে হবে। তার হক আদায়ের ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝি হলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মিটিয়ে ফেলতে হবে। অন্যথায় তৃতীয় পক্ষ ইবলিস এ সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে উভয়ের মাঝের শান্তিকে বিনষ্ট করে দেবে। সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে, ইবলিশ কখনই কারো বন্ধু হতে পারে না বরং ইবলিশ মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

৭। প্রত্যেক স্ত্রীকে তার রূপ-যৌবন কোনো অবস্থাতেই এর অপব্যবহার না করে তার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে।

বড় আফসোসের বিষয়, অধুনা সমাজে এর পুরোপুরি উল্টো অবস্থা বিরাজমান। অর্থাৎ, আধুনিক মহিলারা বাইরে বের হলে সেজেগুজে বের হন বটে, কিন্তু স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সাজসজ্জার প্রয়োজনই মনে করেন না। আমাদের সমাজের সিংহভাগ মহিলারাই এ ব্যধিতে আক্রান্ত। দাম্পত্য জীবন সুখময় করে রাখতে সকলকে এ অভ্যাস পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র স্বামীর জন্যই সাজসজ্জার অভ্যাস করতে হবে। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনের আসল সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

৮। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে জানতে হবে এবং তা আদায়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বেশিরভাগ দম্পতি কুরআন-হাদীস অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর হক ও অধিকার সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত না থাকার দরুণ দাম্পত্য জীবনে অশান্তিতে ভোগে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা একান্ত জরুরি।

৯। এককভাবে প্রত্যেক স্বামীর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখলে, দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশগুলো সুন্নাতের মর্যাদাসম্পন্ন। যথা–

(ক) স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা।
(খ) শরীয়তের আওতায় স্ত্রীর মন খুশী করতে চেষ্টা করা।
(গ) স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি, হাসিঠাট্টা করা।
(ঘ) স্ত্রীর আরাম আয়েশের প্রতি খেয়াল রাখা।
(ঙ) স্ত্রীর কাজে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা।
(চ) স্ত্রীর মুখে আদরে করে খাবার তুলে দেয়া।
(ছ) খোরপোষের সংকীর্ণতা না করা।
(জ) স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় হাত খরচা দেয়া।
(ঝ) স্ত্রীর মন জয় করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখা।
(ঞ) মাঝে মধ্যে স্ত্রীর পছন্দনীয় বস্তু উপহার দেয়া।
(ট) সময়মত বাসায় ফেরা এবং সর্বদা স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করা।
(ঠ) স্ত্রীর দোষ না দেখে, বরং গুণগুলো দেখা।
(ড) স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করা ইত্যাদি।

১০। তদ্রূপভাবে প্রত্যেক স্ত্রী এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পালনে সচেষ্ট হলে, দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে বলে আশা করা যায়। যথা–

(ক) স্বামীর হককেই সবচেয়ে বড় মনে করতে হবে।

(খ) স্বামীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট না দেয়া বা তার মনে ব্যথা না দেয়া।

(গ) স্বামীর ডাকে তৎক্ষনাৎ উপস্থিত হয়ে তার মনোরঞ্জন করা।

(ঘ) কখনো স্বামীর অবাধ্য না হওয়া।

(ঙ) স্বামীকে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানা।

(চ) নিজের সাধ্যমত স্বামীর সেবা করা। স্মরণ রাখা জরুরি যে, ফরযের পর স্ত্রীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল স্বামীর খেদমত করা। নেককার হওয়ার পর স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনকারী স্ত্রীকে হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সর্বাগ্রে দীনের হুকুম পালন করে পরবর্তীতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়ের জন্য নিবেদিতপ্রাণ থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, বান্দার প্রতি প্রথম দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও তার রাসূলের। পরবর্তীতে পুরুষের জন্য গর্ভধারিণী স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বীয় স্বামীর দাবীই সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ কোনো পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে অবহেলা করে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে অবজ্ঞা করে, আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে কখনই কামিয়াব হবে না।

যেভাবে জীবন চালাতে হবে

প্রত্যেক মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা কিভাবে জীবন চালাবে, এ ব্যাপারে নিম্নে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি।

১। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে। অনেক রাত্র করে ঘুমাবে না।

২। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়বে। এতে জ্ঞান-বুদ্ধি ভালো থাকবে। ঘুম থেকে দেরিতে উঠলে বুজি রোজগারে বরকত থাকে না।

৩। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে হাজত পূরণ করার অভ্যাসটি বেশ ভালো। যদি সকাল বেলা বাথরুমের প্রয়োজন কষ্ট অনুভব হয়, তাহলে দু-এক গ্লাস পানি পান করবে। এতে সারা রাত পেটে কিছু দানাপানি না যাওয়ার সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে।

৪। খালি মাথায় কখনো বাথরুমে যাবে না। মাথা ঢেকে বাথরুমে যাবে। কেননা, খালি মাথায় বাথরুমে গেলে খারাপ জিন ও শয়তানের আছর লাগার অধিক সম্ভবনা রয়েছে।

৫। বাথরুমে যাওয়ার পূর্বে দুআ পড়বে। দুআটি হল-

بسم الله اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বিন নর-নারীর খারাবতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

বাথরুম থেকে বের হয়ে এ দুআ পড়বে-

الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি অপবিত্র মলমূত্রকে আমার থেকে বের করে আমাকে শান্তি ও আরাম দান করেছেন।" -(ইবনে মাজাহ)

৬। সব মৌসুমেই সকাল বেলা সাদা ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুবে। সর্বোত্তম হল অযু করা। ঠাণ্ডা পানি দ্বারা চেহারা ধুলে, চেহারার সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে গরম পানি পানে এ উপকারটি নেই।

৭। ঘুম থেকে উঠেই মেসওয়াক ব্যবহার করবে। মেসওয়াকের অনেক ফযীলত ও উপকার রয়েছে। নিম্নে কিছুটা উল্লেখ করা হল।

ক) হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনে হোক বা রাতে হোক ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অযু করার আগে মেসওয়াক করতেন। -(আবু দাউদ)

আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. বলেন, ঘুম থেকে উঠার পর মেসওয়াক করার হেকমত এই যে, ঘুমন্তাবস্থায় পেট থেকে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু মুখের দিকে উঠে আসে, এতে মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যায় ও মুখের রুচি পরিবর্তন হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠার পর মেসওয়াক করলে এসব দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় এবং রুচি ফিরে আসে।-(নায়ল, তা'লীক)

খ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, মেসওয়াক করে নামায পড়ার দ্বারা মেসওয়াক বিহীন নামাযের পঁচাত্তর গুণের বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। -(আবু নুআঈম)

গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক করে দুরাকআত নামায পড়া আমার নিকট মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত নামায পড়ার চেয়ে বেশী প্রিয়।

ঘ) হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক করে নামায পড়া মেসওয়াক বিহীন নামায পড়ার চেয়ে সত্তর গুণ বেশী সাওয়াব রাখে।–(মিশকাত)

ঙ) হযরত আলী রা. বলেন, মেসওয়াক করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কফ দুর হয়।

তিব্বে নববী কিতাবে লিখেছে– চারটি জিনিষ জ্ঞান বৃদ্ধি করে। যথা–

(১) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বর্জন করা। (২) মেসওয়াক করা। (৩) নেককার লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। (৪) আলেমদের নিকট বসা।

চ) হযরত আবু দারদা রা. বলেন, তোমরা নিজেদের জন্যে মেসওয়াক করা অপরিহার্য করে নাও এবং এ ব্যাপারে উদাসীন হবে না। কেননা উহাতে চব্বিশটি উপকারিতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় ১০টি উপকার হল– (১) মেসওয়াক করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। (২) নামাযের সওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি পায়। (৩) স্বচ্ছলতা আসে। (৪) মুখ সুঘ্রাণ হয়। (৫) দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়। (৬) মাথা ব্যথা সেরে যায়। (৭) চোয়ালের ব্যথা দূর হয়। (৮) ফেরেশতাগণ মোসাফাহা করেন। (৯) চেহারা উজ্জ্বল হয়। (১০) দাঁত উজ্জ্বল হয়।

আল্লামা তাহ্‌তাবী একটি নতুন কথা লিখেছেন যে, মেসওয়াক করলে বেশী পরিমাণ মনী (বীর্য) সৃষ্টি হয়।

মেসওয়াক করার দশটি বিশেষ উপকারিতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মেসওয়াকের মধ্যে দশটি গুণ রয়েছে– (১) দাঁতের সবুজ রঙ দূর করে। (২) দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে। (৩) দাঁতের মাড়ি শক্ত করে। (৪) মুখ পরিস্কার করে। (৫) কফ দূর করে। (৬) ফেরেশতারা খুশী হন। (৭) আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়। (৮) সুন্নতের অনুসরণ-অনুকরণ করা হয়। (৯) নামাযে সওয়াব বৃদ্ধি পায়। (১০) শরীর সুস্থ থাকে।

মেসওয়াকের কাঠ

সর্বপ্রকার কাঠ দ্বারা মেসওয়াক করা জায়েয আছে। শর্ত হল, উহা কষ্টদায়ক যেন না হয় বিষাক্ত লাকড়ি দ্বারা মেসওয়াক করা হারাম।

ডালিম, বাঁশ, সুগন্ধী ঘাস ও চামেলী ফুলের কাষ্ঠ দ্বারা মেসওয়াক করা মাকরূহ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায়হান ফুলের কাষ্ঠ দ্বারা মেসওয়াক করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, উহা কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি করে। মেসওয়াকের জন্য সর্বোত্তম হল পীলু বৃক্ষের কাষ্ঠ।

তাসহীলুল মানাফ গ্রন্থে বর্ণিত, পীলু বৃক্ষের মেসওয়াক দাঁতের ব্যথা এবং দাঁত পরিষ্কারের জন্যে ভালো। তিব্বে নববী কিতাবে লিখেছে, পীলু বৃক্ষের মেসওয়াকের অধিক উপযোগী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীলু বৃক্ষের প্রশংসা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ পীলু বৃক্ষের মেসওয়াক ব্যবহার করতেন।

মাওয়াহেব নামক গ্রন্থে পীলুর মেসওয়াক মোস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অনুসারীদের ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন, তারপর এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। পীলুর পরবর্তী স্থান হল যায়তুনের কাষ্ঠ। যায়তুন সম্পর্কেও হাদীসের মধ্যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যায়তুনের মেসওয়াক বরকতময় বৃক্ষের মেসওয়াক, উহা মুখ পরিষ্কার করে এবং দাঁতের হলুদ বর্ণ দূর করে। উহা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের মেসওয়াক।-(মুন্তাখাব)

মেসওয়াক করার নিয়ম

ফিকাহ গ্রন্থ কাবীরির মধ্যে রয়েছে, মেসওয়াক করার নিয়ম হল, প্রথমে উপরের চোয়ালের ডান দিকে, তারপর বাম দিকে করবে। তারপর নীচের চোয়ালের ডান দিকে করে তার পর বাম দিকে মেসওয়াক করবে।

“শরহুস সুন্নাহ” নামক গ্রন্থে মেসওয়াক ব্যবহারের নিয়ম বলা হয়েছে যে, প্রথমে উপর নীচের ডান দিকে, তারপর উপর নীচের বাম দিকে মেসওয়াক করবে। তারপর ঐ সকল দাঁতে মেসওয়াক করবে যেগুলো ডান ও বামের মাঝখানে রয়েছে। মেসওয়াক করার সময় বেজোড় সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং শক্ত মেসওয়াক ব্যবহার করবে।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. লিখেছেন, মানুষের জন্যে উত্তম হল, জিহ্বার শেষ পর্যন্ত মেসওয়াক পৌঁছে দেয়া, যাতে বুক ও কণ্ঠনালীর কফ দূর হয়ে যায়।

মেসওয়াকের যে সমস্ত ফযীলত হযরত আলী রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তা হল –

তাঁরা বলেন– তোমরা অবশ্যই মেসওয়াক করবে। উহার ব্যাপারে কখনো উদাসীন হবে না এবং নিয়মিত মেসওয়াক করবে। কেননা মেসওয়াক করলে–

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ওয়াদা রয়েছে।

২. নামাযের সাওয়াব নিরানব্বই অথবা চারশত গুণ বেড়ে যায়।

৩. নিয়মিত মেসওয়াক করার ফলে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়।

৪. জীবিকা নির্বাহ সহজ হয়ে যায়।

৫. মুখ পরিস্কার হয়।

৬. মাড়ি মজবুত হয়।

৭. মাথা ব্যথা ও মাথার সর্ব প্রকার রোগ সেরে যায়।

৮. কোন নিশ্চল রগ নড়াচড়া করে না এবং নড়াচড়াকারী কোনো রোগ নিশ্চল হয় না।

৯. কফ দূর হয়।

১০. দাঁত শক্ত হয়।

১১. দৃষ্টিশক্তি পরিস্কার হয়।

১২. পাকস্থলী ঠিক হয়।

১৩. শরীর শক্তিশালী হয়।

১৪. মানুষের বাকপটুতা মুখস্ত শক্তি ও জ্ঞান বাড়ে।

১৫. অন্তর পবিত্র হয়।

১৬. পূণ্য বেড়ে যায়।

১৭. ফেরেশতারা খুশী হয়।

১৮. তার চেহারার জ্যোতির কারণে তার সাথে ফেরেশতারা মোসাফাহা করে।

১৯. নবী ও রাসূলগণ তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

২০. মেসওয়াক শয়তানকে অসন্তুষ্ট করে ও তাকে তাড়িয়ে দেয়।

২১. পাকস্থলী পরিস্কার করে।

২২. খাদ্য হজম করে।

২৩. অধিক সন্তান জন্মায়।

২৪. চুলের ন্যায় সরু পুলসেরাত বিজলীর ন্যায় পার করে দিবে।
২৫. বার্ধক্য পিছিয়ে দেয়।
২৬. আমলনামা ডান হাতে দিবে।
২৭. আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে শরীরে শক্তি দান করে।
২৮. শরীর থেকে উষ্ণতা দূর করে।
২৯. পিঠ মজবুত করে।
৩০. মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদাত স্মরণ করিয়ে দেয়।
৩১. মৃত্যু কষ্ট অতি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।
৩২. দাঁত সাদা করে।
৩৩. মুখে সুঘ্রাণ আনে।
৩৪. কণ্ঠ পরিস্কার করে।
৩৫. বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে।
৩৬. আর্দ্রতা বন্ধ করে।
৩৭. জিহ্বা পরিস্কার করে।
৩৮. দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করে।
৩৯. প্রয়োজন পুরা হতে সাহায্য করে।
৪০. কবর প্রশস্ত করে দেয় এবং মৃতের জন্যে সমবেদনাশীল হয়ে যায়।

৪১. যারা মেসওয়াক করে না তাদের সাওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয়।

৪২. বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

৪৩. ফেরেশতাগণ তার জন্যে প্রতিদিন বলতে থাকে এ ব্যক্তি নবীদের অনুসারী। তাঁদের পদাংক অনুসরণকারী।

৪৪. তার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৪৫. মেসওয়াককারী দুনিয়া হতে পবিত্র হয়ে যায়।

৪৬. মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে এমন ছুরতে হাজির হয় যেরূপ কোনো অলি-আল্লাহ্ বা নবীদের নিকট হাজির হয়।

৪৭. মেসওয়াককারী ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজ হতে পানি পান করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে না।

৪৮. সর্বোপরি ফযীলত এই যে, মেসওয়াককারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা রাযী – খুশী হন।

৪৯. মেসওয়াক করলে মুখ পরিষ্কার হয়। মেসওয়াকের আরো বহু উপকারিতা হাদীস ও ফেকাহের কিতাবে উল্লেখ আছে।

৮। সর্বদা খেয়াল রাখবে- সহবাস, শারীরিক ব্যায়াম, খানা খাওয়ার পর এবং কোথা থেকে আসার পর যতক্ষণ শরীরের ঘাম না শুকায় গোসল করবে না। গোসলের জন্য উত্তম সময় হল সকাল বেলা। সকাল বেলা নাস্তা খাওয়ার অভ্যাসটির প্রতি যত্নবান হবে। সকালের নাস্তার ব্যাপারে হযরত আলী রা. বলেন, সকালের নাস্তা করার দ্বারা চিন্তা টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৯। সব সময় ক্ষুধা লাগার পর খানা খাবে। কখনো খাবার ভরপুর পেট খাবে না। দৈনিক কমপক্ষে দুবেলা খাবে, তবে সর্বোচ্চ চারবার খাবে। হাত মুখ ধৌত করে খাবে। হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে, খাওয়ার আগে ও পরে হাত মুখ ধৌত করলে করয ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। খাবারসমূহ দাঁত দ্বারা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। কেননা, পেটের মধ্যে তো আর দাঁত নেই যে, সেখানে দাঁতের মাধ্যমে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। খাওয়ার মাঝে বেশি বেশি পানি পান করা অনুচিত। প্রয়োজনে সামান্য পান করা যেতে পারে। খাওয়ার পরপরই পানি পান করবে না। এতে বদ হজম হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

ডাক্তারী মতে কমপক্ষে খাওয়ার এক ঘন্টা পর পানি পান করবে। খাওয়ার পরপরই কোনো মেহনতী কাজ করবে না। দুপুরের খাবার খাওয়ার পর কিছুক্ষণ আরাম করা উচিত। যাকে কাইলুলাহ বলে। এটা করা অবশ্য সুন্নাত। কাইলুলাহ করার দ্বারা দেমাগ তীব্র হয়। জ্ঞাণ-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। রাতের খাবার গ্রহণের পর কমপক্ষে একশত চল্লিশ কদম পায়চারী করা উচিত। রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে যাওয়া দেল মন কঠোর হওয়ার মাধ্যম বিশেষ। উত্তম হল রাতের খাবার ইশার নামায আদায়ের পূর্বেই খাওয়া।

রাতের নামায ও অযিফা পাঠের পরপরই ঘুমিয়ে পড়বে। অযু করে ঘুমাতে গেলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। ডানকাতে শুয়া সুন্নাত। বামকাতে শুইলে অতি তাড়াতাড়ি খাবার হজম হয়। দিন রাতে আট ঘন্টার অধিক ঘুমাবে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমালে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। রাতের খাবার না খেলে অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ব্যায়াম করার দ্বারা মোটা মানুষ চিকন হয়ে যায়, আর চিকন মানুষ সাস্থ্যবান হয়। শরীর সুস্থ্য রাখতে সব সময় ব্যায়াম করা আবশ্যক। ব্যায়ামের সর্বোত্তম সময় হল সকাল বেলা। পেট ভরা অবস্থায় ব্যায়াম করবে না। ব্যায়ামের পর কোনো ঠাণ্ডা জিনিস খাবে না।

১০। নাভীর নিচের পশম ও বগলের পশম প্রতি সপ্তাহে কিংবা পনের দিন পরপর পরিস্কার করবে। চল্লিশ দিনের বেশি যেন না হয়। নাভীর নিচের পশম পরিস্কার না করলে দাদ, খুজলী ও চর্মরোগ দেখা দেয়। আর এসব জায়গায় এ জাতীয় রোগ হলে বারবার হাত সেখানে যাওয়ায় একসময় হস্তমৈথুন নামক বদ অভ্যাসটি এমনি এমনি শুরু হয়ে যায়। কিতাব আকারে বড় হয়ে যাবে এজন্য এ আলোচনা এখানেই সমাপ্তি টানলাম।

পরীক্ষিত কার্যকরী আমল

কখনো বড় ধরণের মছিবত দেখা দিলে নিম্নোক্ত আমলটি করবে।

সাত বা এগার দিন রোযা রাখবে। প্রত্যেক দিন ইশার নামাযের পর কিংবা তাহাজ্জুদের পর দুরাকাত সালাতুল হাজাত পড়বে। উত্তম হল সে দুরাকাতে সুরা ইয়াছীন পড়বে কিংবা সুরা কাফিরুন এবং ইখলাস পড়বে। নামাযের পর ৩১৩ [তিনশত তের] বার দুআ ইউনুস পড়বে। এর পর দুআ করবে। তবে দুআর শুরু ও শেষে সাতবার করে দরুদ শরীফ পড়বে। এপর মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কায়মনোবাক্যে নিজের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা বড় থেকে বড় মছিবত দুর হয়ে যাবে।

মরদামী শক্তি বৃদ্ধির রূহানী চিকিৎসা

মরদামী শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল রূহানী চিকিৎসার কথা বলা হবে যা আমি আমার উস্তাদ ও নির্ভরযোগ্য আল্লাহওয়ালাদের থেকে জেনেছি এবং এর দ্বারা সফলকাম ব্যক্তিরাও আমাকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন। তা হল–

যখনই গোসল করবে বা সহবাস থেকে মুক্ত হবে তখনই (তিন নম্বর পারার দশ নম্বর রুকুর চৌদ্দ নম্বর) আয়াতে কারীম সাতবার পাঠ করে কোনো মিষ্টি জাতীয় বস্তুতে ফুঁক দিয়ে খাবে। ইনশাআল্লাহ খুবই উপকার পাবে।

সঠিক কথা

❖ মহিলাদের জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা জায়েয। তবে ফ্যাশন গ্রহণ করা জায়েয নেই।

❖ স্ত্রীর কথামতো যে স্বামী চলাফেরা করে, সে স্বীয় সন্তানদের দৃষ্টিতে অপমানীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

❖ যার স্ত্রী বেহায়া ও অকৃতজ্ঞ, জাহান্নাম তার প্রয়োজন নেই। জাহান্নামের শাস্তিবিশেষ দুনিয়াতেই উপভোগ করতে পারবে।

❖ নারীদের সাথে বেশি সময় কাটান ব্যক্তি দুর্বল ও বেকার হয়ে যায়।

❖ অপরের স্ত্রীর ইয্যতে হস্তক্ষেপ করলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।

❖ অভিশাপ বর্ষিত হোক সেসব লোকদের উপর, যারা নিজ স্ত্রীকে ভিন পুরুষদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এক সময় স্ত্রীকে সন্দেহ করতে থাকে।

❖ যে নিজ স্ত্রীকে পরিচালনা করতে পারে না। সে অন্যদেরকে কিভাবে পরিচালনা করবে।

❖ যে নিজ স্বামীকে বিশ্বাস করে না সে অন্যকে কিভাবে বিশ্বাস করবে।

❖ যিনাকারী ব্যক্তি থেকে স্বীয় মাতার পর্দা করা আবশ্যক।

❖ কতই না নির্লজ্জ ও বেহায়া সেসব লোক, যারা নিজ প্রতারক স্ত্রীকে খুশি করার জন্য নিজের মায়ের অশ্রু বিসর্জন পছন্দ করে।

❖ সেসব সন্তানদের ভাগ্যে কোনো আনন্দ ও খুশি থাকতে পারে না, যারা আপন মাতাকে কাঁদায়।

❖ মেয়েরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পরপরই বিবাহের ব্যবস্থা করো। কেননা, হারামখোর নযর, যুবতী মেয়েদের [শরীরের] ঘরের সবখানে চক্কর লাগায়।

❖ মেয়েদেরকে ভুলপথে ছেলেরাই নিয়ে যায়। পুরুষদের অলঙ্কার হল মেহনত। আর মহিলাদের অলঙ্কার হল লজ্জা-শরম।

❖ যারা যৌতুক নিয়ে বিবাহ করে, কখনো তাদেরকে জামাতা বলে ভাববে না। বরং তাদেরকে কৃতদাস বা ক্রয়ক্রিত গোলামের চেয়েও নিম্নমানের লোক বলে মনে করবে।

❖ নিজ ধোকাবাজ স্ত্রীর মন জয় করার জন্য নিজের পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিও না।

❖ ফ্যাশন পূজারী মহিলাদেরকে বিশ্বাস করবে না। তারা এক স্থানে বেশিদিন থাকতে পছন্দ করে না। সব সময় নতুন কিছু কামনা করে।

❖ স্ত্রীর আয়-রোজগারে নির্ভরশীল পুরুষ, সর্বদা বেহায়া ও বেশরম হয়ে থাকে।

বক্ষমান কিতাবটির পরিসমাপ্তি টানছি এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কাকুতী ও বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করছি যে, হে রাব্বুল আলামীন! তুমি আমার এ মেহনতকে কবুল কর। সাথে সাথে এ কিতাবটির পাঠকদেরকেও সীমাহীন লাভবান হওয়া ও যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান কর। পরিশেষে রহমত বর্ষণ কর সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তোমার রহমান ও রাহীম নামের উছিলায় তার পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর রহমত বর্ষণ কর।

বি.দ্র. এ বই পাঠকারীদের জন্য একান্ত গোপনীয় কথা বইটি পাঠ করা বেশ উপকারী বলে মনে করছি।

সমাপ্ত

সূচীপত্র
রংধনু কর্তৃক প্রকাশিত
মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহী রচিত
আরও একটি অনবদ্য গ্রন্থ।
নারী ও পুরুষের
একান্ত
গোপনীয় কথা
বা
পুশিদাহ রাজ
গোপন আলাপ
রংধনু পাবলিকেশন্স
আন্দারকিল্লা, চট্টগ্রাম।